শিক্ষা

শিক্ষার্থী ও শিক্ষক

শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত

২০৬ কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

নিবেদন

বিশ্ববিদ্যালয়ের সোপান ছেড়ে দেবার সাথে সাথেই বাইরের স্রোতের টানে বহু নাকানি-চুবানি খেয়ে শেষ পর্যন্ত যে আশ্রয়টুকু মিলল, তাকে অবলম্বন করেই কাটিয়ে দিলাম জীবনের দীর্ঘ ত্রিশটি বছর, তরঙ্গের হাত থেকে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করে। নিছক নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতেই প্রায় সমস্ত মূলধনটুকু ফুরিয়ে গেল। দান করে দাতা সাজবার মত আর কিছু অবশিষ্ট রইল না।

স্বীকার করতে আজ আর কুণ্ঠার কোন কারণ নেই—একদিন প্রাণের দায়েই এ শিক্ষকতা পেশাটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেবা করবার বাসনায় স্বেচ্ছায় এ পেশা আমি কখনো গ্রহণ করি নি। প্রথম প্রথম বহু চেষ্টা করেছি এ নাগপাশ হতে মুক্ত হতে, কিন্তু নানা কারণে সম্ভব হয় নি। শেষটায় নিতান্ত হতাশ হয়েই যেন লেগে থাকতে চেষ্টা করলাম তুদিনের এ আশ্রয়টুকুকে সম্বল করেই। ক'দিন বাদে ধীরে ধীরে যেন একটু মায়াও পড়ে গেল পেশাটির উপর। ক্রমে ভালবাসতে শুরু করলাম সমগ্র পরিবেশটিকেই। মাঝে মাঝে একটু আধটু আলোর ঝলকও দেখতে পেলাম। সে আলোকে খানিক এগিয়ে যাবার পর বুঝতে পারলাম—পথ ভুল হয় নি। আমার প্রাপ্য বস্তু সবই ত এ পথে রয়েছে। প্রথম দিক্ দিয়ে ভাবতাম—যা জানি, যা শিখেছি তাতেই ত বেশ চলে যাচ্ছে, আবার খানিক পড়াশুনা করে কি হবে? এ প্রশ্নটির সতুত্তর তা'ও পেয়েছি নাটকের প্রায় তৃতীয় অঙ্ক পেরিয়ে। আজ তার জন্য আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আমার ট্রেনিং কলেজের শ্রদ্ধেয় আচার্য-বৃন্দকে। এখন একথায় পূর্ণ বিশ্বাস করি—যে আলো নিজে জ্বলছে না, সে কেমন করে অপর একটি বাতির শিখাকে প্রজ্জলিত করবে?

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদিন তুদিনের আশ্রয় রূপে যে পেশাটিকে আমি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম, আজ তা'থেকে চিরতরে বিদায় নেবার পুর্বে মনে হলো—আমার অভাগিনী শিক্ষার জন্য আমার অভিজ্ঞতা হতে কিছুই কি রেখে যাবার নেই? আমার যা-কিছু স্বল্প পুঁজি, বিদায়ের

পূর্বে শিক্ষার ভাণ্ডারে সেটুকু জমা রেখে যেতে আপত্তি কি? শুধু সে চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আজ এ লেখনী ধরেছি। ঋণী আমি অনেকের কাছেই, বিশেষ করে আমার প্রিয় সহকর্মিবৃন্দ ও আমার অতি আদরের দুলাল-দুলালীদের কাছে। যাঁদের পূত সংস্পর্শে আজ আমার অন্তরাত্মা তৃপ্ত, তাঁদের সকলের শুভেচ্ছা নিয়েই এ অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছি।

শিশুরও মন বলে একটা কিছু আছে, তারও অনুভূতি আছে এবং সর্বোপরি তারও একটা অহং আছে—এসব কথা বুঝতে না পেরে অজ্ঞতাবশতঃ সমাজের কত যে মূলধন নষ্ট করেছি সে কথা ভাবলে সত্যি সত্যি আজ নিজেকে নিতান্ত অপরাধী মনে হয়। অনেকটা সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত মানসে অতি সংক্ষিপ্ত এ প্রবন্ধ ক'টির অবতারণা করেছি। এতে যদি আমার কৃত অপরাধের কথঞ্চিৎও স্খালন হয়, তা'হলেও যাবার পূর্বে নিজেকে কতকটা হালকা মনে করব। মানুষের মন নিয়ে যেখানে রাত-দিন ঘাঁটাঘাটি, আপন প্রাণের সজীবতা অটুট রাখাই সেখানে আসল কথা। দেশের মানুষ গড়বার কারখানাগুলোর ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত তাঁদের কথাও কিছু কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। একটা স্বাধীন দেশের কচি প্রাণসমূহে হিল্লোল জাগাবার মত হিম্মত আমাদের ক'জনার আছে? এ প্রশ্নটিকেও এড়িয়ে চলতে আমি সাহস পাই নি। আমার এ অতি ক্ষুদ্র অবদানটুকু শিক্ষা-সংস্কারের অগ্রগতিকে খানিকটা প্রেরণা যোগান দিতে সক্ষম হলেও আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যাঁদের ভাব এবং ভাষা আমি অনুকরণ করেছি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রইলাম। যাঁরা নানাভাবে একাজে আমায় সহায়তা করেছেন তাঁদের কাছেও আমি ঋণী রইলাম। এ প্রবন্ধ ক'টি আমার সুযোগ্য সহকর্মিবৃন্দকে তাঁদের গুরুদায়িত্ব পালনে কিছুমাত্র সহায়তা করলেও আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করব। ইতি—

শ্রীশিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত

বিষয়সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

॥ এক ॥

শিক্ষার কথা

হাজার হাজার বছর আগেকার মানবশিশু যে সম্বলটুকু নিয়ে ধরায় আসত, আজও তার কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। অথচ, সেদিনকার সেই সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার পরিবর্তে আজ তাকে জাঁকজমকপূর্ণ অত্যন্ত জটিল এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নবাগত শিশুর কাছে তার ক্ষুদ্র পরিবেশটির সবকিছুই নিতান্ত অপরিচিত। এই কারণে, সে নিজেকে কিছুকাল নিতান্তই অসহায় মনে করে। ডিম থেকে বেরিয়েই হাঁসের বাচ্চাগুলো যেমন অনায়াসে জলে সাঁতার কাটতে পারে, আপন চেষ্টায়ই আহার সংগ্রহ করতে পারে, নবজাত মানবশিশুর পক্ষে তা মোটেই সম্ভব নয়। পরমুখাপেক্ষী হয়েই তাকে বেশ কিছুকাল কাটাতে হয়। মানবশিশুর পরিবেশটি সদা-পরিবর্তনশীল বলেই বোধ হয় তার প্রস্তুতির কালটিও একটু প্রলম্বিত।

বৃদ্ধি একটি নিছক জৈবিক প্রক্রিয়া। কোন প্রকার আদেশ বা নির্দেশের অপেক্ষা সে রাখে না। সে চলে তার আপন গতিতে। উদ্দেশ্য—বিকাশ, এবং এই বিকাশের তাগিদেই বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবকে সামঞ্জস্য-বিধান করে নিতে হয় তার নিকটতম পরিবেশের সাথে। এই আপসরফা কার্যটি দ্বিবিধ উপায়ে সম্ভব। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বা পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ এই দুই উপায়েই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলা যায়। ইতর প্রাণিসমূহ চলে নিছক প্রবৃত্তির (instinct) বশে, পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণের বালাই তাদের নেই। অতএব তাদের পরিবেশটি রয়ে গেছে অনেকটা অপরিবর্তিত বা স্থিতিশীল। ইতর প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তিসমূহই তাকে সাহায্য করে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে। যারা অক্ষম, মুছে যায় তাদের চিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ হতে চিরতরে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বাবুই পাখী যে ধরনে বাসা তৈরি করত, আধুনিক যুগে পৌঁছেও তারা সে নিয়মের কোন

পরিবর্তন করে নেয় নি বা করে উঠতে পারে নি। পরিবেশের প্রাধান্য তারা মেনে নিয়েছে বা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে বিনা দ্বিধায়। তাই আজও তারা প্রকৃতির কোলই আঁকড়িয়ে আছে।

মানুষ কিন্তু বেছে নিয়েছে অপর পথটি। মানুষের একটা স্বভাব, সে কোনকিছুই বিনা তর্কে বা বিনা যুক্তিতে মেনে নিতে রাজী নয়। মানুষের এ বিদ্রোহী মনই মানুষকে আজ দাঁড় করিয়েছে তথাকথিত সভ্যতার সুউচ্চ শিখরে। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধানের কাছে মানুষ নতিস্বীকার তো করলই না, বরং সমগ্র চেষ্টা দিয়ে লেগে গেল তাকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে। আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে অধিকাংশ মানুষই অগ্রসর হতে চাইল না।

প্রাকৃতিক শক্তিকে কিছু কিছু করায়ত্ত করে মানুষ তাকে ক্রমে লাগাতে শুরু করল নিজেদের নানা ভোগ-বিলাসের কাজে। ধীরে ধীরে এমনি করেই মানুষ প্রকৃতির কোল হতে হলো বিচ্যুত। অবশ্য, পরিবেশ বলতে শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশকেই বুঝায় না। প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও মানুষের একটা সামাজিক পরিবেশ রয়েছে এবং সর্বোপরি রয়েছে তার আভ্যন্তরীণ বা মনোজগতের পরিবেশ। বেঁচে থাকতে হলে এই ত্রিধারার সাথে আপস না করে উপায় নেই। কিন্তু, বাইরের পরিবেশটিই মানুষের নিকট বড় হয়ে দেখা দিল। সৃষ্টির নেশায় মানুষ মেতে উঠল। শুরু হলো স্রষ্টার সৃষ্টির উপর রং লাগান। শিব গড়তে গিয়ে অনেকেই হয়ত বানর গড়ে ফেললেন, তবু কি চেষ্টার বিরাম আছে! **শিক্ষাও ঐ প্রকার একটি চেষ্টারই নামান্তর।** ক্ষুদ্রতম প্রাণী 'প্যারামেসিয়মের' শিক্ষার কোন ব্যবস্থা কেউ কোনদিন করে নি, অথচ জীবনযুদ্ধে আজও সে টিকে আছে। আজও যদি মানবশিশুর জন্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকত, তাহলেও নিছক বেঁচে থাকার তাগিদেই সে প্রয়োজনীয় সবকিছু শিখে নিত না কি? কিন্তু, আমরা যে চাই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিজেদের মনোমত করে গড়ে তুলতে। অবশ্য এ ইচ্ছার পেছনেও অতি গোপনে ক্রিয়া করছে আত্মবিকাশ বা আত্মতৃপ্তির প্রেরণা। নিজেদের মনের মত করে শিশুদের রূপ দিতে চাই বলেই তো, আজ তাদের সবাইকে নিয়ে আসতে হয়েছে একটা কৃত্রিম পরিবেশে, এবং আমদানি করতে হয়েছে শিক্ষা নামক বস্তুটিকে।

জীবন কাকে বলে? এ প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন,

"জীবের অন্তর্নিহিত প্রাণ-শক্তি সদাই খুঁজছে আত্ম-বিকাশের পথ। পথে রয়েছে বহিঃপ্রকৃতির বাধা, এবং সেই বাধা অতিক্রমের চেষ্টার নামই জীবন।" এভাবে জীবের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি ও পরিগমের (environment) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে উপজাত অর্থাৎ অতিরিক্ত পাওনা (by-product) হিসাবে লাভ হচ্ছে খানিক অভিজ্ঞতা এবং একেই শিক্ষা নামে অভিহিত করা যেতে পারে। সাবান প্রস্তুতকালীন অতিরিক্ত পাওনা হিসাবে যে গ্লীসারিনটুকু পাওয়া যায়, সাবানের প্রয়োজনে তার মূল্যও সমধিক। ঠিক তেমনি, মানুষের জীবনের গতিপথে যে অভিজ্ঞতা-সমূহ সঞ্চয় হয়, চলার পথে তার মূল্যও কম নয়।

মানুষ মাত্রেরই একটা নিজস্ব চাহিদা আছে, তার ভাল লাগা বা মন্দ লাগা আছে, পছন্দ, অপছন্দ এ সবই আছে, এবং এ-গুলো সম্পূর্ণ-ই তার নিজস্ব ব্যাপার। প্রতিটি কার্যের ভিতর দিয়েই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে বের হয়। তার প্রত্যেকটি আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করলে দেখব, সে সবকিছুই করে নিজের ইচ্ছাপূরণ-মানসে। তাইতো মনীষীরা বলেন—শিক্ষা দেবার জিনিস নয়, নেবার জিনিস। **মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করবে স্বেচ্ছায় আপন তাগিদে।** জীবের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি সদাই খুঁজে বেড়াচ্ছে আত্ম-বিকাশের পথ এবং জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে এভাবে সে এগিয়ে চলেছে শুধু সেই ইচ্ছাপূরণ-মানসে।

সদ্যোজাত প্রতিটি মানব-শিশু এক একটি অফুরন্ত শক্তির উৎস। সে শক্তির বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই তার প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, আচরণ ইত্যাদির মারফত। বেঁচে থাকার তাগিদেই সে শিক্ষা করে নেয় প্রয়োজনীয় সবকিছু, এবং এভাবে আপন ধারায় ক্রমশঃ সে গড়ে উঠে। তবু যে শিক্ষার আদর্শ, লক্ষ্য, উপায় ইত্যাদি নিয়ে আমাদের এত গবেষণা, এত মতদ্বৈধ, এর কারণ আমরা যে চাই আমাদের শিশুদের আপন মনের মত করে গড়ে তুলতে। এই স্বার্থের সংঘাতেই রচিত হয়েছে কালে কালে শিক্ষার নব নব ধারা।

শুরুতে শিক্ষার যে লক্ষ্য ছিল আজ হয়ত তাকে আর আমরা সমর্থন করি না। ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, একথা একদা ভাবতে হয়েছিল সমাজরক্ষার উদ্দেশ্যেই। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের চেয়ে সমাজের উন্নতিকে দেখা হয়েছিল তখন বড় করে।

মানবের পরিপূর্ণ বিকাশসাধনই যদি শিক্ষার মূল লক্ষ্য হয়, তাহলে প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে না কি? প্রত্যেকটি শিশুকে তার স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী বর্ধিত হবার সুযোগ দিতে হবে বৈ কি! সমাজ-দরদীরা কিন্তু বলেন—সর্বাগ্রে প্রত্যেকটি শিশুকে আদর্শ সামাজিক জীব করে গড়ে তুলতে হবে। এমনি ভাবে দুইটি শিবিরের মধ্যে যুদ্ধ চলে আসছে সেই আদি যুগ হতে। ফলে, শিক্ষার কোন আদর্শই সর্বকালে সর্বজনগ্রাহ্য হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারছে না।

প্রফেসর নান (Nunn) তাই বলেছিলেন—"No ideal of life has for long reigned unchallenged over civilized men, even of the same race and nation. For every ideal there are followers, doubtful adherents and secret rebels."

মানবচিত্তের গতি বিচিত্র, এবং শিক্ষার আদর্শ ও ধারা চিত্তের গতিই অনুসরণ করে। একদল হয়ত প্রচলিত বাঁধা-ধরা পথ ধরে চলতে রাজী নন, তাই তাঁরা সন্ধান শুরু করেন স্বতন্ত্র পথের। একই কালে এক দেশের লোক হয়ত লেগে গেল শিক্ষার সাহায্যে রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটাতে, অপর শিবিরে হয়ত তখন চলেছে এ আদর্শের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রস্তুতি। আবার কেউ কেউ প্রশ্ন করছেন—একই ধারায় এক ছাঁচে সবাইকে গড়তে গেলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করা হবে না কি? Napoleon তো স্পষ্টই ঘোষণা করলেন—"My principal aim in the establishment of a teaching body is to secure means of directing *my political and moral ideal.*"

এমনিভাবে শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাব, শিক্ষার ধারায় কোন কালে হয়ত সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রাধান্য আবার কোন কালে হয়ত বা ব্যক্তির প্রাধান্য। একদল হয়ত বলেছেন সমাজের প্রয়োজনেই শিক্ষা, আবার অপর দল হয়ত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশসাধনকেই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলে প্রচার করেছেন।

ব্রহ্মণ্যযুগে দেখতে পাই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশসাধন। এথেনিয়ানরা (Atheneans) ঘুরিয়ে বললেন, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের (Personality) পরিপূর্ণ বিকাশসাধনই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আবার স্পার্টানরা (Spartans) ব্যক্তিত্বকে পেছনে ফেলে, শিক্ষার

সাহায্যে রাষ্ট্রের চাহিদামত শিশুদের গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তারপর, নবযুগের (Age of Renaissance) সূচনায় দেখতে পাই সবাই মিলে ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য চিৎকার করছেন। সিসেরেনিয়ানরা (Cyceranians) আবার শুধু সমাজের প্রয়োজনেই সবাইকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কমেনিয়স (Comenius)-এর সময় হতে আবার ব্যক্তি ক্রমে তার আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করল। বৈজ্ঞানিক জন লক (John Lock) বললেন, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে বিভেদ বিদ্যমান, তার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। অতএব, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানবগোষ্ঠীর সামগ্রিক বিকাশসাধন। এভাবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সাথে শিক্ষার ধারারও পরিবর্তন চলেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষার ধারা গড়ে উঠতে শুরু করল ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। কোপার্নিকস যেমন টলেমীর পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে সূর্যকে এনে কেন্দ্রে স্থাপন করেছিলেন, শিক্ষাজগতেও বিপ্লবী রুশোই (Rousseau) অবশেষে শিশুকে এনে স্থাপন করলেন শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে। সেই থেকে শিক্ষার ধারায় রুশোর প্রভাবই পরিলক্ষিত হচ্ছে সর্বাধিক। তারপর বৈজ্ঞানিক পেস্টালৎসি (Pestalozzi) শিক্ষার ধারায় মনস্তত্ত্বকে এনে ঢেলে দিলেন। এমনি করে শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন আলোকসম্পাত হলো। ফ্রয়েবেল (Froebel) ও মাদাম মন্তেসরীর (Montessori) চেষ্টায় রুশোর শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করল। সবাই বলতে লাগলেন, শিশুকে সর্বাগ্রে স্বাধীনতা দিতো হবে। প্রফেসর নান (Nunn) স্পষ্ট করে উক্তি করলেন—ব্যক্তিকে পূর্ণস্বাধীনতা না দিলে সমাজ ক্রমে পঙ্গু হয়ে যেতে বাধ্য। তাঁর মতে—
Our aim of education should be to give full freedom to the individual and to secure conditions which will enable the individual to contribute his quota to the variegated whole of human life as fully and truly characteristic as his nature permits.

ভারতীয় পণ্ডিতগণ প্রায় সবাই জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ (Unfoldment)-এর সাধনাকেই মোটামুটি শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করেছেন। **স্বামী বিবেকানন্দের মতে, মানবের ভিতর যে পরি-**

পূর্ণতা স্বতঃই রয়েছে তার সম্যক বিকাশের সুযোগদানই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। ঋষি রবীন্দ্রনাথ শুনতে পেয়েছিলেন অবরুদ্ধ মানবাত্মার ক্রন্দন, তাই শিক্ষার ভিতর দিয়েই তিনি সমগ্র মানবশক্তির মুক্তি কামনা করে গিয়েছেন। গান্ধীজীও বলতেন, শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ অর্থাৎ তার দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশসাধন।

এভাবে মোটামুটি বিচার করলে দেখতে পাই, আমাদের সবার সমস্যাই এক। অর্থাৎ যে মূলধনটুকু সাথে নিয়ে শিশু ধরায় অবতীর্ণ হয়েছে তার যেন কোন প্রকার অপচয় না হয়। কিন্তু নিজেদের ইচ্ছামত শিশুদের গড়তে গেলে, এ অপচয়ের হাত হতেও যে রেহাই নেই! যে মূলধনটুকু শিশু নিয়ে এসেছে, তাকে কারবারে সম্যক খাটাতে পারলেই তো সমাজ তার দ্বারা লাভবান হবে! সমাজের প্রয়োজনে তাকে গড়তে গেলে মূলধনের অপচয় হবার সম্ভাবনাই যে অধিক। তাই বলা হয়েছে, সমস্যা একটিই; কেবল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছ মাত্র। সময়ের সাথে সাথে শিক্ষার ধারার নিত্য নূতন পরিবর্তনও তাই একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

যুগের পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে চলতে হলে শিক্ষার ধারারও নিয়ত পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণের চিন্তার ধারা লক্ষ্য করলে দেখব যুগের ছাপই তাতে অতিমাত্রায় পরিস্ফুট। সময়চক্রের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে, নিষ্পেষিত হয়ে যেতে হবে একদিন ঐ চাকার তলায় পড়ে। অতএব শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে দেখলে আঁৎকে উঠবার কোন কারণ নেই। অবশ্য ব্যবস্থাটির সাফল্য সবটুকুই নির্ভর করবে যাঁরা রচনা করছেন এবং যাঁরা চালু করছেন তাঁদেরই উপর। যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয় এবং শিখার সংস্পর্শেই অপর শিখা প্রজ্বলিত হয়, ঠিক তেমনি প্রাণের সাহায্যেই প্রাণ সঞ্জীবিত হয়। আত্মার ঘুমন্ত শক্তিকে জাগাতে হলে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মহতেরই প্রয়োজন। এ জগতে যাঁরা আত্মোপলব্ধি করে ধন্য হয়েছেন, শিক্ষাসংস্কারের ভার দিতে হবে তাঁদের হাতে তুলে। প্রকৃত শিক্ষার পদ্ধতি রচনা করতে শুধু তাঁরাই সক্ষম। তাঁরাই শুধু দিতে পারেন প্রকৃত পথের সন্ধান।

॥ ছুই ॥

শিক্ষায় নূতন ভাবধারার বাহক

শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন নূতন ভাবধারা এনে যে-সব বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ শিক্ষা-জগতে যুগান্তরকারী পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের চিন্তার ধারা অনুসরণে বহু মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটিত হবে—এ আশায় জন কয়েক বিশিষ্ট শিক্ষা-সংস্কারকের জীবনদর্শন সম্পর্কে অতিসংক্ষেপে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা গেল।

(ক) রুশো (Rousseau)

'আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির জনক' বললে এক কথায় **রুশো**-কেই বুঝায়। রুশো ছিলেন সত্যিকারের একজন 'মহাবিপ্লবী'। নেপোলিয়ন পর্যন্ত স্বীকার করে গেছেন যে, 'রুশো না হলে ফরাসী বিপ্লবই সম্ভব হতো না।' জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি বিপ্লবের সূচনা করে গেছেন। প্রচলিত মানব-সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধেই তাঁর প্রতিবাদ দৃপ্তকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর সকল চিন্তায় ও কর্মে। মানুষের কৃত যা-কিছু তার সবকিছুই অন্যই সকলের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর অভিযোগ এবং জেহাদ। 'যা-কিছু কৃত্রিম সবই বর্জনীয় এবং যা-কিছু স্বাভাবিক সবই গ্রহণযোগ্য এ ধারণা তাঁকে যেন পেয়ে বসেছিল।' সম্রাটের অত্যাচারে যখন প্রজাকুল জর্জরিত, দলিত, পিষ্ট, রুশোর মনে তখন বিদ্রোহের বীজ অনুকূল পরিবেশে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে ধীরে ধীরে বেড়ে চলছিল এবং কালক্রমে ক্ষুদ্র অঙ্কুরটি পরিণত হয়েছিল একটি বিরাট মহীরুহে।

'শিক্ষার তিনটি অঙ্গ—শিক্ষক, ছাত্র এবং বিষয়বস্তু। রুশোর পূর্ব পর্যন্ত সবাই, হয় শিক্ষক নতুবা বিষয়বস্তুর প্রতিই বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন।' তাঁদের ধারণা ছিল, 'শিশুরা সবাই দুষ্টু' এবং তাদের ভাল করার ভার সম্পূর্ণ শিক্ষকের হাতে। বিষয়বস্তুও ছিল যেমন নীরস, শুষ্ক, শিক্ষকদের ব্যবহারও ছিল তেমনি কঠোর ও কর্কশ। 'শিশুদের কাঁধে জোর করে চাপিয়ে দিতে

হবে বিরাট বিদ্যার বোঝা। যাদের আগ্রহ নেই এবং যারা সে বোঝা বইতে অক্ষম, কড়া শাসন করে তাদের যে-কোন প্রকারে বশীভূত করাই ছিল শিক্ষকদের কাজ। এই প্রকার ধারণার উপর ভিত্তি করেই তখন রচিত হতো শিক্ষার ধারা ও পদ্ধতি।

রুশোই সর্বপ্রথম ঐসব প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে ঘোষণা করলেন বিদ্রোহ। শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুকেই দিতে হবে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব এই ছিল তাঁর বদ্ধমূল ধারণা। তিনি ঘোষণা করলেন, এতকাল শিশুকে দেখা হয়েছে দূরবীনের উল্টোদিক দিয়ে, শিশুকে ভাবা হয়েছে শিশুর পিতার স্থানে দাঁড় করিয়ে। এতকাল পর শিশুকে আবার শিশুর মত করেই ভাবতে হবে। তাদের বয়স্কের স্থানে দাঁড় করিয়ে যে দুর্ব্যবহার এতকাল করা হয়েছে, এইবার তার প্রায়শ্চিত্তের সময় আগত। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙ্গে-চুরে আবার গিয়ে স্থান করে নিতে হবে চিরহাস্যময়ী প্রকৃতির কোলে। রুশো বলতেন, শিশুকে প্রকৃতির কোলে ছেড়ে দাও, দেখবে সে কেমন মনের আনন্দে আপনাআপনি শিক্ষালাভ করছে, বাইরের প্রকৃতির প্রভাবে তার নিজস্ব প্রকৃতি কিভাবে ক্রমশঃ বিকশিত হচ্ছে। বাইরে থেকে কতকগুলো জ্ঞানের বোঝা চাপানই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোর পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দান। মানবশিশু জড় পদার্থ নয়; তারও একটা সত্তা আছে, তাই তার নিজস্ব একটা চাহিদাও আছে বৈ কি! তার চাহিদামত তাকে আহার্য সংগ্রহ করার সুযোগ দাও। এই ছিল তাঁর বক্তব্য।

রুশোর মনের কথা তাঁরই রচিত 'এমিলী'তে স্থান পেয়েছে। 'এমিলী' তাঁর বিশ বছরের সাধনার ও তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। এই পুস্তকে তাঁর নেতিবাচক (Negative way) শিক্ষার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সবার আগে শিক্ষার্থীকে দিতে হবে স্বাধীনতা। আমরা যাকে 'ঠেকে শেখা' বলি, অর্থাৎ ঠেকে ঠেকে ভুলগুলি বাদ দিয়ে (Trial and Error) তাকে শিখবার সুযোগ দাও। শৈশবকালীন আনন্দোপভোগ তার জন্মগত অধিকার। বয়স্ক ব্যক্তির সংস্কার ও কর্তৃত্ব হতে তার মুক্তি চাই। প্রতিটি শিশুর জন্য তাঁর ছিল আকুল আবেদন—কর্তৃত্ব নয়, স্বাধীনতাই পরম কল্যাণকর। শিশুকে ভালবাস, তার খেলাধুলা, সুখ-সুবিধা ও তার আনন্দদায়ক বিবেক-বুদ্ধির সাথে এক হয়ে যাও। শিশুকালের দ্রুত

অস্তায়মান দিনগুলি তিক্ততায় পূর্ণ করবার কোন অধিকার তোমার নেই। যে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী তাতেও কেন বাদ সাধ? রুশো স্পষ্টই বলতেন, যে শিক্ষা ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির নামে শিশুর আনন্দপূর্ণ দিনগুলি থেকে তাকে বঞ্চিত করে, তাকে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের বেদীমূলে বলি দেয়, যে শিক্ষা শিশুকে সর্বপ্রকার বন্ধনে ভারাক্রান্ত করে তার জীবনকে করে তোলে দুর্বহ, তাকে শিক্ষা সংজ্ঞা দিতে আমি বাধ্য নই। ভবিষ্যতের আশায় বর্তমানকে এভাবে অস্বীকার করাকে আমি হীন-দূরদৃষ্টি বলেই মনে করি।

রুশোর মতে, শিশুর কোন অভ্যাস গড়ে না তুলে তাকে সর্বপ্রকার অভ্যাসের হাত হতে মুক্তি দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শিশুকে ছেড়ে দিতে হবে এমন পরিবেশে যে-পরিবেশে কোন প্রকার কৃত্রিমতা নেই, অথচ শিশুর আকস্মিক কোন বিপদের সম্ভাবনাও যেন তাতে না থাকে। কোন ধর্ম বা ধর্মের বাধা-নিষেধও শিশুকে জোর করে মানাবার চেষ্টা করা সঙ্গত নয়। অন্যায় কোন কিছু যেন করার সুযোগ সে না পায় সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখলেই যথেষ্ট। চিন্তার দরকার, এমন কোন কাজ শিশুকে করতে না দেওয়াই ভাল। তাঁর ধারণা ছিল,—সবলকে যত সহজে বশে আনা যায় দুর্বলকে তত সহজে বশে আনা সম্ভব নয়। তাই শিশুকে সবল করে গড়ে তোলার চেষ্টা করাই সবার আগে দরকার, এই ছিল তাঁর অভিমত।

শিক্ষার ক্ষেত্রে রুশোর অবদান সামান্য নয়। তাঁর মানসসন্তান 'এমিলী'তে তিনি যে শিক্ষাব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন বর্তমান সমাজব্যবস্থায় হয়ত তাকে আমরা সম্যগ্‌রূপে মেনে নিতে পারি না, তথাপি তাঁর মতবাদ মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। সমাজের জটিলতর পরিস্থিতিতে তাঁর মতবাদকে অনেকে হয়ত অবাস্তব বলতেও দ্বিধা করবেন না, কিন্তু তাঁর মতবাদের পেছনে যে দর্শন ও তত্ত্ব রয়েছে তা' শাশ্বত ও চিরন্তন। তা'ছাড়া রুশোর আদর্শের ঐতিহাসিক মূল্যও অনস্বীকার্য। প্রচলিত প্রগতিধর্মী শিক্ষাব্যবস্থায় রুশোর প্রভাবই সর্বাধিক। **শিশু-কেন্দ্রিক** (Paido-centric) কথাটি রুশোর নামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অসহায় মানবশিশুর শত শত শতাব্দীর বন্ধন-মোচনের ভার নিয়েই যেন তিনি এ জগতে এসেছিলেন।

(খ) ফ্রয়েবেল (Froebel)

দার্শনিক ফ্রয়েবেলের জীবনটি ছিল নিতান্তই ঘটনাবহুল। এবং মনে হয় তাঁর জীবনের উত্থান-পতনের ঘটনাগুলিই তাঁর চিন্তার ধারাকে একটি বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত করতে বাধ্য করেছিল। এ কারণেই হয়ত দেখতে পাই তাঁর আদর্শে যেন আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়াচ লেগেছিল। তিনি ছিলেন একজন অতিশয় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। ভারতীয় দৃষ্টিতে আমরা তাঁকে একজন অদ্বৈতবাদী বলেই অভিহিত করব। তিনি বিশ্বাস করতেন—এ বিরাট বিশ্বের মূলে এক মহাশক্তি ক্রিয়ারত। এ জগৎ সে শক্তিরই লীলা-বিলাস। স্থাবরজঙ্গমে সর্বত্রই সেই শক্তির উৎস সহস্র ধারায় উৎসৃত হচ্ছে। তাই সবকিছুতেই তিনি মহামায়ার মহিমা নিরীক্ষণ করতেন।

রুশোর দৃষ্টিভঙ্গীকে সমাজতান্ত্রিক বললে ফ্রয়েবেলের দৃষ্টিভঙ্গীকে বলা যেতে পারে আধ্যাত্মিক। ফ্রয়েবেলের মতে, সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে উপলব্ধি করাই মানবজীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। প্রতি মানবশিশুতে যে শক্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে, পার্থিব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে শক্তি একদিন বিশ্বশক্তির সাথে মিলিত হবে। কাজেই ফ্রয়েবেলের মতে—সেই সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা এবং তাকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষা শুধু একটি উপায় মাত্র, যার সাহায্যে সেই ঘুমন্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলে তাকে বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারা যায়।

শিশুকে তিনি ভাবতেন স্বর্গের দূত বলে। শিশু বালক নয়, শিশু শিশুই। জীবনের দায়িত্ব কি, সে তা জানে না। কোন প্রকার স্বার্থের গন্ধ পারে নি তাকে আজও স্পর্শ করতে। শিশু নির্মল, পবিত্র এবং অপরের আনন্দে সে নিজেও যেন আত্মহারা হয়ে যায়। শিশুর ভিতর তিনি দেখতে পেতেন এক স্বর্গীয় আলো। ভিতর থেকে মহাশক্তি স্বতঃই যোগাচ্ছে শিশুর কর্মপ্রেরণা। ফলে, সদাই সে কাজ চায়। কাজ ছাড়া সে যে এক মুহূর্তও জেগে থাকতে পারে না। এসব কাজের উদ্দেশ্য শিশুদের জানা না থাকলেও ফ্রয়েবেল কিন্তু তা জানতেন। তিনি উপলব্ধি করতেন, এসব কাজের মধ্য দিয়েই শিশু এগিয়ে চলেছে পরমাত্মার সাথে মিলিত হতে। ভাঙ্গা, আর

গড়া—একবার গড়ছে, আবার কি মনে করে পরক্ষণেই তা' ভেঙ্গে আনন্দে হাততালি দিচ্ছে। অফুরন্ত শক্তির যেন এক একটি উৎস।

বিদ্যালয়ের কড়া শাসন ও কঠোর ব্যবস্থার যুপকাষ্ঠে ফেলে শিশুদের বলিদানের প্রস্তুতি দেখে ফ্রয়েবেল চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। ক্রমে শিশু শিক্ষার এক অভিনব প্রণালী তিনি সমাজের কাছে তুলে ধরলেন। প্রচলিত বিদ্যালয়সমূহ যে সমাজের পক্ষে কত অকল্যাণকর সেদিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তিনি চেষ্টার ক্রটি করেন নি। তাঁর রচিত শিক্ষাপ্রণালীকে 'শিশুদের বাগান' (Kinder Garten) এই নামেই অভিহিত করা হয়ে থাকে। তিনি বলতেন, এই মনোরম বাগানে শিশুরা ফুলের মত ফুটে উঠুক, ধন্য হোক স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি। এক কথায়, রুশোর ভাবকে তিনি একটি সত্যিকারের রূপ দিয়েছিলেন। এই কারণে ফ্রয়েবেলকেই নূতন শিক্ষাপ্রণালীর স্রষ্টা বললেও অত্যুক্তি করা হবে না।

জার্মানীর ব্ল্যাকেনবুর্গ গ্রামে ১৮৩৯ সালে ফ্রয়েবেলের কল্পনা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছিল। বর্তমানে একমাত্র সোবিয়েত রাষ্ট্রেই এই (Kinder-garten) ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৫ হাজারেরও অধিক। বহুদিন বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখলেন, শৈশবকাল মূলতঃ শুধু খেলাধুলারই কাল। খেলার ভিতর দিয়েই প্রথম প্রথম শক্তির বহিঃপ্রকাশ শুরু হয়। ক্রমে সমস্ত অন্তর দিয়ে তারা চায় বাহিরকে আত্মস্থ করতে অর্থাৎ এইভাবে শুরু হয় তাদের আত্মোপলব্ধি। বাহিরের জগতের সাথে তাদের পরিচয় শুরু হয় ইন্দ্রিয়ের মারফত। যে বস্তু বা বিষয়ের প্রতি তারা একসঙ্গে যত বেশী ইন্দ্রিয় নিয়োজিত করতে পারে তাদের পরিচয়ও হয় তার সাথে তত বেশী ঘনিষ্ঠ।

এই জন্য শিশু-শিক্ষার প্রথম ধাপ হবে তাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসমূহের অনুশীলনের সুযোগ দান। এ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি নিজের মনের মত করে কতকগুলো Gifts & occupations তৈরি করলেন। সেই সরঞ্জামগুলোকে তিনি অতীব পবিত্র মনে করতেন। এ-গুলো নিয়ে শিশুরা আপন মনে খেলবে এবং খেলার মাধ্যমেই তারা আহরণ করবে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা। এই সব স্বয়ংক্রিয় খেলায় পাবে তারা প্রচুর আনন্দ, এবং এভাবে আনন্দের মাধ্যমেই হবে তাদের প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ। এ খেলার ভিতরে পাবে তারা সৃষ্টির আনন্দ। ক্রমে এভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ পেয়ে তারা

গড়ে উঠবে এক একটি প্রকৃত মানুষ হয়ে। আগে খেলা, পরে হাতের কাজ, ক্রমে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, এমনি করে ধাপে ধাপে গড়ে উঠবে তাদের শিক্ষার বুনিয়াদ।

শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে ফ্রয়েবেল ও মন্তেসরী উভয়ের দানই অপরিসীম। ফ্রয়েবেলের ছিল ভাব, আর মন্তেসরীর ছিল অভিজ্ঞতা। ফ্রয়েবেলই সবার আগে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার একটি বাস্তব রূপ দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি শিশুকে দেখেছিলেন তার মৌলিকত্ব অস্বীকার করা যায় না।

ভগবানের বিশেষ প্রকাশ এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুর দল, তাদের নিয়ে ফ্রয়েবেলের ভাবনার অন্ত ছিল না। তাদের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই যেন একদিন তিনি পরপারে চলে গেলেন। তাই এই অসহায় শিশুদের কথা ভাবতে গেলেই শিশু-দরদী এই ফ্রয়েবেলের কথাই সবার আগে মনে হয়।

(গ) মাদাম মন্তেসরী (Montessori)

শিশু-শিক্ষায় স্বাধীনতা ও আনন্দের বাণী রবীন্দ্রনাথ, ফ্রয়েবেল, জন ডিউই প্রভৃতি মনীষিগণ সবাই প্রচার করে গেছেন। কিন্তু মাদাম মন্তেসরীর মত বিভিন্ন দেশের শিক্ষার ধারায় এমন ব্যাপকভাবে এ-বাণীকে ঢেলে দেবার সৌভাগ্য কেউ অর্জন করতে পারেন নি। (শিশুর অন্তরের অন্তস্থলে যে দেবত্বের আভাষ ফ্রয়েবেল দিয়ে গেছেন, সেই সুপ্ত চৈতন্যকে সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়ে তুলতে তিনি যেন বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।)

তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থা জীবতত্ত্বের মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই রচিত। ডাক্তারি পাস করে তিনি সর্বপ্রথম জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার স্বহস্তে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। যে পদ্ধতি অবলম্বনে জড় প্রকৃতির শিশুদের শিক্ষাদান কার্যে তিনি সফলতা লাভ করেছিলেন, সেই প্রণালী স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের পক্ষে কতটুকু কার্যকরী হতে পারে, সে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করে তিনি দেখলেন যে, প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই শিশুরা স্বাবলম্বী হতেই যেন বেশী পছন্দ করে। তিনি বললেন, স্বভাবতঃ যে বয়সে শিশুর চিন্তাশক্তি জাগ্রত হয় তার পূর্বেই শিশুর মনোজগতে নব নব ভাবধারা প্রবিষ্ট করাতে চেষ্টা করতে

হবে, এবং সে ব্যবস্থা করতে হবে তার ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমেই, বুদ্ধিকে আশ্রয় করে নয়। এই কার্যে শিশুর স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপরই সবিশেষ আস্থা স্থাপন করা সঙ্গত। তিনি লক্ষ্য করলেন, শিশু যা করতে চায়, তা সবই সে নিজে নিজে স্বাধীন ভাবেই করতে চায়। অপরের সাহায্য নিতে যেন সে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বরং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কেউ তাকে সাহায্য করতে গেলে সে নিতান্তই বিরক্ত এবং বিব্রত বোধ করে। সে নিজে নিজে স্বাধীন ভাবে যেটুকু সৃষ্টি করে তাতেই তার অপরিসীম আনন্দ।

তাঁর মতে, স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের উপরই শিশুর জ্ঞানার্জন, স্বাস্থ্যরক্ষা, সৌন্দর্যানুভূতি, সামাজিকতা, চরিত্রগঠন এবং সব মিলিয়ে ব্যক্তিত্ব একান্তভাবে নির্ভর করে। সে শিক্ষা লাভ করে সৃষ্টির আনন্দে মশগুল হয়ে। তাইতো তিনি বললেন, খেলা এবং আনন্দের মাধ্যমেই গড়ে উঠবে শিশু-শিক্ষার বুনিয়াদ। কোন কাজে আনন্দের ব্যাঘাত হলেই শিশুর মনে একটা বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং কালক্রমে মনোজগতে সৃষ্টি করে বিপ্লব। শিশুর চারিপাশে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে সে নিজ প্রয়োজনেই আপনাআপনি শিক্ষালাভ করতে পারে। নিজ প্রয়োজনেই একদিন সে লিখতে পড়তে শিখে নেবে। তাকে শুধু দিতে হবে সর্বপ্রকার পর্যবেক্ষণের সুযোগ।

মন্তেসরীর মতে, তিন বছর থেকে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত সময়ই শিশু-জীবনের সব চেয়ে মূল্যবান সময়। শিশু কর্মী, শিশু স্রষ্টা, এবং শিশুকেই একনিষ্ঠ শ্রমিক বলা যেতে পারে। মহামানব হবার সব রকম প্রস্তুতি শুরু হয় এই বয়সেই। মন্তেসরী-বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ তিন প্রকার কার্যকলাপের ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। ব্যবহারিক জীবনের কার্যকলাপ, ইন্দ্রিয়ানু-শীলন বিষয়ক কার্যকলাপ এবং তৃতীয়টি হচ্ছে শিক্ষামূলক যন্ত্রের (Didactic apparatus) ব্যবহার। এই সব কার্যকলাপের ভিতর দিয়ে শিশু গড়ে উঠবে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে, জেগে উঠবে তার জ্ঞানের স্পৃহা।

পুস্তক সম্পর্কে সাধারণতঃ শিশুদের একটা ভীতি পরিলক্ষিত হয়। এই জন্য পুস্তকের পরিবর্তে তিনি দিতে বললেন, খেলার জিনিস। এ ধরনের কতকগুলো খেলনা তিনি নিজেও তৈরি করে গেছেন। ফ্রয়েবেলের মত সেগুলোকে তিনি অতি পবিত্র মনে করে তার পেটেণ্ট বা একচেটিয়া করে যান নি। প্রয়োজন মত এ-গুলোর পরিবর্তন বা পরিবর্ধনে তাঁর কোন

আপত্তি ছিল না। মোট কথা, খেলনাগুলো শিক্ষামূলক হওয়া চাই তা'হলেই হল।

শিশুদের শারীরিক পুষ্টির দিকেও মন্তেসরী সজাগ দৃষ্টি রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। কেননা, স্বাস্থ্যহীন শিশুকে তার মনের খোরাক দিলেও, সে সহজে হজম করতে পারবে না। শিশুর বিরক্তি উৎপাদন করে এমন কোন ঘটনা বা কার্য যাতে না ঘটতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। অনর্থক বা অবান্তর কথা শিশু মোটেই পছন্দ করে না। শিশুর কাছে যত কথা অল্প তত খাসা গল্প। শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে সরলতাকেই প্রধান অবলম্বন করা দরকার। অস্পষ্ট হেঁয়ালিপূর্ণ কথা তার মনোরাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করে।

মন্তেসরীর মতে, স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই আপনাআপনি শিশুর শৃঙ্খলাবোধ জাগবে। শিশুর স্বভাবসুলভ চপলতাকে অনেক সময় উচ্ছৃঙ্খলতা বলে আমরা ভুল করি। একত্রে খেলাধূলার ভিতর দিয়েই ক্রমে তাদের দায়িত্ববোধ জাগবে এবং গড়ে উঠবে তাদের সামাজিক জীবন। একত্র মেলামেশা করে একে অপরের দেখাদেখি একত্রে বসবাস করার সমস্ত গুণাবলী তারা নিজেদের প্রয়োজনেই অর্জন করবে স্বেচ্ছায়। ভাল-মন্দ বোধ জাগ্রত হবার পূর্বে শিশুদের উপর কোন হুকুম জারি করা সঙ্গত নয়।

ছবি দেখিয়ে, গল্প বলে, ক্রমে ক্রমে তাদের মন জয় করতে হবে; স্নেহ ভালবাসা দিয়ে মনের গোপন খবর জেনে নেবার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে পরোক্ষভাবে তাদের সর্ব বিষয়ে সাহায্য করে যেতে হবে। শিশুর হৃদয় উজাড়-করা আনন্দ উচ্ছ্বাস, রঙ্গীন কল্পনা যেন কেবল বাহ্য পর্যবেক্ষণেই নিঃশেষিত হয়ে না যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের অদম্য কৌতূহলে উত্তরোত্তর ইন্ধন যুগিয়ে যেতে হবে। ইন্দ্রিয়সমূহকে নমনীয় অবস্থায়ই ইচ্ছামত রূপ দেওয়া সম্ভব। বিশৃঙ্খলভাবে একবার গড়ে উঠলে পরে তাদের আর নূতন করে রূপ দেওয়া অতীব কষ্টসাধ্য।

যদিও মন্তেসরী পদ্ধতিকে পুরাপুরি বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না, তথাপি 'ফলেন পরিচীয়তে' এই যুক্তির মাপকাঠিতে বিচার করলে এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মন্তেসরীর পদ্ধতি শিক্ষাজগতে যে একটি যুগান্তর আনয়ন করেছে এ-বিষয়ে প্রায় সবাই একমত। দেশে দেশে নার্সারী স্কুলের সংখ্যা-বৃদ্ধিই এ-পদ্ধতির জনপ্রিয়তা প্রমাণিত করে না কি?

(ঘ) জন ডিউই (John Dewey)

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ্ জন ডিউই ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর প্রকৃতির লোক। শিক্ষক হিসেবেই একদা তিনি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন এবং ৯২ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি শিক্ষারই সেবা করে গেছেন।

(তাঁর মতে, শিক্ষাই দর্শনের সক্রিয় রূপ।) তাঁকে অনেকে নিছক প্রয়োগবাদী (Pragmatist) বলেও অভিহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রয়োগবাদ ছিল খানিকটা আদর্শবাদ-ঘেঁষা, অর্থাৎ নিরীক্ষাবাদ হতে একটু আলাদা। ডিউইর দর্শনের ভিত্তি হলো তাঁর বহুলব্ধ অভিজ্ঞতা। সমসাময়িক দার্শনিকদের ভাষা এবং চিন্তার ধারাকে তিনি অবাস্তব বলতেন। অর্থাৎ দার্শনিকতত্ত্ব ও তাঁর দর্শন যেন একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর জীবের জন্য। সাধারণ মানুষের আওতায় তাঁরা আসতে চান না। অবশ্য এর জন্য দার্শনিকদের ব্যবহৃত ভাষাকেই তিনি বিশেষ ভাবে দায়ী করেছেন, এবং প্রথমেই তিনি ছদ্মবেশের এই মুখোশটি খুলে ফেলতে চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, সমাজ-জীবনের সমস্যাসমূহ যখন নানা জটিল আকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে যখন কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না, তখনই দর্শন নব নব কলেবর ধারণ করার অবকাশ পায়। যে দর্শনের সাথে বৃহত্তর সমাজের কোন যোগ নেই, সে দর্শন নিষ্ক্রিয় বৈ কি! (দর্শনকে জীবনযাত্রা হতে স্বতন্ত্র করে রাখার কোন সার্থকতা নেই বলে তিনি মনে করতেন।)

(তাঁর মতে, শিক্ষা একপ্রকার সামাজিক প্রচেষ্টা, এবং শিক্ষার তত্ত্বই হলো দর্শন।) দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষার ভিতর দিয়েই রূপ পরিগ্রহ করে। এমনিভাবে জন ডিউইর দ্বারাই রচিত হলো শিক্ষা ও দর্শনের মিলন-ক্ষেত্র। শিক্ষাকে বাদ দিয়ে কোন দর্শনই মন্ত্রবলে জীবনের মূল ধারণা ও মূল্যবোধ পরিবর্তনে সক্ষম নয়। যে প্রচেষ্টা দ্বারা জীবনের বিভিন্ন মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়ে সামাজিক জীবনে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমগ্র জীবন সার্থক ও সহজ হয়ে উঠে, তাকেই তিনি শিক্ষা নামে অভিহিত করেছিলেন। জড় বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চলে বিজ্ঞানের গবেষণাগারে (Labora-

tory), আর দর্শনের পরীক্ষা চলে জীবনের প্রতি স্তরে শিক্ষার ভিতর দিয়ে। তিনি স্পষ্টই বলতেন, আইন-সভা বা জন-প্রচারের সাহায্যে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। তরুণ মনের ক্ষেত্রে, যতক্ষণ নব্য ব্যবস্থার দর্শন, এই শিক্ষার ধারা বেয়ে না আসে ততক্ষণ সুফলের আশা আমরা করতে পারি না।

জীবনের তত্ত্বই দর্শন, এবং জীবনের প্রয়োজনেই শিক্ষা কালে কালে নব নব রূপ পরিগ্রহ করেছে। (সর্বপ্রকার সমন্বয় সাধনই ছিল তাঁর কর্ম-প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য।) (জড় ও জীবন, জীবন ও মন এবং মন ও সমাজ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন, এই ছিল তাঁর ধারণা।) যে শিক্ষার সাথে জীবনের কোন যোগ নেই, সে শিক্ষা প্রাণহীন; অতএব এই প্রাণহীন জড়বৎ শিক্ষা যে শুধু ব্যর্থতাই বহন করে আনবে এতে আর আশ্চর্য কি! শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই সমাজ, যুগের পর যুগ তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। জীব যেমন তার সন্তানসন্ততির মধ্য দিয়েই চিরকাল বেঁচে থাকার প্রয়াস পায়, সমাজও তেমনি তার ধারা বজায় রাখে শিশু ও তরুণদের মারফতই। (সমাজের স্থায়িত্ব, সমাজের উন্নতি-অবনতি, সবকিছুই নির্ভর করে শিক্ষার উপর। তাইতো বলা হয়েছে, তরুণ মনের নিষ্ক্রিয়তা সমাজকে অপমৃত্যুর দিকেই এগিয়ে নিয়ে যায়।)

তাঁর নিরীক্ষাবাদী মন প্রচলিত প্রায় সব কয়টি মতবাদকেই ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর কষ্টিপাথর দিয়ে বিচার করে তাদের অবাস্তবতা প্রমাণ করতে চেষ্টার ত্রুটি করে নি। যেমন,—

(১) "সুপ্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ মানসিক শক্তিসমূহের সামগ্রিক বিকাশসাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য।" এসম্পর্কে তিনি বলেছেন, পরিণত বয়সে মানবের যে-সকল শক্তির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়, শিশুকালে সে শক্তিসমূহ যে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকবে একথা মনোবিজ্ঞান-সম্মত নয়। মনো-বিজ্ঞানীরা বলেন, পরিবেশের প্রভাবে মানবের সহজাত প্রকৃতি ও আবেগের মিশ্রণে **নব নব শক্তির সৃষ্টি অসম্ভব নয়।** রুশো জন্মেছিলেন বিপ্লবের মাঝে, তাই শিশু বয়স হতেই তাঁর মনে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেছিল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তিনি চেয়েছিলেন শিশুকে সমাজের তিক্ততার বাইরে নির্মল প্রকৃতির কোলে ছেড়ে দিতে। সমসাময়িক শিক্ষাবিদ্‌গণ প্রায় সবাই রুশোর প্রভাবে প্রভাবিত। ডিউই বলতেন,

পরিপূর্ণতায় পৌছান যদি শেষ পর্যায়ে পৌছান বুঝায়, তাহলে তার মাপকাঠিই বা আমরা কোথায় পাব? সর্বোপরি, শিক্ষার এই স্থিতিশীল অবস্থা দার্শনিকগণের পক্ষে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

(২) **"শিক্ষার উদ্দেশ্য—ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি।"** এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, বর্তমানকে এভাবে উপেক্ষা করে অনাগত, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি মনোবিজ্ঞান-সম্মত নয়। মানবশিশু জড় পদার্থ নয়। তার নিজস্ব স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহকে উপেক্ষা করে অনিশ্চিতের পথে তাকে জোর করে টেনে নেবার কোন যৌক্তিকতা নেই।

(৩) **"শিক্ষার উদ্দেশ্য—মনের বৃত্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণ (Mental discipline)।"** তিনি বলেছেন, এ ধারণাটি সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষা এবং বিষয়বস্তু এই দুটিকে স্বতন্ত্র করে দেখতে গিয়েই এ-কল্পনা মানবমনে স্থান পেয়েছে। এই ব্যবস্থায় শিশুকে সমাজ থেকে আলাদা করে দেখা হয়েছে। কিন্তু শিশুও একটি সামাজিক জীব নয় কি?

এ মতবাদটিতে শিশুর মধ্যে যে-সব মানসিক শক্তির কল্পনা করা হয়েছে, বাস্তবে তার মূল্য কতটুকু?

এমনি করে সূক্ষ্ম বিচারে প্রচলিত মতবাদ প্রায় সব কয়টি তিনি খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে, **শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হবে বৃদ্ধি, বিকাশ এবং নির্দেশ** (Growth and Direction)। তিনি বলতেন, শিক্ষার বাইরে শিক্ষার কোন আদর্শ থাকতে পারে না। শিক্ষাই হলো শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য কখনো স্থিতিশীল হতে পারে না। যেহেতু সামাজিক পরিবেশ ভিন্ন শিশুর সম্যক বিকাশ সম্ভব নয়, সুতরাং সামাজিক জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশুর মানসিক বৃত্তিসমূহের বিকাশসাধনের সুযোগ দিতে হবে। বিদ্যালয়গুলিকে দিতে হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক সমাজের রূপ, এবং সেখানকার সমাজ-ব্যবস্থা হবে সহজ, সরল, পবিত্র এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ (Simplified, purified and better balanced society)। বৃহত্তর জীবনের বাস্তবধর্মী ক্রিয়াকলাপের সাথে যেন যোগসূত্র ছিন্ন না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এই সব সুগঠিত সামাজিক জীবন যাপনের মধ্য দিয়েই শিশু অর্জন করবে ভাবী কালের জটিল সমাজে বাস করার বিচিত্র অভিজ্ঞতা। জন ডিউইর মতে, গণতান্ত্রিক সমাজের পরিবেশ ভিন্ন ব্যক্তিত্বের সর্বতোমুখী বিকাশ সম্ভব নয়।

যা আছে এবং যা চাই, সবই জীবনে সত্য করে তোলার নামই শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি নয়। শিক্ষাকে বরং অভিজ্ঞতার সৌধ-নির্মাণ আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। শিশু-শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, শিশু-মনের কৌতূহল এবং কর্মৈষণা পূরণের যথাসম্ভব সুযোগ করে দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের পাতা থেকে শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে পাঠগ্রহণ নয়, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেই রচিত হবে শিশু-শিক্ষার ভিত্তি। শিক্ষাকে জীবন থেকে স্বতন্ত্র না করে শিক্ষাকে জীবনের স্রোতে ঢেলে দিতেই তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। একত্রে মিলে মিশে খেলাধূলার মারফত আনন্দে শিশুকে কাজ করে যেতে দেবার সুযোগ দিতে হবে। এভাবে চলার পথেই সে যেন আহরণ করে নেয় তার প্রয়োজনীয় সবকিছু।

শিক্ষাকে আধুনিক জীবনযাত্রার বাস্তব ক্ষেত্রের উপযোগী করে গড়ে তোলার কৃতিত্ব যাঁদের প্রাপ্য, জন ডিউইর স্থান তাঁদের পুরোভাগে। তিনিই জীবনপ্রবাহের ধারায় শিক্ষাকে প্রবাহিত করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর প্রগতিধর্মী শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবমুখী কর্মধারাকে তাঁর নিজের দেশ ছাড়া অপরাপর দেশেও রূপ দেবার চেষ্টা চলেছে! উনেট্‌কা, হোমারল্যাণ্ড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে তাঁর আদর্শের প্রয়োগ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সমাজ ও ব্যক্তি ভিন্ন নয়। যেমন সমাজের প্রয়োজনেই ব্যক্তি তেমন ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমাজ। শিক্ষায় সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেরণা সর্বপ্রথম তিনিই দিয়েছেন।

দীর্ঘ ষাট বছরের সাধনায় সমসাময়িক মননশীল জগৎকে তিনি তাঁর চিন্তার ধারায় প্রভাবান্বিত করে গেছেন। মৃত্যু পারেনি আজও তাঁর চিন্তার ধারাকে প্রতিহত করতে।

॥ তিন ॥

প্রাচীন ও প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি

প্রয়োজনের তাগিদেই আসে নব নব সৃষ্টির অবকাশ। পাঁচশত বছর আগে মানুষের যে-সব প্রয়োজন ছিল, এখন আমাদের প্রয়োজন কি তাতে মিটবে? সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চাহিদাও নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। অতএব শিক্ষার ধারায় রক্ষণশীলতা সর্বদা পরিত্যাজ্য। তাই বলে, নূতনের মোহে পুরাতন সবকিছুকেই অবজ্ঞা করবারও কোন যৌক্তিকতা নেই। আবার প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে হবে মনে করে, সুদূর অতীতের সবকিছুকেই আঁকড়ে থাকলে জাতির উন্নতি ব্যাহত হবে সন্দেহ নেই। অতীতের ভালকে ভাল বলতে দ্বিধারও কোন কারণ নেই। সবকিছুকেই সময়ের এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ-যোগ্য যা-কিছু তা সবই গ্রহণ করব, আর বর্জনীয় যদি কিছু থাকে তা বর্জন করতেও আপত্তির কোন কারণ থাকা সঙ্গত নয়। দেশ, কাল এবং পাত্রের বিচার এ-স্থলে গৌণ। উদ্দেশ্য শুধু **প্রয়োজন মেটানো।**

ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির কথা বলতে গেলে প্রথমে ব্রাহ্মণ্যযুগের কথা এবং তৎপর বৌদ্ধযুগের শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়। তৎকালে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখেই যদিও শিক্ষা-পদ্ধতি রচিত হয়েছিল, কিন্তু আসলে লক্ষ্য ছিল মুক্তি। এই মুক্তি বলতে, পুনঃ পুনঃ জন্মের হাত হতে নিষ্কৃতির কথাই তাঁরা চিন্তা করতেন।

ব্রহ্ম কী বস্তু? আত্মা কী? জন্ম ও মৃত্যুর অন্তরালে কী রহস্য লুকিয়ে আছে?—এ ধরনের দার্শনিক তত্ত্বসমূহের রহস্য উদ্‌ঘাটন মানসে জ্ঞানী গুরুগণ আজীবন কঠোর সাধনায় ব্রতী থাকতেন। এভাবে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ লাভ করে সমাজ-দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁরা একটি বিশিষ্ট শ্রেণীভুক্ত হয়ে যেতেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সমাজের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে সমাজের কল্যাণ সাধনে তাঁদের অবদান আশানুরূপ ছিল না। তাঁদের চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্যও অতি অল্প লোকেরই

হতো। এক কথায়, প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি সমষ্টিগত উৎকর্ষের চেয়ে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনেই অধিক সহায়তা করেছে, বলতে হবে। অতএব, প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য উভয়ই বর্তমানে গ্রহণযোগ্য কি না, এ বিষয়ে বিস্তর মতভেদ বিদ্যমান।

সেকালে শিক্ষাদান কার্যটি ধর্মাচার্যগণের একচেটিয়া ছিল। তাই শিক্ষাও ছিল ধর্মের একটি অঙ্গস্বরূপ। শিক্ষার্থীর এবং বিষয়বস্তুর সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কাজেই শিক্ষার্থীদের পৃথক করে আর ধর্মশিক্ষা দেবার কোন প্রয়োজন হতো না। কিন্তু বর্তমান যুগে এ সমস্যাটি হয়ে পড়েছে অত্যন্ত জটিল। শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তু এখন আর সীমাবদ্ধ নেই, অথচ পৃথক করে ধর্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থা করাও অনেক কারণেই অসম্ভব। তাইতো অনেক ভেবে-চিন্তে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের ডেকে নিয়ে গেলেন তপোবনের সেই স্নিগ্ধ অনাড়ম্বর পরিবেশে, যেখানে একত্র বসবাসের ভিতর দিয়েই তারা লাভ করতে পারে প্রয়োজনীয় ধর্মতত্ত্বের জ্ঞান। প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবও কম নয়, একথা মহামতি রুশোও বারবার উল্লেখ করেছেন। গান্ধীজীর গ্রাম-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ও তাই। শিক্ষাকে শহর থেকে গ্রামের পরিবেশে টেনে আনতে আজ সবাই চেষ্টিত। কি করে আধুনিক শহরের বিষাক্ত বায়ু হতে শিক্ষাকে বাঁচাতে হবে, এ ভাবনা আজ সবাই করছেন। এক কথায়, শিক্ষায় তপোবনের সেই প্রাচীন আদর্শের প্রতি পরোক্ষে একটু শ্রদ্ধা সবার মনেই জাগছে। এতে করে পৃথক ভাবে ধর্মোপদেশ দেবার সমস্যাটিরও একটি সুন্দর সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না কি?

প্রাচীন ভারতে শিক্ষকের যে সম্মান ছিল, আজ কোন তরফ থেকেই অনুরূপ সম্মানলাভ কোন শিক্ষকের ভাগ্যেই জোটে না। বর্তমান সময়ে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের সম্মান করা দূরে থাকুক, তাদের স্বার্থোদ্ধার না হলে নানাভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিব্রত করতেও তারা দ্বিধা করে না। এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য সমাজ কিংবা রাষ্ট্র কোন তরফেরই কোন সদিচ্ছা আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্তমান সমাজে নীতিবোধের মানদণ্ড এমন একটি পর্যায়ে এসেছে যে, এর ফল জাতীয় জীবনে ভাল কি মন্দ সে-কথা গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" এ বাক্যটি শিক্ষার্থী মাত্রই তখনকার দিনে বেদবাক্যের মত অবশ্য পালনীয় বলে বিশ্বাস

করত। আজ এ মনোভাবকে সঙ্কীর্ণ কুসংস্কার আখ্যায় আখ্যাত করতে সমাজ মোটেই কুণ্ঠিত নয়। একলব্যের গুরুদক্ষিণা, আরুণীর গুরুবাক্য-পালন—অতীতের এই সব আখ্যায়িকা বর্তমান শিক্ষার্থীদের কাছে শুধু অবিশ্বাস্যই নয় বরং নানারূপ বিরূপ সমালোচনার বিষয়বস্তু। একলব্য ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন আদর্শ ছাত্র। একলব্যের মত গুরুতে নিষ্ঠা এখন আশা করা বাতুলতা। তখনকার দিনে শিক্ষা-সমাপনান্তে গুরুকে প্রাণপণে খুশী করাই ছিল আদর্শ শিষ্যের কর্তব্য। তাইত নিজের ভবিষ্যতের কথা একবারও না ভেবে একলব্য তাঁর নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি কেটে গুরুকে দক্ষিণা দিতেও মোটেই ইতস্ততঃ করেন নি। আজ সে-সব কথা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতো এযুগে ততটুকু আশা করা আকাশ-কুসুম কল্পনার সমতুল্য। চরিত্রগঠনে প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির দান ছিল অপারসীম। গুরুসেবার ভিতর দিয়ে বিদ্যার্থীরা নানাবিধ সদ্‌গুণের অনুশীলন করার সুযোগ পেত। অক্লান্ত কায়িক শ্রম ও কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে তাদের দেহ ও মন হয়ে উঠত সুগঠিত। এভাবে শিক্ষার সাথে সাথে সবাই সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে উঠত, এবং শিক্ষা-সমাপনান্তে সমাজে ফিরে এসে হতো না তারা আর সমাজের গলগ্রহ। আজকালকার মত তখনকার দিনে শিক্ষালাভ শেষ করে সমাজে এসে শিক্ষিত ব্যক্তিরা সমাজের দায় না হয়ে বরং বাড়িয়ে তুলত সমাজের সম্পদ।

নালন্দা, তক্ষশিলা প্রভৃতি তখনকার দিনের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যে-সব বিবরণ আজ পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাতে বর্তমানেও ঐ ধরনের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার পক্ষেই যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় অধিক। তেমনি ভাবে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন ছাত্রাবাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায়তা হবে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধের কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষার সাহায্যে যদি সত্যি সত্যি মানুষ গড়ে তুলতে হয়, তাহলে ছেলেমেয়েদের নৈতিক চরিত্র গঠন বিষয়ে যত্নবান হওয়ার সময় এসেছে বলে মনে হয়।

জন ডিউই প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষায় গণতন্ত্রের যে আদর্শ আজ প্রচার করেছেন, বৌদ্ধযুগের শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও সেইরূপ গণতন্ত্রের আদর্শের আভাষ

আমরা পাই। তৎকালে শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেশের রাজার বা শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ ছিল না। একমাত্র শিক্ষাগুরুদের হাতেই শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত ছিল। **এই কারণে তখনকার সময় রাজনীতির ছোঁয়াচ হতে শিক্ষা তার আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলতে সক্ষম হতো।** বর্তমান সভ্যতার বিষময় ফল নানা মতবাদের লড়াই। তরুণ মনে এই সংগ্রামের বীজ অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পেলে, অনুকূল পরিবেশে একদিন হয়ত সে বিরাট একটি বিষবৃক্ষে পরিণত হবে। নানা মতবাদের সংঘাত হতে শিশুদের দূরে রাখতে না পারলে, মুক্ত বায়ুর অভাবে তাদের স্বাধীন চিন্তা কোন কালেই পুষ্টিলাভ করার সুযোগ পাবে না। শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা দানই হলো শিক্ষাপদ্ধতির মূলসূত্র। অতএব সর্বপ্রযত্নে এই সূত্রটির মর্যাদা রক্ষা করা কর্তব্য।

প্রাচীনকালে শিক্ষার চারিটি বিশেষ স্তর ছিল; যথা, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। তাছাড়া প্রত্যেকটি স্তরের শিক্ষা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটি স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত না হলে অপর স্তরে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হতো না। শিক্ষায় এ-ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তরের প্রয়োজনীয়তা আজও অস্বীকার করার উপায় নেই।

এভাবে বিচার করে অতীতের ভালকে বর্তমানে গ্রহণ করতে দ্বিধার কোন কারণ নেই। পুরাতন যুগের ব্যর্থতার গ্লানিকে পুনঃ পুনঃ আলোচনার বিষয়বস্তু না করে, নূতন যুগের উপযোগী করে শিক্ষাকে ঢেলে সাজাতে আপত্তি কি? দেহের পুষ্টির জন্য যেমন শুধু কয়েকটি অঙ্গের পুষ্টি বিধানের চেষ্টা করলেই চলে না, ঠিক সেইরূপ সমাজ-দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিশুর দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ভিন্ন সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। মনুষ্যশিশু যন্ত্র অথবা যে-কোন পার্থিব বস্তু হতে মহার্ঘ। এক একটি মানবশিশু পৃথিবীবক্ষে অবতীর্ণ হবার সাথে সাথেই সমাজের স্কন্ধে এক একটি নূতন দায়িত্ব অর্পিত হতে থাকে। শিশুটিকে সমাজের অঙ্গীভূত করে সমাজের সমৃদ্ধির খাতিরেই তার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করতে যে-সমাজ অক্ষম, অভিশাপের গ্লানি তাকে বহন করতেই হবে।

এবারে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক্। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বুনিয়াদ রচিত

হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে, বেনিয়া কোম্পানির উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে। সস্তায় চাকর তৈরি করার প্রয়োজনে একদা কোম্পানির কর্মচারিবৃন্দ যে শিক্ষা-ব্যবস্থা এদেশে চালু করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, আজও আমরা শুধু সেই কাঠামোর উপরই বার বার রং লাগাচ্ছি মাত্র। সে শিক্ষার দৌলতে সমাজে যে কল্পিত শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল, আজও সমাজের সে গ্লানি আমরা মুছে ফেলতে পেরেছি কি? দু'পাতা ইংরেজী জানলেই, ফিরিঙ্গীদের মত করে দুটো ইংরেজী বুলি আওড়াতে পারলেই জাত্যংশে সে অনেক উঁচুতে, এ ধারণা মন থেকে যে কিছুতেই যেতে চায় না। শিক্ষিত বলতে আজও আমরা বুঝি শুধু ভাল ইংরেজী-জানা লোক। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের এই যে একটা কল্পিত মাপকাঠি একদা শাসক-গোষ্ঠীর কল্যাণে এদেশে রচিত হয়েছিল, তাকেই আঁকড়ে রাখার একটা অশোভন প্রচেষ্টা আমাদের আজও অনেকের কার্যকলাপেই ধরা পড়ে। শিক্ষিত বলতে আজও কি আমাদের মেনে নিতে হবে যে, শুধু বিদেশী-ভাবাপন্ন হওয়া? জাতির এ দৈন্য ঘুচাবার সময় কি এখনো আসে নি?

নিছক চাকরি করার যোগ্যতা অর্জনই যে-দেশের শিক্ষার উদ্দেশ্য, সে-দেশে 'শিক্ষা' সংজ্ঞাকে গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে না কি? দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির উৎকর্ষের মাপকাঠি এসে দাঁড়িয়েছে পরীক্ষা-পাসের সংখ্যার উপর। শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যও থাকে শুধু 'যেন তেন প্রকারেণ' পরীক্ষায় পাস করা, কাজেই শিক্ষকের কর্তব্যও হলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরীক্ষা-পাসের কৌশলসমূহ আয়ত্ত করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা। ছাত্রছাত্রীর অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করার আর সময় থাকে না। রাত জেগে জেগে স্বাস্থ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেও পাসের পড়া মুখস্থ না করে উপায় নেই।

সবচেয়ে বড় প্রহসন হলো, মস্তিষ্কের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ রক্ষা না করেও আমাদের দেশে মাথাওয়ালা আখ্যা লাভ করা যায়। সাত তাড়াতাড়ি যেভাবেই হোক কতকগুলো সংবাদের বোঝা সংগ্রহ করে, নির্দিষ্ট দিনে সেগুলো পরীক্ষার খাতায় চিত্রিত করে আসতে পারলেই হলো। ক'দিন বাদে যদি সৌভাগ্যক্রমে একটা ছাপ পড়ে যায়, তাহলেই তো সে হয়ে যাবে শিক্ষিতের পর্যায়ভুক্ত। অধিকাংশ অভিভাবক সম্প্রদায়ই তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে শুধু ভাবতে থাকেন, কবে

তারা মার্কা নিয়ে বেরিয়ে আসবে। পরীক্ষার ফলাফল যেদিন বের হবার কথা, সেদিন যেন সবারই মনে একটা আতঙ্কের ভাব। দেখলে মনে হবে যেন একমাত্র পরীক্ষার ফলাফলের উপরই তাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। ছেলে 'মানুষ' হয়ে বের হলো কি না সেদিকে তলিয়ে দেখার অবকাশ কোথায়!

প্রচলিত বিদ্যালয়সমূহের একটি অতি উপভোগ্য বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—"স্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটি অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া এই কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারের মুখও চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন। ছাত্রেরা দুই-চার পাতা কলেছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ী ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় সেই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপর মার্কা পড়িয়া যায়। কলের একটা সুবিধা এই যে, ঠিক মাপে এবং ঠিক ফরমাশ দেওয়া জিনিসটি পাওয়া যায়। এক কলের সঙ্গে আর এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড় একটা তফাৎ থাকে না, তাই মার্কা দিবার সুবিধা হয়।"

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি প্রধান ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করে রবীন্দ্রনাথ অপর এক স্থানে বলেছেন,—"আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ; কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য ও আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। কেবলমাত্র যতটুকু শিক্ষা আবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভাল করিয়া মানুষ হইতে পারে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।"

আমাদের প্রচলিত শিক্ষায় কাহারও স্বাধীনতা নেই—না ছাত্রের, না শিক্ষকের। সমস্ত ব্যবস্থাটাই যেন একটা কল্পিত গণ্ডি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। কাজেই এই আনন্দহীন শিক্ষা-ব্যবস্থা এতই নীরস যে, একে রসাল করে পরিবেশন করা এক অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। কোন কারণে স্কুল ছুটি হবে শুনলেই ছাত্র ও শিক্ষক, সবার মনেই একটা আনন্দের লহরী বয়ে যায়।

এ কয়েদখানায় থাকতে যেন কেউ রাজী নয়। অনেক বিদ্যালয়েই দেখা যায়, হয়ত প্রথম শ্রেণীতে ছাত্র রয়েছে একশত জন, চার বছর পরে কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা চল্লিশও টিকছে না। তদুপরি, পড়া সাঙ্গ করে যারা ঘরে ফিরল, তারাও শিক্ষিত বলে অভিমানে পিতার সাথে মাঠে গিয়ে লাঙ্গল ধরতে নারাজ। এভাবে জাতির অপচয় ও অধঃপতন দিন দিন বেড়েই চলেছে না কি ?

গান্ধীজী-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষায় এই গলদ দূর করার একটা প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তথাকথিত শিক্ষিত-অশিক্ষিতের এই কাল্পনিক শ্রেণীবিভাগ আমাদের সমাজে যে কি পরিমাণে বিচ্ছেদের বিষ ঢেলে দিচ্ছে, সে সত্য আজ আর কারো কাছে অবদিত নেই। সবার আগে সমাজ-দেহ হতে এ-বিষ নষ্ট করে ফেলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে জোড়াতালি দিয়ে চালাতে গেলে তার প্রকৃতিগত পরিবর্তন কোন কালেই আশা করা যায় না। শুধু লিখতে পড়তে শিখলেই কি জীবনের সমুদয় সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা আয়ত্ত করা সম্ভব ? চলতি শিক্ষার সাথে জীবনের যোগাযোগ অতি অল্প। অতিরিক্ত অভ্যাস গঠনের প্রয়াস মানুষের স্বাধীন সত্তাকে ডুবিয়ে রাখে এবং তাকে যান্ত্রিক করার দিকেই ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না কি ? কাজেই, শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার নয়, একে ভেঙ্গে আবার নূতন করে গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

সদা পরিবর্তনশীল এই জগৎ। বিশেষ করে এখন বিজ্ঞানের যুগে পরিবর্তনের গতিও অতি দ্রুত। বাঁচতে হলে এ-গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। অতীতের মোহে অতীতকে শুধু আঁকড়ে থাকলে চলবে না। অবশ্য, তাই বলে অতীত অভিজ্ঞতার কোন মূল্য নেই একথা ভাবাও ঠিক নয়। অতীতের সাথে সাথে বর্তমান ও ভাবী কালকেও দিতে হবে সমান প্রাধান্য। আজও আমাদের বিদ্যালয়সমূহে বিদ্যার্থীদের মস্তিষ্কে কতকগুলো সংবাদের বোঝা চাপিয়ে দেবার চেষ্টাই চলেছে। কোন প্রকারে পরীক্ষার কাগজে সেগুলো উদ্ধৃত করে মার্কা আদায় করাই থাকে মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রেণীকক্ষে ছেলেমেয়েরা যেন নির্বাক দর্শক এবং নিষ্ক্রিয় শ্রোতা। বক্তা একমাত্র শিক্ষক এবং বক্তব্য কতকগুলো হাত-ফেরতা (Second-hand) সংবাদের মর্ম।

পুস্তকে লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা মুখস্থ করে সত্যিকারের কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যায় না। সবই শেষ পর্যন্ত 'জলে না নেমে সাঁতার শেখা'র প্রহসনেই পর্যবসিত হয়। কিন্তু লক্ষ্য যেখানে পরীক্ষায় পাস করা, সেখানে সাত তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়েদের স্মৃতির ভাণ্ডারে কতকগুলো তথ্য চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় কি? এক কথায় বলা চলে, প্রচলিত বিদ্যালয়সমূহে মুখ্যতঃ স্মৃতিশক্তির খানিকটা চর্চা করা হচ্ছে বইত নয়। তাই কথায় বলে, যে সেপাই-এর ভাণ্ডারে প্রচুর গোলাবারুদ মজুত আছে অথচ বন্দুক চালাতে শেখে নি, তার চেয়ে যে বন্দুক চালাতে জানে তার ভাণ্ডার অপূর্ণ হলেও সে বেশী শক্তিমান্। ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে যে সমস্ত বিদ্যা অর্জন করছে তার অধিকাংশের ব্যবহারই তারা জানে না। কোন বিষয় ভাল করে বুঝে নেবার অবকাশও যেন তাদের নেই। চিন্তা করতে হবে এমন কোন কাজে তাদের মন বসতে চায় না। কি করে পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এই একটিমাত্র চিন্তাই তাদের সমস্ত মনঃপ্রাণ জুড়ে আছে।

চিন্তার এ-দীনতা জাতির নির্জীবতার লক্ষণ নয় কি? কতকাল আর আমরা এমনিভাবে গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসিয়ে চলব? প্রাচীনকে অবজ্ঞা করেই যেন আজ অনেকে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। পারছি না বর্তমানকেও সম্যগ্‌রূপে আঁকড়ে ধরতে। ভাবী কালের কোন উজ্জ্বল চিত্র আঁকবার সাহসও যেন হারিয়ে ফেলেছি। কেবল এর ওর কাছ থেকে বিভিন্ন আদর্শ ধার করে তাতে রং লাগিয়ে ঢেলে দেবার চেষ্টা করছি চলতি স্রোতে। ফলে, গতানুগতিক স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে সবকিছুই। বন্দর আর খুঁজে পাচ্ছি না। অতএব, খানিক থেমে, একটু দম নিয়ে তারপর লক্ষ্য স্থির করে আবার চলা শুরু করতে আপত্তি কি?

॥ চার ॥

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কার্যকলাপ

(Activities in Schools)

ছেলে একটু বড় হলেই তার পিতামাতা অস্থির হয়ে পড়েন, এখন ছেলেকে স্কুলে ভরতি না করে দিলেই নয়। আজকাল ছেলেমেয়েদের যে-কোন একটা স্কুলে ভরতি করে দেওয়ার সমস্যাও অপরাপর সমস্যার মতই সুকঠিন। তাইত স্কুল একটা পেলেই হল, সেখানে কোন প্রকারে ছেলেটির স্থান করে দিয়ে আসতে পারলেই আমরা অনেকটা হালকা বোধ করি। ছেলে পুঁথি-বগলে রোজ সময় মত বিদ্যালয়ে যাতায়াত করছে দেখলেই যেন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস আপনা হতেই বেরিয়ে আসে। তারপর বৎসরান্তে শ্রেণী প্রমোশনের সময় মনটা একটু চঞ্চল হয়। ছেলে প্রমোশন পেয়েছে শুনলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে। নূতন পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহ করার চেষ্টায় কিছুদিন চলে যায়। তারপর নিশ্চিন্ত মনে আবার নিজের কাজে ডুবে যাই। ছেলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে ক'দিন বেশ একটু অশান্তি অনুভব করি। স্কুলের পড়াশুনা সম্বন্ধে মনে একটু সন্দেহ জাগে। শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টকে দোষারোপ করে, 'আর এক বছর চেষ্টা করুক'—এই বলে মনকে প্রবোধ দিয়ে সংসারের কাজে আবার মনোনিবেশ করি। এতদিন স্কুলে যাতায়াত করে ছেলের কি ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে এবং সে পরিবর্তন তার নিজের কিংবা সমাজের কোন প্রয়োজনে লাগবে কিনা—এসব কথা চিন্তা করার সময় কৈ? স্কুলে পাঠিয়াছি লেখাপড়া শিখতে। আর স্কুলে তো লেখাপড়াই শেখান হয়। কাজেই আমার অত কথা ভাববার দরকার কী?

অনেক দর-দরবার করে সরকার থেকে বিদ্যালয় খুলবার অনুমতি পাওয়া গেছে—শিক্ষক-শিক্ষিকাও সংগ্রহ হয়েছে, সাজ-সরঞ্জামেরও বিশেষ কোন অকুলান নেই। আর স্কুল খুলতে না-খুলতেই ত দলে দলে ছেলেমেয়ে ভরতি হবার জন্য ভিড় করতে আরম্ভ করেছে। অতএব স্কুলটি যে ভাল, সে

বিষয়ে আর সন্দেহ থাকবে কেমন করে? স্কুলে যাতায়াত করে ছেলেমেয়েরা কি শিখবে না-শিখবে তার ত একটা নির্দিষ্ট ছক তৈরীই আছে। তবে আর ভাবনা কী? কিভাবে শেখালে ছেলেমেয়েরা তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে সে-সব ব্যবস্থার ভার ত দেশের জ্ঞানিগুণীদের হাতেই ন্যস্ত করা আছে। দোকান যাঁরা খুলেছেন তাঁরাই ত জানেন সেখানে বিক্রির জন্য কি-কি মাল রাখলে ভাল হবে। সাধারণ দোকানে ক্রেতার চাহিদা বুঝে বিক্রেতা মাল মজুদ করেন। কিন্তু এ দোকানটি এমন, এখানে মাল যাই রাখা হোক না কেন খদ্দেরকে তা নিতেই হবে। খদ্দেরের রুচি ও যোগ্যতার অনুরূপ এর ব্যবস্থা নয়। দোকান খুলতে না-খুলতেই এ দোকানে ক্রেতারা এসে ভিড় জমায়। আরও একটি মজার কথা হল, এ দোকানের যাঁরা এজেন্সি নেন, আসল মালিকের নির্দেশ ছাড়া তাঁরাও দোকানে ইচ্ছামত কোন জিনিস রাখতে পারেন না। অতএব আমাদের অতশত ভাববার দরকার কী? দোকান খোলার সাথে সাথেই আমরাও আমাদের বাচ্চাদের ঐ দোকানে মাল কিনতে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হই। কি করব? ছেলেমেয়েদের ঐসব দোকানে না পাঠালে যে আমরা ঘরেও সোয়াস্তি পাই না। কিন্তু ছেলেমেয়েদের ওখানে পাঠিয়েছি পড়াশুনা করতে। ওখানে আবার এত কাজকর্ম কিসের? স্কুলগুলিতে আজকাল এত হৈ চৈ চলছে কেন বুঝতে পারছি না! দিনের পর দিন লেখাপড়া ছেড়ে, ছেলেমেয়েরা শুধু খেলা-ধুলা, সভা-সমিতি, গান-বাজনা, দলবেঁধে কায়িক শ্রম, গ্রাম-সংস্কারের নানাবিধ কাজ ইত্যাদি করে এত যে সময় নষ্ট করছে তা কি কারো নজরে পড়ে না? এসব দেখে শুনে হতাশায় বুক ভেঙ্গে যায়। কেন যে স্কুলে পাঠিয়েছিলাম সেকথা ভেবে আফসোসের আর সীমা থাকে না। ধীরে ধীরে সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর। স্কুলের এ অবস্থা আর বেশীদিন চলতে দিলে, ছেলে-মেয়েরা যে গোল্লায় যাবে! খবরের কাগজের মারফত বিদ্যালয়ের এ দুর্দশা সবাইকে জানাতে চেষ্টা করি—যদি কোন প্রতিকার হয়!

আগেকার দিনে কিন্তু স্কুলে এত সব কাজকর্ম ছিল না। তখন কি ছেলেরা মানুষ হত না? এ ধরনের জিজ্ঞাসা অনেক অভিভাবকই করে থাকেন। কিন্তু একথাও আমাদের বুঝা উচিত যে, তখনকার সমাজ আর এখনকার সমাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য। বিদ্যালয় ছেড়ে

বাইরে এলে এ জটিল সমাজে বাস করার যোগ্যতা ছাত্রছাত্রীরা কতটুকু অর্জন করেছে—এ খবর নেবার আজ দরকার হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর দেশের মনীষিগণ স্পষ্ট ভাবেই একথা ঘোষণা করেছেন যে, ছেলেমেয়েদের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার সাথে সাথে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন, এবং বাস্তব সংসারের জন্য তাদের আচরণ মার্জিত করার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রতিটি বিদ্যালয়ের অবশ্য কর্তব্য। শিক্ষার সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ঠু নাগরিক তৈরি করার উপরই জাতির উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। আজ যারা স্কুলের ছাত্র কাল তারাই হবে দেশের নাগরিক। দেশকে পরিচালনা করার ভার তারাই একদিন গ্রহণ করবে। অতএব জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের শুধু পড়া-লেখা এবং গণিতের আঁক কষতে শেখানই কোন বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হতে পারে না। শিক্ষার সাহায্যে দেশের ছেলেমেয়েদের আদর্শ নাগরিক করে গড়ে তুলতে গিয়েই ত আমদানি করতে হয়েছে—বিদ্যালয়ে নানা প্রকার কার্যকলাপ (Activities)। ভারত এখন একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এবং ভারতবাসী মাত্রই এ রাষ্ট্রের একজন নাগরিক। ভারতের আপামর জনসাধারণকে শুধু অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই যদি দিকে দিকে শিক্ষায়তনের ছড়াছড়ি হতে থাকে, শুধু পড়া-লেখা এবং গণিতের আঁক অর্থাৎ Three R's সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান দান করাই যদি বিদ্যালয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়, তা'হলে ভারত রাষ্ট্রের প্রতিটি সভ্যকে সত্যিকারের নাগরিক জীবন যাপনের যোগ্য করে প্রস্তুত করার দায়িত্ব কার? নাগরিক প্রস্তুতের ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যালয়ের কি কোন অবদান থাকবে না? ছেলে শুধু লিখতে পড়তে পারলেই কি সে বর্তমান জটিল সমাজে বাস করার উপযুক্ত হল? অতএব বর্তমানে সমাজ এবং রাষ্ট্রের খাতিরেই শিক্ষার উদ্দেশ্যের সংস্কারসাধনও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

পড়া-লেখা শেখানর সাথে সাথে দেশের ছেলেমেয়েদের আচরণ মার্জিত করার দায়িত্ব আজ বিদ্যালয়সমূহকেই গ্রহণ করিতে হবে। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সমাজের এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণে রূপান্তরিত করা। সেই বিদ্যালয়-সমাজ এমন হবে যেখানে একত্রে বসবাসের এবং নানা ধরনের যৌথ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেশের ছেলেমেয়েরা পড়া-লেখার সাথে সাথে নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে পারে

সু-নাগরিক হিসাবে বসবাস করার উপযোগী করে। বিদ্যালয়ের ক্রিয়া-কলাপের সাহায্যে দেশের শিশুদেরকে বলিষ্ঠ দেহ ও বলিষ্ঠ মন-সম্পন্ন করে তুলতে পারলেই সমাজ সত্যিকারের লাভবান হবে সন্দেহ নেই। এবং এ ধরনের শিক্ষাই জাতিকে সত্যিকারের উন্নতির পথে নিয়ে যেতে সক্ষম। বিশ্বের অপরাপর উন্নতিশীল জাতিসমূহ কিভাবে শিক্ষার মারফত অতি অল্প সময়ে তাদের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হয়েছে—সেকথা আজ আমাদের ভেবে দেখার সময় হয়েছে। অতএব দেশের ছেলেমেয়েদের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার সাথে সাথে তাদের যাতে কতকগুলো সুঅভ্যাস গড়ে ওঠে সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া দরকার। দেশের জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করা জাতিগঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু অক্ষরপরিচয় করিয়ে তাদের সমাজে ঠেলে দিলে কারো কোন লাভ হবে না। যেটুকু শিখে তারা বিদ্যালয় থেকে ঘরে ফিরল, চর্চার অভাবে সেটুকুও অতি অল্প সময়েই তাদের স্মৃতি থেকে ধুয়ে মুছে যাবে। উন্নত জীবন যাপন করতে হলে যে, লেখাপড়া শেখা দরকার—অন্ততঃ এ জ্ঞানটুকু সবাইকে দিয়ে দিতেই হবে। তাছাড়া লেখাপড়ার একটা সুঅভ্যাস অন্ততঃ যদি জীবনে গঠিত করে না দেওয়া যায়, তা'হলে সামান্য একটু লিখতে পড়তে শিখিয়ে লাভ কি? অতএব ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় ছেড়ে ঘরে ফিরে এলেও যেন তারা কিছু সঙ্গে করে নিয়ে আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। পাঠশালা ছেড়ে দিলেও পাঠশালার একটি ছাপ যেন ছাত্রছাত্রীদের জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকে সে ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকা দরকার। নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের নাগরিক জীবনের কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করে তুলতে হবে। সম্ভাবে জীবন কাটাতে হলে কিভাবে চলা দরকার, ব্যক্তিগত ও সমাজগত স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করতে হলে, কি কি করা প্রয়োজন ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ না দিয়ে কাজের মধ্য দিয়ে ঐসব অতিপ্রয়োজনীয় অভ্যাসসমূহ ছেলেমেয়েদের জীবনের ছন্দের সাথে গেঁথে দেবার চেষ্টাই হবে বিদ্যালয়ের আসল কাজ। বিদ্যালয়ে থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের (Activities) মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা উপলব্ধি করার সুযোগ পাবে যে, শ্রমেরও একটা মর্যাদা আছে। একত্রে খেলাধুলা করতে গিয়ে তারা বুঝতে পারবে যে, নিজের স্বার্থেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা মেনে চলার

প্রয়োজন কত, পরস্পরের সহযোগিতার মূল্য কতখানি, সমাজে চলার মত নানাবিধ গুণাবলী অর্জন করা নিজেদের উন্নতির জন্যই কতখানি প্রয়োজন।

এসব ক্রিয়াকলাপ যে-উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিদ্যালয়ে প্রচলন করা হয়েছে সেই সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পরিচালকদের থাকা দরকার। মোটামুটি বলা যেতে পারে শারীরিক (Physical), মানসিক (Mental) এবং নৈতিক (Moral) উন্নতি সাধনের নিমিত্তই ঐসব ক্রিয়াকলাপের প্রচলন। ছেলেমেয়েদের হৃদয়াবেগের (Emotion) সমন্বয়সাধন একমাত্র দলগত ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই সম্ভবপর। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়—ছেলেমেয়েরা যখন এই সব অত্যাবশ্যকীয় ক্রিয়াকলাপে রত থাকে তখন এর উদ্দেশ্যটি পরিচালকগণও অনেক সময় স্মরণ রাখেন না। ফলে, খেলা শুধু ছেলেখেলাই থেকে যায়। "খেলার সাহায্যে স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা এবং সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলা মেনে চলার প্রবৃত্তি গঠন"—এটা একটা কথার কথাই থেকে যায়। খেলতে নেমে জয়লাভ করার উৎসাহে মাত্রাতিরিক্ত শ্রম করে কত ছেলে যে অকালে স্বাস্থ্য খুইয়ে ফেলে তার সংখ্যা দেশে নগণ্য নয়। খেলার সময়টুকু হয়ত বেশ শৃঙ্খলা মেনেই চলে। কিন্তু খেলা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হয়ত তারাই যোগ দেয় নানা উচ্ছৃঙ্খল আচরণে। মাঠের বাইরেও যে শৃঙ্খলার প্রয়োজন আছে একথা তারা ভাবতেই পারে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে আনন্দ পেলে, আর খেলার মাঠে শৃঙ্খলা মেনে চললে লাভ কি হল? এতে বুঝা যায় শৃঙ্খলা রক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যটি বুঝবার সুযোগ তারাও পায়নি কিংবা তাদের বুঝিয়ে দেবার সেরূপ কোন ব্যবস্থাও আমাদের নেই। N. C. C., A. C. C., Scout ইত্যাদি কতনা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বিদ্যালয়সমূহের সাথে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায়—গায়ের পোশাক খুলে রেখেই হয়ত অনেকে ছুটে যায় নানা অসামাজিক কাজে যোগ দিতে। কিন্তু ঐসব প্রতিষ্ঠানের মারফত ছেলেমেয়েরা যখন অতিমাত্রায় উৎসাহ এবং উদ্দমের সঙ্গে যোগ দেয় নানা সমাজ-উন্নতি-মূলক কাজে তখন দেখে সত্যি প্রাণে আশা জাগে। নবীন ভারতের কতনা উজ্জ্বল চিত্র কল্পনায় আঁকতে শুরু করে দি। কিন্তু, স্বপ্ন ভাঙ্গে তখন, যখন দেখি ঐসব ছেলেমেয়েরাই সমাজের উন্নতির মূলে সজোরে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হয়। অতএব, অধুনা বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত ক্রিয়াকলাপসমূহ মূল উদ্দেশ্য হারিয়ে অকাজে পরিণত হয়। ঐসব

ক্রিয়াকলাপের মূল উদ্দেশ্যই যদি এভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে আফসোসের আর সীমা থাকে না।

ছেলেমেয়েরা যখন কোন একটি সঙ্কল্প নিয়ে কাজ আরম্ভ করে, তখন তাদের আসল লক্ষ্য থাকে কিভাবে কাজটিতে সাফল্য লাভ করা যায়। এ সাফল্যলাভের চেষ্টায় ধৈর্য, পরমতসহিষ্ণুতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি প্রভৃতি যেসব গুণাবলীর অনুশীলন অবশ্য প্রয়োজন সেগুলোরই যে জীবনের অপর ক্ষেত্রেও প্রয়োজন হতে পারে তা তারা ভাবতে যায় না। এই সব গুণাবলীর চর্চা এমনভাবে করতে হবে যাতে জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রেও তারা এসব প্রয়োগ করতে উৎসাহ বোধ করে। তবেই হবে বিদ্যালয়ে নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ প্রবর্তনের সার্থকতা।

শিক্ষা কাজটি বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যালয়ের বাইরেও শিশুর শেখার কাজটি চলতে থাকে। শিশু তার গৃহের পরিবেশ থেকেও অনেক-কিছু শিক্ষা করে। এবং বিদ্যালয়ের বাইরে অবসর বিনোদনের জন্য ছেলে-মেয়েরা যেসব ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করে তা থেকেও তারা অনেক-কিছুই শিক্ষা করার সুযোগ পায় এবং নানা সৎ অসৎ আচরণে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে একমাত্র শিক্ষকের উপর নির্ভর করে বসে থাকাও যুক্তিযুক্ত নয়। অভিভাবকগণেরও দায়িত্ব এতে আছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে একদল ছেলেমেয়ে যেমন মুক্ত বায়ুতে খেলাধুলা করতে পছন্দ করে আবার এমন একটি দলও আছে যারা ঘরে বসে নানারূপ কাজকর্ম ও খেলাধুলা করে অবসর যাপন করে। কেউ বা একান্তে বসে বসে ভাল ভাল বই পড়ে আবার কেউ বা লুকিয়ে লুকিয়ে নানাবিধ নভেল পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সুচিত্রা, উত্তম—এরাই বর্তমান সময়ে দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের আদর্শ। সিনেমা আর্টিস্ট, ক্রিকেট খেলোয়াড়, ফুটবল প্লেয়ার—এরাই যেন আজকাল এদেশের ছেলেমেয়েদের আলাপ-আলোচনার বিষয়। রকে বসে বসে—কে ভাল খেলেছে, কে খেলতে পারে নি, কার জন্য টিম্‌টি হেরে গেল, কোন্ প্লে-তে কে ভাল পার্ট করেছে, কাকে কোন্ নায়ক বা নায়িকার ভুমিকায় ভাল মানিয়েছে, এসব আলোচনা নিয়ে ছেলেমেয়েরা এত মেতে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত দলাদলি, ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি পর্যন্ত হয়ে যায়। এসব আলোচনায় শিক্ষণীয় কিছু থাকলেও মনের সমস্ত খোরাক এর মধ্যে আছে কিনা জানি না। বাড়ীর দাওয়ায়,

গাছের তলায় বা চায়ের দোকানে বসে যখন দেশের ভাবী উত্তরাধিকারীরা এমনি করে অলস ভাবে পরচর্চা করে সময় কাটায় অথবা নানা প্রকার সস্তা গবেষণায় তাদের অমূল্য সময় নষ্ট করতে দ্বিধা করে না, তখন এদেরই দ্বারা পরিচালিত ভাবী সমাজের কথা ভেবে আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। এ-ভাবে অবসর বিনোদনের জন্য বিদ্যালয়ের বাইরে বসে ছেলেমেয়েরা যে-সব কাজকর্ম করে তার একটি স্পষ্ট ছাপ ক্রমে তাদের চরিত্রে অঙ্কিত হতে থাকে। এ অপচয় বন্ধ করতে হলে—বিদ্যালয়েই এমন সব ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে আকৃষ্ট হয়ে বিদ্যালয়ের দ্বারা পরিচালিত ক্রিয়া-কলাপে যোগ দিয়েই তারা তাদের অবসর সময় কাটাতে আগ্রহশীল হয়। ছেলেমেয়েদের অবসর সময় কাটাবার জন্য বিদ্যালয়ে পুস্তকাগার, যৌথ ক্রিয়াকলাপ, ব্যায়ামাগার, সঙ্গীতের আসর, কৃষ্টি সংসদ, বিজ্ঞান ক্লাব ইত্যাদি গঠন করা ও নানা ধরনের শিক্ষণীয় চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা ইত্যাদি রাখা বিশেষ দরকার। বিদ্যালয়ের প্রভাব এমন হবে যা ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের বাইরেও তাদেরকে চালিত করে। বিদ্যালয়টিকে এমন একটি আনন্দের স্থানে পরিণত করতে হবে যাতে ঘর ছেড়ে বিদ্যালয়ে আসতেই ছেলে-মেয়েরা বেশী প্রলুব্ধ হবে। এসব কাজে অভিভাবকবৃন্দের সহযোগিতা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। বিজ্ঞান ক্লাব, সাহিত্য সভা, বিচিত্রানুষ্ঠান, শিক্ষা-প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ের আওতায়ই যাতে অধিক সময় রাখা যায় তার ব্যবস্থা করতেই হবে। শিক্ষার্থীদের সবকিছু করণীয় কাজ যেন তারা বিদ্যালয়ে থেকেই করতে পারে। বিদ্যালয় শুধু লেখাপড়ার স্থান নয়। বিদ্যালয় এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে ছেলেমেয়েরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বুনিয়াদ গঠিত করে নিতে সক্ষম হয়। নচেৎ কেবল বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়েই আমরা বাজিমাৎ করার যে স্বপ্ন দেখছি তা আবার শূন্যেই মিলিয়ে যাবে।

জন্মের পর হতেই শিশুতে শিশুতে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকেরই যেন একটা নিজস্ব ছন্দ বা ধারা আছে। কেউবা খেলা-ধুলা করতেই বেশী পছন্দ করে, কেউবা গল্পের বই নিয়েই সময় কাটাতে ভাল-বাসে, আবার কেউ বা চায় কবিতা লিখে, চিত্রাঙ্কন করে, অথবা নৃত্য-গীত এবং অভিনয় করেই আনন্দে সময় অতিবাহিত করতে। শিশুর এ পছন্দ-অপছন্দ কারও নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না। অনেকের হয়ত একটা বিশেষ

বিশেষ খেয়ালও (Hobby) থাকে। যেমন, পুরানো ডাক টিকিট সংগ্রহ করা, পুরাতন পুঁথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা, মাটির বা কাঠের খেলনা তৈরি করা ইত্যাদি। কাজেই, সব ছেলেই যে কেবল লেখাপড়া পছন্দ করবে এমন আশা করা যায় না। তাইত বিদ্যালয়ে পড়া-লেখার সাথে সাথে নানা প্রকার সৃজনমূলক ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থাও রাখা দরকার। সৃষ্টি করার ইচ্ছা সকল শিশুর মধ্যেই প্রবল। তাদের সৃজনী শক্তি বিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ বিদ্যালয়ে রাখা দরকার। সংগীত, চারুকলা, রসসৃষ্টি, অভিনয় প্রভৃতি এবং নানাপ্রকার উৎসব উদ্‌যাপনের ভিতর দিয়ে ছেলেমেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকা দরকার নয় কি? শুধু পরীক্ষা-পাসের জন্য প্রস্তুত করাই বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য কখনই হতে পারে না। কেবল জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য নিয়েও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোন সার্থকতা নেই। দেশের শিশুরাই দেশের প্রকৃত সম্পত্তি। প্রতিটি শিশুকে 'মানুষ' করে গড়ে তোলার দায়িত্ব বিদ্যালয়কেই গ্রহণ করতে হবে। শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়তা করতে গিয়েই ত আজ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সাথে সাথে শিশুর চরিত্রগঠনের সম্যক ব্যবস্থা রাখাও দরকার হয়ে পড়েছে। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা হলে যেমন তার স্বাভাবিক ধর্মকে বাধা দেওয়া হয়, তেমনি ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার না করে শিক্ষা-পদ্ধতি রচিত হলেও সে শিক্ষার সাহায্যে সমাজের উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত। ব্যক্তিকে গঠিত করতে হবে সমাজের উপযোগী করে; তার জন্যই দরকার পড়া-লেখার সাথে সাথে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করা। উক্ত ক্রিয়াকলাপসমূহ উদ্দেশ্যমূলক হতে হবে। ক্রিয়াকলাপ-সমূহ যেন জীবনের কতকগুলো খাপছাড়া অনুষ্ঠান হয়ে না দাঁড়ায়। জীবন-ধারার সাথে যেন সেগুলো যুক্ত হয়ে থাকে। পুঁথিই বিদ্যার্জনের একমাত্র উপায় নয়। জীবনে চলার পথে নানা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে যে শিক্ষা লাভ করা যায় সে শিক্ষাই তো বাস্তব শিক্ষা। প্রত্যেকটি সঙ্কল্পের (Project) মধ্যেই শিশু পাবে অনেককিছু শিক্ষণীয় বিষয়। মোট কথা, বিদ্যালয়ের ক্রিয়াকলাপ-সমূহ এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যা থেকে শিক্ষার্থীরা পেতে পারে ব্যক্তি এবং সমাজের সামঞ্জস্য বিধানের সূত্র। শুধু কাজের জন্যই কাজ নয়; কাজের উদ্দেশ্য—শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়তা করা। এ উদ্দেশ্য স্মরণ রেখে প্রতি বিদ্যালয়ে নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করা হলেই সেগুলোর মাধ্যমেও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হবে সন্দেহ নেই।

॥ পাঁচ ॥

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান

(Education & Psychology)

বর্তমান শিশু-কেন্দ্রিক (Paido-Centric) শিক্ষার যুগে, শিশুকে সম্যগ্‌রূপে জানবার চেষ্টাই সবার আগে দরকার। শিশু-মনের গোপন রহস্যসমূহ আজ আর গোপন থাকলে চলবে না। সুচিকিৎসার জন্য যেমন চিকিৎসককে সবার আগে রোগীর কাছ থেকেই জেনে নিতে হয় রোগের সমস্ত উপসর্গ, সুশিক্ষকও তেমনি শিক্ষার্থীর কাছ থেকেই সংগ্রহ করে নেবেন তার মনের সমস্ত খবর। শিক্ষার অঙ্গ তিনটি—শিশু, বিষয়বস্তু এবং শিক্ষক। এবং এ তিনটি অঙ্গই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই সুশিক্ষকের পক্ষে কেবল বিষয়বস্তুর পূর্ণ জ্ঞান থাকলেই চলবে না। শিশুকেও তাঁর ভালরূপে জানতে হবে। শিশুর সহজাত শক্তির পুঁজি, তার বিকাশের ধারা, তার মনের জটিল কার্যপদ্ধতি, বংশগতি ও পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির হদিস একমাত্র মনোবিজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা পেতে পারি। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে যদিচ মনোবিজ্ঞান আশানুরূপ আলোকসম্পাতে আজও সক্ষম হয় নি তথাপি মনের কাজ-কারবার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে মনোবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন উপায় নেই। শিশুর ব্যবহার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হলে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। শিশুর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে শিক্ষার পদ্ধতি রচনা করতে হলে মনোবিজ্ঞানের সাথে সুপরিচিত হওয়া প্রয়োজন। পূর্বাহ্ণে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করে তারপর উপযুক্ত পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্যও মনোবিজ্ঞানের দান অপরিসীম।

অল্প আয়াসে সঠিক ভাবে স্থির লক্ষ্যে পৌঁছতে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য আমাদের অপরিহার্য। মনোবিজ্ঞানই আমাদের বলে দেবে কোন্ ধারায় চললে সহজে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। শারীরতত্ত্ব (Physiology)

এবং রোগতত্ত্ব (Pathology) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ভিন্ন যেমন বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চিকিৎসা সম্ভবপর নয়, মনোবিজ্ঞানের (Psychology) জ্ঞান ভিন্নও তেমনি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষাদান কার্য সম্ভবপর নয়। শিশু-শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা বিপ্লবী রুশোই (Rousseau) সর্বপ্রথম সাহস করে প্রচার আরম্ভ করেন। তারপর পেস্টালৎসি (Pestalozzi) দেন তাতে রূপ। তিনি বললেন, শিশু-মনের গোপন খবর সংগ্রহ করাই শিক্ষকের সর্বপ্রথম কাজ। মানবশিশু একটি জড় পদার্থ নয়, তার মনটি একটি বাড়ন্ত চারাগাছের মত। জোর করে তাকে কোন রূপ দিতে গেলে ফল বিপরীত হওয়াও বিচিত্র নয়।

এই মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রটি গড়ে উঠেছে নানাপ্রকার পরীক্ষা ও নিরীক্ষাকে ভিত্তি করে। শিশুর ব্যবহার সম্পর্কে এযাবৎ যে-সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে শাস্ত্রটিকে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলা বোধ হয় ভুল হবে। তবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিয়তই চলছে, এবং নিত্য নূতন তথ্য যা আবিষ্কার হচ্ছে তার কার্যকারিতাও অনেক স্থলে প্রমাণিত হচ্ছে। এমন একটি বস্তু নিয়ে এই শাস্ত্রটির কারবার, যার হদিস মেলা ভার। শিশুর মনটিকে ধরা-ছোঁয়ার নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশেষ ভাবে, লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা নানা সূত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন, এবং ঐসব সূত্র দিয়ে মনটিকে ঘিরে তাকে প্রায় আয়ত্তে এনে ফেলা হয়েছে। ঐসব সূত্রের মারফত, কোন্ আঘাতে কিরূপ সাড়া পাওয়া যাবে এখন প্রায় নির্ভুল ভাবেই তা বলে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিক্ষা কার্যকরী হতে পারে, এবং জানবার মূলনীতি-সমূহ (Laws of learning) কি কি, তা সবই বহু পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর মনোবিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন। ঐসব সিদ্ধান্ত শিক্ষাব্রতী মাত্রেরই জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

প্রাণহীন একটি যন্ত্রও একজন আনাড়ীর হাতে পড়লে বিকৃত হয়ে যায়। আর এতো মানবশিশু-রূপ যন্ত্র, যে-যন্ত্রটির জটিলতাও অনেক বেশী, কাজেই একে নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরা যদি আনাড়ী হন তাহলে ফলাফল সহজেই অনুমেয়। অতএব, এ-যন্ত্রটির যান্ত্রিক কৌশল আয়ত্ত না করে একে নিয়ে নাড়া-চাড়া করা যুক্তিযুক্ত নয়। এ-যন্ত্রটির কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করতে হলে মনোবিজ্ঞানের শরণ লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নেই। সর্বোপরি, শিশুর

যে আবেগ (Emotion) বলে একটা অদ্ভুত জিনিসের অস্তিত্ব আছে, একথা আমরা সহজে আমল দিতে রাজী হই না। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে আবেগের প্রভাব মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। শিশুর মনোজগতে হঠাৎ যে ঝড়ের উপদ্রব দেখা দেয় তার উৎসই হল এই আবেগ। এ আবেগ বস্তুটিকে অবহেলা করা হলে হঠাৎ ভরাডুবি হওয়াও বিচিত্র নয়। এজন্যই প্রাণহীন জড় যন্ত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আর প্রাণিজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে কখনো এক পর্যায়ভুক্ত করা চলে না।

॥ ছয় ॥

জীবন পরিক্রমা (Phases of Life)

মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের সমগ্র জীবনটাকে মোটামুটি চারটি স্তরে ভাগ করে নিয়েছেন—শৈশব, বাল্য, কৈশোর এবং যৌবন। এর প্রতিটি স্তরের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষা-পদ্ধতি রচিত হলে অল্পায়াসে অধিক শ্রেয়ঃ লাভ করা যায়। ডাঃ জোন্‌স্ (Dr Jons) জীবন পরিক্রমার বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে আলোকসম্পাত করেছেন, সে আলোকে পথ দেখে চলা শিক্ষক মাত্রেরই সঙ্গত। জোন্‌স্-এর মতে, জন্ম হতে পাঁচ বছর পর্যন্ত শৈশবকাল, পাঁচ থেকে বার বছর পর্যন্ত বাল্য, বার থেকে আঠার বছর পর্যন্ত কৈশোর এবং তদূর্ধ্বে যৌবন। ঠিক ঠিক কোন্ বয়সে মানব-শিশু একটি স্তর অতিক্রম করে অপর স্তরে প্রবেশ করে এ-নিয়ে অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির মাত্রা অনেকটাই নির্ভর করে জলবায়ু এবং ভৌগোলিক ও সামাজিক ব্যবস্থার উপর। কাজেই, প্রত্যেকটি স্তরের স্থায়িত্বকাল কমবেশী দেশ, কাল ও পাত্রের উপর নির্ভরশীল। বাঁধাধরা কোন ছকে এঁকে না ফেলাই ভাল।

(ক) শৈশবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবার পর হতেই কয়েক প্রকার বিশেষ ধরনের অঙ্গসঞ্চালন ক্রিয়া শিশুদেহে পরিলক্ষিত হয়। কোন প্রকার অভ্যাস তখন পর্যন্ত সে আয়ত্ত করে নিতে পারে নি। এভাবে প্রায় পক্ষকাল শিশু এই বিরাট বিশ্বের সাথে কোন-না-কোন প্রকারে যোগসূত্র স্থাপনে অক্ষম হয়ে অবশেষে সে নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপর ক্রমে ক্রমে সে লক্ষ্য করে, কাঁদলেই মা ছুটে আসেন এবং তাকে স্তন্যদান করেন। এমনি ধরনের ছোটখাট নানা অভিজ্ঞতা সে অর্জন করতে শুরু করে দেয়। পরবর্তী কালে শুরু হয় চেষ্টা ও ভ্রান্তির (Trial & error) পালা এবং এই ভাবে ভুল বাদ দিয়ে দিয়েই আরম্ভ হয় তার শিক্ষার বুনিয়াদ। প্রথম

প্রথম শিশু তার নিকটতম পরিবেশ হতেই সংগ্রহ করে তার অভিজ্ঞতার পুঁজি। সেই সময় প্রাণী অপ্রাণীর তফাৎ সে বড় একটা বুঝে না। তাইত দেখতে পাই কাঠের পুতুলের সাথে তার কত ভাব! যতক্ষণ শিশু জেগে থাকে ততক্ষণ বিশ্রাম কাকে বলে সে তা জানে না। এ বয়সে সবকিছুই সে বিচার করে বাস্তব অভিজ্ঞতার মারফত। নিজের ভাল-লাগা মন্দ-লাগাই হয় তখন তার বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। কোন প্রকার নির্দেশ বা আদেশ তার মনে কোন দাগ কাটতে পারে না। এ-কারণে, অনেক দুঃখ-কষ্ট এবং আঘাতের অভিজ্ঞতা তাকে বরণ করে নিতে হয় এ-বয়সে।

প্রথম প্রথম মানবশিশু চলে ইতর প্রাণীর ন্যায় অনেকটা প্রবৃত্তির (instinct) বশে। তারপর ক্রমে সে প্রকৃতির মুখে লাগাম পরিয়ে চলতে শেখে। এ সময় অপরের সাহায্য তার পদে পদে প্রয়োজন, অথচ আশ্চর্য, 'না চাহিতে দান' সে গ্রহণ করতে মোটেই প্রস্তুত নয়। সবার ভালবাসা তার কাম্য, অথচ প্রতিদানের কোন দায়িত্ব যেন তার নেই। শিশু চায় সবাই তাকে আদর করুক, সবার মনোযোগই তার দিকে আকৃষ্ট হউক, কিন্তু কারো হুকুম সে মানতে রাজী নয়। এসব লক্ষ্য করেই মনোবিজ্ঞানীরা শিশুকে অতিমাত্রায় স্বার্থপর বা আত্মকেন্দ্রিক আখ্যা দিয়েছেন।

একালের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো কল্পনা-বিলাস এবং এই কল্পনার সূত্র ধরেই তার আত্মবিস্তার বা বিকাশের পালা শুরু হয়। শিশুর মন কল্পনার আবাসস্থল। নানা ধরনের অদ্ভুত কল্পনা সদাই শিশুর মনে আনাগোনা করে। গল্প বলায় এবং শোনায় তার কৌতূহল অদম্য। সে চেষ্টা করে গল্পের মাধ্যমেই তার কল্পনাকে রূপ দিতে। পরিবেশের পুনরাবৃত্তিও এ-স্তরের একটি বৈশিষ্ট্য। নানা প্রকার ভাবভঙ্গী ও শব্দ অনুকরণের দিকে শিশুর বিশেষ একটা ঝোঁক দেখা যায়। এই অনুকরণ-প্রবৃত্তিটিই মার্জিত হয়ে ক্রমে তাকে নাচ, গান ও নানাবিধ চারুকলায় দক্ষ করে তোলে। আপন প্রেমে সে আপনিই পাগল। নিজের প্রেমেই সদা সে থাকে মুগ্ধ। এ প্রবৃত্তিটিকেই নার্সিসিজম্ (Narcissism) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফ্রয়েডের (Freud) মতে একেই শিশুর যৌন-প্রবৃত্তির লক্ষণ বলা হয়।

এই সময়টিতে মন থাকে তার অতিমাত্রায় চঞ্চল। একই কার্যে অধিক সময় সে কিছুতেই লেগে থাকতে পারে না। একটা শেষ না করেই আর

একটা শুরু করে দেয়। কাজেই এ-বয়সের শিক্ষায় শিশুর মনটিকে হিসেবের মধ্যে ধরতে গেলে ভুল হবে। মনোবিজ্ঞান বলে, মানুষের মন ও অপরাপর ইন্দ্রিয়নিচয়ের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। অতএব মানুষ শুধু মন দ্বারাই শিক্ষা গ্রহণ করে না। অপরাপর ইন্দ্রিয়ের মারফতও সে আহরণ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। শিশুর হাতের অঙ্গুলিসমূহ নিপুণভাবে পরিচালনা করার শিক্ষা সাঙ্গ হলে তার সাথে সাথে বুদ্ধিরও নিপুণতা বাড়ে এবং মনেরও ক্রমশঃ বিকাশ ঘটে। শিশু কেবলই ভাবে, এটা কি?—ওটা কি?—কেন এমন হয়? এই সব কথা চিন্তায় তার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। বিচার-বিশ্লেষণের বালাই তার নেই। শুধু পাঁচটি বাহনের মারফতই সে জানতে চায় সবকিছু, বুঝতে চায় সবকিছু। এই জন্য, এ-স্তরের শিক্ষায় তার ইন্দ্রিয় চালনার যথেষ্ট সুযোগ করে দেওয়াই সঙ্গত। যে কার্যে সে যত বেশী ইন্দ্রিয় একসঙ্গে নিয়োগ করতে পারবে, সে কার্যের ধারণা তার কাছে তত স্পষ্টতর হবে। যে-সব কার্যে শিশুর একসঙ্গে অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয় নিয়োগের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে সেই কার্যের মাধ্যমেই শিশুকে পরিবেশন করতে হবে নানা বিষয়ের জ্ঞান। **কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষার এ আদর্শই বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তি।**

পুস্তকে লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা সবটাই শিশুর কাছে বিমূর্ত (abstract)। শিশুর কাছে অজানা পরিবেশের কোন মূল্য নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না শিশু সমস্ত নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) অভিজ্ঞতাসমূহকে ব্যক্তিগত (personal) করে নিতে পারছে, ততক্ষণ সেগুলোর কোন মূল্যই তার কাছে নেই। তা না হলে যে শিশু তার ঘুড়ি লড়াইয়ের কাহিনী সবিস্তারে উৎসাহ-ভরে বর্ণনা করে যেতে পারে, সে কেন ক্লাইভ-সিরাজের যুদ্ধের কাহিনী স্মরণ করতে এত গলদ্‌ঘর্ম হয়! নিজ অভিজ্ঞতা-সম্পৃক্ত না হলে কোন জ্ঞানই শিশুর স্মৃতিপথে সহজে ফিরে আসতে চায় না। তাই এ-স্তরে শিক্ষকের কাজ শুধু অভিজ্ঞতাসমূহকে শিশুর জীবনপ্রবাহে ঢেলে দেবার চেষ্টা করা। বাহ্যিক, সামাজিক ও আভ্যন্তরীণ এই তিনটি পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নিতে না পারলে শুধু পুস্তকে লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতাসমূহ মুখস্থ করে সত্যিকারের কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যায় না। এই বাহ্যিক পরিবেশের সাথে মানবশিশুর সর্বপ্রথম পরিচয় হয় ইন্দ্রিয়ের মারফত। তারপর অভিজ্ঞতা-সমূহকে আয়ত্ত করে নিজ প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার না করা পর্যন্ত সেগুলো

কখনো শিশুর নিজস্ব হয় না। সামাজিক জগতের সাথেও শিশু সবার আগে চেষ্টা করে তার আপন সম্বন্ধ নির্ণয় করতে। ক্রমে উপলব্ধি করার বাসনা জাগে নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে এবং পরিশেষে নিজে বাঁধা পড়ে যায় সামাজিক বন্ধনে।

সর্বশেষ তার অন্তর জগৎ, যে জগৎটা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব, যে জগতের অধীশ্বর একমাত্র সে নিজে, যে জগতে বাইরের কোন নির্দেশ বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এই তিন প্রকার জগতের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে প্রচলিত বিদ্যালয়সমূহের দান কতটুকু? কতকগুলো হাত-ফেরতা অভিজ্ঞতা বা বিমূর্ত জ্ঞানের বোঝা কচি শিশুদের মস্তিষ্কে জোর করে চাপিয়ে দেবার একটা প্রচেষ্টা বৈ তো নয়! জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমূহ শিশুর কাছে উপস্থিত করতে হবে এবং নিজের চেষ্টায় যাতে শিশু ঐগুলোর স্বরূপ উপলব্ধি করতে যত্নবান হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ শিশুর কাছে যতটা সম্ভব সত্যিকারের পরিস্থিতি বিভিন্ন কৌশলে উপস্থাপন করা যায়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই শিশু-শিক্ষার পদ্ধতি রচনা করা সঙ্গত। তবে একটি কথা এস্থলে স্মরণ রাখা দরকার—ছোট ছোট চারাগাছকে যেমন বেড়া দিয়ে কিছুকাল চতুষ্পদ জন্তুর আক্রমণ হতে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হয়, তেমনি অপরিণত মানবশিশুকেও কিছুকাল কয়েকটি অবশ্য পালনীয় সংযম নিয়মের অনুবর্তিতায় রেখে লালনপালনের চেষ্টা করাই সঙ্গত। তা' না হলে বর্তমানের এ বিশৃঙ্খল পরিবেশে মানুষের তথা জাতির চরিত্র সহজে গড়ে না উঠার সম্ভাবনাই অধিক।

শিশু শ্রোতা নয়, শিশু কর্মী। শিশু দ্রষ্টা নয়, শিশু স্রষ্টা। শিশুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৃষ্টির মধ্য দিয়েই তার সুপ্ত শক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে আত্ম-বিকাশের পথ। এই গড়ছে, আবার পরক্ষণেই তাকে ভেঙ্গে ফেলে, পাচ্ছে অপার আনন্দ। এই আনন্দ থেকে শিশুকে যেন বঞ্চিত করা না হয়। এই আনন্দের মাধ্যমেই কৌশলে হিতোপদেশের বিষ্ণুশর্মার ন্যায়, শিশুকে জ্ঞানলাভে সহায়তা করতে হবে। আনন্দহীন পরিবেশে শিশুর নানা প্রকারের ভাবসমূহ অবদমিত হয়ে মনোজগতে যদি একবার বিপ্লবের সূচনা করতে পারে, তাহলে এর বিষময় ফল সমাজদেহে সংক্রামিত হতেও বিলম্ব হবে না।

(খ) বাল্যের বৈশিষ্ট্য

শিশু একটু বড় হলে তার দৃষ্টি তখন ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে নিবদ্ধ হয়। বিশ্বের বৈচিত্র্য দেখে সে তখন অভিভূত হয়ে পড়ে এবং সবকিছু জানবার জন্য একটা অদম্য কৌতূহল তার মনে জাগে। **এ কৌতূহল-প্রবৃত্তির খোরাক যুগিয়ে যাওয়াই এ-স্তরের শিক্ষার আসল লক্ষ্য।** বাল্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো সংঘ-চেতনার বিকাশ। সমবয়সীদের সাথে মিলে মিশে খেলা করতেই তাদের আনন্দ। অবশ্য এর মূলেও দেখতে পাই সেই আত্মবিস্তারেরই একটা প্রেরণা। তার খেলার সাথী না থাকলে, তার কাজের তারিফ করবে কে? ভাল একটা কাজ করে ফেললে, কাদের কাছ থেকে সে বাহাদুরি আদায় করবে? এই সঙ্গ-লালসার খাতিরেই নীতি ও মাত্রা-জ্ঞান তাকে আয়ত্ত করে নিতে হয়। এ বয়সে সঙ্গীদের নির্দেশই যেন তার কাছে বেদবাক্য। সঙ্গীদের নির্দেশ পালন করতে তখন মাতাপিতার আদেশ লঙ্ঘন করতেও সে অনেক সময় দ্বিধা বোধ করে না।

এক কথায়, এ-স্তরে সঙ্গীর প্রভাবই সর্বাধিক; অতএব, বালক ও বালিকার শ্রদ্ধা অর্জন করতে হলে শিক্ষককেও তাদের সঙ্গীর সভ্য তালিকাভুক্ত হতে হবে। এ সময় দলগত খেলাধুলা, ব্যায়াম ইত্যাদির ভিতর দিয়েই বালক-বালিকার চরিত্রের বুনিয়াদ রচিত হয়। অতএব এ-স্তরের শিক্ষাপদ্ধতি রচনার মূল লক্ষ্যই হবে যাতে দলগত ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই তাদের জ্ঞানলাভের সুযোগ করে দেওয়া যায়।

কেন? কবে? কোথায়?—এ ধরনের প্রশ্নসমূহ সকল সময়ই বালক-বালিকাদের মুখে যেন লেগেই আছে। এই কৌতূহল-প্রবৃত্তিকে ভিত্তি করে জ্ঞান পরিবেশন করতে হলে যথেষ্ট ধৈর্যেরও প্রয়োজন। নিজেদের অজ্ঞানতা বা অক্ষমতা বশতঃই হউক অথবা মানসিক অসুস্থতার দরুনই হউক, আমরা বালক-বালিকাদের এ ধরনের প্রশ্নে উত্ত্যক্ত হয়ে অনেক সময় এমন সব ব্যবহার করে বসি যাতে তাদের এই প্রবৃত্তিটি ধীরে ধীরে অবদমিত হয়ে যায়। অনেক সময় বালক-বালিকাদের সবকিছুই জানবার অদম্য ইচ্ছাটিকে আমরা এভাবে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলি।

শৈশব থেকে বাল্যে পদার্পণ করেই বালক-বালিকার দেহের বৃদ্ধি

দ্রুততালে চলতে আরম্ভ করে এবং সাথে সাথে স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্ণতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ বয়সে বালক-বালিকারা ছবির বিশেষ ভক্ত হয়ে পড়ে। এ-কারণে কেউ কেউ এই বয়সটিকে ছবির বয়স বলতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। এ বয়সে নানা প্রকার চিত্রের মারফত শিক্ষাদান করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বালক-বালিকাদের দ্রুত বৃদ্ধির দিকেও সজাগ দৃষ্টি রেখে এ-স্তরের শিক্ষাপদ্ধতি রচনা করা সঙ্গত। মোট কথা, দেহ ও মনের দ্রুত পরিবর্তন, সঙ্গ-লালসা, কৌতূহল-প্রবৃত্তি ও চিত্রানুরাগ—এই কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ-স্তরের শিক্ষাপদ্ধতি রচিত হলে সুফলের আশা করা যায়। নীতিজ্ঞানের বীজও এ-স্তরেই অঙ্কুরিত হয়। অতএব বালক-বালিকাদের সম্মুখে সর্বদা ভাল ভাল আদর্শ উপস্থাপন, আদর্শ চরিত্রাবলী পঠন অথবা আদর্শ চরিত্র সমন্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকার মহলা ইত্যাদির সহায়তায় এই নীতিজ্ঞানের অঙ্কুরটিকে বৃদ্ধি পাওয়ার অনুকূলে চালিত করতে হবে।

এ বয়সের সঙ্গ-লালসা থেকেই ক্রমে গণ-মনের (Group mind) উন্মেষ হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যার শক্তিটিকে (Sympathy of numbers) অবহেলা করলে চলবে না। ডেভিড স্টো (David Stow) সর্বপ্রথম শিক্ষাবিদ্‌গণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ বয়সের বালক-বালিকারা কেবলমাত্র তাদের সমবয়সীদের সাথে প্রাণ খুলে মেলামেশা করতে চায়, একে অপরের অনুকরণ করে। ক্রমে তারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তখনই শুরু হয় দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এমনি করেই শুরু হয় তাদের সামাজিক জীবন। এ-কারণে, প্রত্যেকটি বিদ্যালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণে রূপান্তরিত করতে জন ডিউই পরামর্শ দিয়েছেন। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র সমাজে এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠা চাই, যাতে ছেলে-মেয়েদের চরিত্রে তার ছাপ অঙ্কিত হয়ে থাকে। এ-বয়সে ছেলেমেয়েদের দল নির্বাচন বিষয়ে প্রথম থেকেই শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দের সজাগ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। দলে একবার ভিড়ে পড়লে তার প্রভাব থেকে তাদের মুক্ত করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

(গ) কৈশোরের বৈশিষ্ট্য

শৈশব ও বাল্য অতিক্রম করে ঠিক কোন্ বয়সে মানব কৈশোরে পদার্পণ করে, এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ বিদ্যমান। তবে জীবন-

পরিক্রমায় এই সঙ্কটকালের আবির্ভাব অনেকটা দেশ, কাল ও পাত্রের উপর নির্ভরশীল। এ-স্তরে সর্বপ্রকার বৃদ্ধি এত হঠাৎ এসে পড়ে যে, অনেক ক্ষেত্রেই কিশোরকে একেবারে বিভ্রান্ত করে দেয়। দৈহিক ও মানসিক জীবন-প্রবাহে যেন হঠাৎ জোয়ার এসে উপস্থিত হয়। তাইত এ সময় আবার নূতন করে হাল ধরতে হয়। নূতন করে আবার তাকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। এই জন্য অনেকে বয়সের এই সন্ধিক্ষণকে পুনর্জন্ম (Re-birth) আখ্যা দিয়েছেন। হঠাৎ এতগুলো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয় নিয়ে সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? কেমন করে অপরের সাথে মেলামেশা করবে? এ ধরনের চিন্তা কিশোর-কিশোরীদের যেন একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। শক্তির প্রচণ্ড বেগ তাদের অস্থির করে ফেলে।

এ সময় পথ বেছে নিতে না পারলে জীবন-সৌধের ভিত্তিতে ফাটল দেখা দেবে। দৈহিক বৃদ্ধি ছাড়াও মানসিক বৃত্তিসমূহ এ সময় এত দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে যে, কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে তাল রেখে চলা তখন কষ্টকর হয়ে পড়ে। সদাই নানা বিচিত্র ভাব মনে উদয় হয়ে মনকে তোলপাড় করে ফেলে। এক এক সময় হয়ত তাকে অতিমাত্রায় প্রফুল্ল দেখাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই হয়ত দেখা গেল, সে নিতান্ত বিমর্ষ হয়ে ঘরের কোণে বসে আছে। যৌন-প্রবৃত্তির উদ্‌গমই এ সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা। হঠাৎ যৌন-ক্ষুধা আত্মপ্রকাশ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বিভিন্ন প্রকার সামাজিক বাধা-নিষেধের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে বিকৃতভাবে বহিঃপ্রকাশের পথ খোঁজে। অবদমিত যৌন-ক্ষুধাই অধিকাংশ কিশোর-কিশোরীর মনের ভারসাম্য নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট।

এ সময়ে বিভিন্ন মানসিক বৃত্তি, যথা—বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনা-শক্তি, সৌন্দর্যানুভূতি, নৈতিক চেতনা ইত্যাদি পরিপুষ্ট হতে আরম্ভ করে; এবং সব মিলিয়ে মানবের আমিত্বজ্ঞানের পরিস্ফুরণ হতে শুরু করে। তাই তারা আদর্শের সন্ধানে কখনো বা পুস্তকের মধ্যে, কখনো বা পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে, আবার কখনো বা তাদের সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের মধ্যে খোঁজ শুরু করে দেয়। এ সময়ে ধীরে ধীরে ভিন্ন ভিন্ন রসের অনুভূতি তারা পেতে আরম্ভ করে, এবং সমস্ত প্রকার রসের মিশ্রণে সৃষ্ট হয় তাদের আত্মচেতনা বা আমিত্বজ্ঞান (Master Sentiment)। এই আমিত্বজ্ঞানই

হয় তখন তাদের সমস্ত কাজের নিয়ামক। কাজেই বলা চলে, জীবনের এ সময়টিতে মন্দ হবার যেমন আশঙ্কা রয়েছে, ভাল হবার সুযোগও রয়েছে তেমনি প্রচুর। তাইত বলা হয়েছে—"If the tide of adolescence can be taken at the flood and a new voyage begun in the strength and along the flow of the current, it may lead on to fortune (—*New Education* by K. K. Mookerjee)। মানব-জীবনের এ সঙ্কটময় সময়টিকে জীবন-গগনের কালবৈশাখীও যেমন বলা চলে, তেমনি পূর্ণশশী বলাও অন্যায় হবে না।

এ কালের শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথাই হলো, কিশোর-কিশোরীদের বেগবান ভাবপ্রবাহ যেন কোনপ্রকারে অবরুদ্ধ না হতে পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। এ প্রবাহটি যাতে সুপথ ধরে চলতে পারে তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা রাখা। কর্মহীন অবস্থায় অলসভাবে বসে থাকার যেন এক মুহূর্তও সময় সে না পায়। যাতে প্রচুর শারীরিক ও সাথে সাথে মানসিক শ্রমের প্রয়োজন এ-ধরনের কাজের সুযোগ পর্যাপ্ত পরিমাণে কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষাব্যবস্থায় থাকা প্রয়োজন। এদের সামনে সর্বদা ভাল ভাল আদর্শ উপস্থিত করতে হবে। সঙ্গ নির্বাচনে যেন ভুল না করে, সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। মাধ্যমিক শিক্ষার মূল সমস্যাই হলো, কিশোর-কিশোরীদের নূতন করে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে। তাদের অমার্জিত প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভসমূহের উদ্গতি (Sublimation) সাধনে সহায়তা করে, গড়ে তুলতে হবে তাদের এক একটি সামাজিক জীব করে। কুচিন্তা, কুভাবনার হাত থেকে এদের বাঁচাবার প্রকৃষ্ট পন্থাই হলো, সর্বদা কোন-না-কোন কাজে তাদের নিয়োজিত রাখা।

কথায় আছে—"Keep the adolescence busy, never allow him to have nothing to do." নিজেদের দেহের প্রতি যাতে তাদের মমতা জন্মে এভাবে তাদের দেহ গঠিত করার চেষ্টা করতে হবে। দেহের প্রতি একবার মমতা জন্মাতে পারলে, সহজে আর তারা কুপথে ধাবিত হবে না। তাই এ বয়সের ছেলেমেয়েদের সর্বাগ্রে আপন আপন স্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ করে তুলতে হবে। স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির সাথে সাথে দেহ সুগঠিত করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা তাদের নাগালের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।

এ-কারণ, প্রতিটি বিদ্যালয়-সংলগ্ন এক একটি সুসজ্জিত ব্যায়ামাগার উপযুক্ত ট্রেনারের তত্ত্বাবধানে থাকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তারপর, যে-সব ছেলেমেয়ে কোনপ্রকার খেলাধূলায় কিংবা ব্যায়ামে যোগদান না করে এখানে-ওখানে বসে নানাপ্রকার গালগল্প করে কাটায়, তাদেরও যাতে কোন-না-কোন কাজে ব্যাপৃত রাখা যায়, তার সম্যক ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকা প্রয়োজন। অতএব নানাপ্রকার সৃজনাত্মক কর্ম, দলগত নানারূপ খেলাধূলা ও ব্যায়াম, এবং বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানের মারফত নানা সমাজসেবা-মূলক কাজ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠক্রমে (Curriculum) থাকা প্রয়োজন।

দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে না চাপালে কখনো দায়িত্বজ্ঞান জন্মে কি? এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে মনিটর প্রথা প্রবর্তন, ছাত্র পার্লামেণ্ট ও বিভিন্ন স্কোয়াড গঠন—এই ধরনের দায়িত্বপূর্ণ সঙ্ঘবদ্ধ কার্যে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দান করা প্রয়োজন। কিশোর-কিশোরীদের সর্বপ্রকার আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের খোরাক যোগাবার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের সব সময় তৈরী থাকতে হবে। ওদের কখনো নিরুৎসাহ করতে নেই। ওদের ভিতর যে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে সে কথাই বার বার ওদের শোনাতে হবে। তোমরা সবাই ভাল, ইচ্ছে করলেই তোমরা বড় হতে পার, সে শক্তি তোমাদের ভিতর রয়েছে, এ ধরনের কথা যেন ওরা সবার কাছ থেকেই শুনতে পায়। তুমি দুষ্টু, তোমার কিছু হবে না—এ ধরনের কথা বলে কখনো ওদের নিরুৎসাহ করতে নেই। কিশোর যেন নিজেকে কখনো অসহায় মনে করার সুযোগ না পায়। সে যেন বুঝতে পারে পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সবাই তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। উৎসাহ দিয়ে ভাল কাজের দিকে আকৃষ্ট করা যত সহজ, নিরুৎসাহ করে মন্দ কাজ থেকে ফেরান তত সহজ নয়। **উৎসাহ-বাণী কিশোর-কিশোরীর জীবনে সঞ্জীবনী সুধার কাজ করে।** লক্ষ্য রাখতে হবে, কখনো যেন কেহ ভগ্নমনোরথ না হয়ে পড়ে। বুদ্ধি হয়ত সবার সমান নয়, তাই বলে যার বুদ্ধি একটু কম তাকে যদি বার বার বলা হয়, তোমার বুদ্ধি নেই, তোমার কিছু হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে ক্রমে তার মনে এ-ধারণা বদ্ধমূল হওয়া স্বাভাবিক যে, তার দ্বারা বোধ হয় কোন ভাল কাজ হতে পারে না। যার বুদ্ধি আছে সে তো আপনাআপনি অনেককিছু শিখতে পারবে। কিন্তু যার বুদ্ধির ভাণ্ডার স্বল্প তাকে নিয়েই

তো শিক্ষাবিদ্‌দের যত সমস্যা। তাদের অবহেলা করা আর সমাজের অপমৃত্যু ডেকে আনা একই কথা।

এ ছাড়া, আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কেও এ বয়সে তাদের কিছুটা সজাগ করে তোলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। তত্ত্বকথার ভিতরও রয়েছে কিশোর-কিশোরীদের চাহিদার অনেক উপাদান। উপাসনার ভিতরও অনেকে লাভ করবে পরম সান্ত্বনা। অবশ্য, পৃথক করে ধর্মের কোন পাঠ পড়াবার প্রয়োজন আছে কিনা জানি না। তবে, নানা প্রকার গল্পচ্ছলে, পৌরাণিক কাহিনীর মারফত এবং সভা-সমিতি ও বক্তৃতার মারফত ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান পরিবেশন করা যে একান্ত প্রয়োজন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই ভাবে এ বয়সের ছেলেমেয়েদের নিকট-পরিবেশে তাদের চাহিদার সবকিছু সাজিয়ে রাখতে হবে, যেন ঐ পরিবেশের সংঘাতেই গড়ে ওঠে তাদের পরিপূর্ণ জীবন।

॥ সাত ॥

বংশগতি ও পরিবেশ

(Heredity and Environment)

একদল বৈজ্ঞানিক বংশগতির প্রভাবে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী এবং অপর দল পরিবেশের প্রভাবে অধিক বিশ্বাসী। পিণ্টনার (Pintner), গ্যাল্‌টন (Galton), থর্ণডাইক (Thorndike)—এঁরা সবাই বংশ-গতিকেই প্রাধান্য দেন ; কিন্তু লকে (Locke), হেলভেটিয়স (Helvetius), বেগ্‌লে (Baglea)—এঁরা দেন পরিবেশকে প্রাধান্য। উভয় মতেরই সমর্থকের সংখ্যা কম নয়। আবার মধ্যপন্থীও রয়েছেন একদল, যেমন—ফ্রীম্যান (Freeman), টারম্যান (Terman), ডাগডেল (Dugdale), গডার্ড (Goddard) প্রভৃতি। সমাজতন্ত্রবাদের অন্যতম পথপ্রদর্শক রবার্ট আওয়েন (Robert Owen) স্পষ্টই বললেন, মানুষের জীবন বংশগতি ও পরিবেশের অনিবার্য ফল। অর্থাৎ বংশগতি ও পরিবেশ এই দুটির কোনটিকেই উপেক্ষা করা চলে না।

১৯২০ সালে পিণ্টনার (Pintner) লিখলেন—"The potency of environment is not so great as is commonly supposed." ১৯২৫ সালে ওয়াটসন (Watson) তার উত্তরে সগর্বে ঘোষণা করলেন —"Give me a dozen healthy infants well-informed and my scientific world to bring them up in, I might train them to become any type of specialist, I might select regardless of their hereditary equipment." এমনিভাবে এক পক্ষের বক্তব্য—মানুষের অদৃষ্ট তার মাতৃগর্ভে থাকা কালীনই স্থির হয়ে যায় ; আর অপর পক্ষের বক্তব্য—মানুষের জন্মের ইতিহাসে যাই থাক না কেন, পরিবেশের প্রভাব দ্বারা তাকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। উভয় পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীই একদেশ-দর্শী। তাই Sir Percy Nunn প্রশ্ন তুললেন, এমনি করে মানুষকে খানিকটা জড় পদার্থ বলে ভাবা হচ্ছে না কি? মানুষের কি তাহলে কোন স্বাধীন সত্তাই নেই? কিন্তু

প্রত্যেকটি মানুষের যে একটা নিজস্ব চাহিদা রয়েছে। সে সবকিছুই করে আপন প্রয়োজনের তাগিদে। যদিও বংশগত মূলধন এবং পরিবেশ নিয়েই তার কারবার তবু এ কারবারের মালিক সে নিজে, অপর কেউ নয়। গ্রহণ বা বর্জন, এ সবই তার নিজের এলাকায়। **তাকে গড়ে তোলা যায় না, যদি সে নিজেই গড়ে না ওঠে।**

উড্ওয়ার্থ (Woodworth) তাইত ভেবেচিন্তে একটি নূতন কথা আমদানি করলেন, কার্যকরী পরিবেশ (Effective environment)। একই মাটি থেকে আম গাছও রস সংগ্রহ করছে, আবার নিম গাছও রস সংগ্রহ করছে। একটির ফল সুমিষ্ট, অপরটির পাতা পর্যন্ত তিক্ত। একই পিতামাতার দুইটি যমজ সন্তান একই পরিবেশে বড় হলো, কিন্তু তার একটি তৈরী হলো মানুষ, অপরটি নাম লেখাল গুণ্ডার দলে। কেন এমন হয়? উড্ওয়ার্থ উত্তরে বললেন—সবই নির্ভর করছে জীবের গ্রহণ করার ইচ্ছার উপর। এ ইচ্ছাটি রয়েছে জীবের প্রকৃতিতে। পরিবেশ কিভাবে মানবের উপর প্রভাব বিস্তার করে এটাই হল কথা। পরিবেশের যেটুকু শিশুর প্রকৃতির সাথে মিল রেখে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, তাকেই তিনি বললেন কার্যকরী পরিবেশ।

একথা সত্য, আম গাছের বীজ হতে আম গাছই জন্মে, কাঁঠাল গাছ জন্মান যায় না। কিন্তু চেষ্টা করলে নিকৃষ্ট আমের গাছেও উৎকৃষ্ট আম ফলান যায়। পরশমণির স্পর্শে লোহাও সোনা হয়। গৌরাঙ্গদেবের স্পর্শে পাষণ্ড জগাই-মাধাইও মানুষ হয়েছিলেন। এ সবই পরিবেশের পক্ষে ওকালতি। পরিবেশ কথাটি একটু বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন। শিশু জন্মের দ্বারা তার মাতাপিতার দেহ হতে যে শক্তির বীজ প্রাপ্ত হয় তাকে অবশ্য বংশগতি বলা যেতে পারে। কিন্তু জন্মের পর তার ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, গৃহ, প্রতিবেশী, খেলার সাথী, এক কথায় তার সমগ্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ, এ সবও কি তার বংশগত নয়? কাজেই, এ পরিবেশটিকে সামাজিক পরিবেশ অথবা **সামাজিক বংশগতিও** (Social Heredity) বলা চলে। মানবজীবনে জন্মের পরে প্রাপ্ত এই পরিবেশের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। শিশু যেমন শারীরিক ও মানসিক শক্তি তার পিতামাতার কাছ থেকে বংশগতির ফলে পেয়ে থাকে, তেমনি তার নিকটতম পরিবেশটিও সে

লাভ করে উত্তরাধিকার সূত্রেই। স্বভাবশক্তিসমূহ যদিও শিশু বংশানুবর্তনেই লাভ করে, তাই বলে তার স্বভাব-চরিত্র, জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, আচরণ, এ সবই সম্যক তার বংশগত নয়, এর অনেকটাই তার স্বোপার্জিত। শিশু মাত্রই তার পিতামাতার অর্জিত জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে কি? শিল্পীর পুত্র-কন্যারা সবাই যে শিল্পচর্চায় প্রতিষ্ঠা লাভ করবে একথা নিশ্চয় করে বলা যায় কি?

শিল্পীর পুত্র-কন্যাদের অনেককেই যে শিল্পী হতে দেখা যায়, তার মূলে রয়েছে তাদের সামাজিক বংশগতি। শিশু জন্মাবার পর হতেই যা দেখতে পায় তাই অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। জ্ঞান হবার পর হতেই সে দেখে তার পিতা শিল্পচর্চা নিয়েই মেতে আছেন। তাই অজ্ঞাতে শিশুর মনেও শিল্পী হবার বাসনা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয় এবং অনুকরণের সাহায্যে সে তার বাসনার পরিতৃপ্তি খোঁজে। এমনি ভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা বংশগত পরিবেশকেই বংশগতি বলে ভুল করি। অধ্যাপক ল্যানকস্টর (Ray Lankaster) তাই বললেন, শিক্ষার ফল উত্তরাধিকার সূত্রে না পেলেও সামাজিক বংশগতির প্রভাবেই শিশু শিক্ষালাভের যোগ্যতা অর্জন করে থাকে একথা অবিশ্বাস করা যায় না।

পরিবেশের সহায়তায় শিশুকে কোন নূতন মানসিক শক্তি দান করা যায় না বটে, কিন্তু পরিবেশের প্রভাব ব্যতীত মানবশিশুর স্বাভাবিক শক্তিসমূহ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যেতেও পারে। পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতেই শিশুর অর্জিত শক্তি ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করে। বংশগতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মানুষের আজও জন্মায় নি; কিন্তু পরিবেশটিকে ইচ্ছামত সাজাবার ক্ষমতা মানুষের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। শিক্ষার দিক হতে তাইত বংশগতি অপেক্ষা পরিবেশের স্থান অনেক উপরে। সংক্ষেপে, শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ। যাঁরা বংশগতিকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন, শিক্ষার সার্থকতা তাঁদের নিকট গৌণ, শিক্ষার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলে তাঁরা মনে করেন না। ফলে, প্রকৃত শিক্ষা হতে বঞ্চিত হয়ে কত শিশুর যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা চিরতরে বিলুপ্ত হচ্ছে তার হিসেব আমরা দিতে পারি কি? আর যাঁরা বলছেন পরিবেশই সব, তাঁরাও বসে বসে কত যে পণ্ডশ্রম করছেন তার হিসেবও আমাদের খাতায় নেই।

গ্যালটন (Galton) পরিষ্কার বললেন, শিক্ষা অর্থাৎ পরিবেশ পারে শুধু মানুষের জন্মগত সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে, এর অতিরিক্ত সবকিছুই তার আওতার বাইরে। স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) আপসের কথা বললেন, বংশগতি এবং পরিবেশ এ দুইয়ের প্রভাবেই মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ হয়। বংশগতি নির্দেশ করে সীমা আর একমাত্র অনুকূল পরিবেশের প্রভাবেই শিশুর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ বিকাশ লাভের সুযোগ পায়। এক কথায়, বংশগতি যোগায় কাঁচা মাল (raw material) আর পরিবেশ তাতে রূপ দিয়ে প্রস্তুত করে বিবিধ সামগ্রী (finished product)। সেইজন্য বংশগতি ও পরিবেশকে পৃথক করে দেখতে যাওয়া ভুল। একটি অপরটির সম্পূরক। উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই প্রস্তুত হয় মানুষ গঠনের উপাদানসমূহ।

আপাতদৃষ্টিতে বংশের ধারার উপর যে গুরুত্ব আরোপণে আমরা প্রলুব্ধ হই, তার মুখ্য কারণ কিন্তু জীবতত্ত্বগত বংশগতির প্রভাব নয়, সমাজগত বংশগতির প্রভাবের ফলই সমধিক। ভাল শিক্ষিত পিতামাতা, সুশিক্ষক, উৎকৃষ্ট শিক্ষা-ব্যবস্থা, সৎসঙ্গ, শিক্ষিত ও শান্তিপূর্ণ প্রগতিশীল সমাজ-ব্যবস্থা, সুলিখিত পুস্তক, উচ্চ আদর্শ, এ সকলের প্রভাব শিশুর জীবনকে অসাধ্য সাধনে সক্ষম করে তোলে। উপরোক্ত পরিবেশগুলির প্রভাব কেবলমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়াই সম্ভব। এ-কারণ উপযুক্ত পরিবেশের প্রভাবেই ভবিষ্যৎ বংশধরেরা পূর্বপুরুষের শিক্ষা-দীক্ষার ফল সচরাচর অতি অল্প সময়ে এবং অল্প আয়াসে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়ে থাকে। একেই আমরা জীবতত্ত্বগত বংশগতি (Heredity) বলে ভুল করি। তাই বলে একথা বলা বোধ হয় যুক্তিসম্মত হবে না যে প্রতিভাবান ব্যক্তির ছেলেমেয়েরা সবাই তীক্ষ্ণ মেধা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে থাকে। ভাল ঘরের ছেলেমেয়েরা জন্মের দ্বারা যে শক্তি লাভ করবে মন্দ ঘরের ছেলে-মেয়েরা তার চেয়ে বেশী শক্তি নিয়ে জন্মালেও তার বংশগত পরিবেশ সে শক্তি-বিকাশে তাকে অতি অল্পই সাহায্য করে। এ-কারণ বড় ঘরের ছেলেদের মধ্যে প্রতিভাবানের সংখ্যা তুলনায় বেশী দেখা যায়।

রুশো (Rousseau) তো স্পষ্ট করেই বললেন, "Man is not born good nor is he born evil, virtues and vices are all the fruits of education." মানুষের দোষ-গুণ সবই শিক্ষার ফল স্বরূপ। এক কথায়, বংশগতিকে তিনি মোটেই আমল দেন নি।

কিন্তু দোষ-গুণ সঙ্গে নিয়ে মানুষ এ পৃথিবীতে না এলেও সকল মানুষই সমান সঙ্গতি নিয়ে জন্মাবে এটাও আশা করা যায় না। তা যদি হত, তা'হলে একই পরিবেশে রেখে সবাইকে গড়ে তোলা হলে একই ধরনের মানুষে পৃথিবী ভরে যেত। বৈচিত্র্যই সৃষ্টির মাধুর্য বাড়িয়ে তোলে। দুটি মানুষের চেহারা যেমন প্রায়ই ঠিক একরূপ হয় না, ঠিক তেমনি দুটি মানুষ ঠিক একই সম্ভাবনা নিয়ে সকল সময় জন্মাবে এ আশাও আমরা করতে পারি না। মানুষে মানুষে চেহারায় যেমন পার্থক্য বিদ্যমান, মানুষে মানুষে রুচি ও প্রকৃতিতেও ঠিক তেমনি প্রায়ই যথেষ্ট তারতম্যই পরিলক্ষিত হয়। এজন্যই ঠিক একই পরিবেশে মানুষ হয়েও একই পিতামাতার সব কয়টি সন্তান ঠিক একই ভাবে গঠিত হতে প্রায়ই দেখা যায় না। একই পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতে ভিন্ন ভিন্ন শিশু ভিন্ন ভিন্ন রূপ সাড়া দেয় কেন? এ প্রশ্নটির মীমাংসা করতে হলে প্রত্যেক শিশুর নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষের দেহগত (Physiological) বৈশিষ্ট্য তার ব্যক্তিত্বের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সক্ষম, এবং সে বৈশিষ্ট্য-টুকুর উপর মানুষের কোন হাত নেই। অতএব মানবশিশু নিয়ে যাদের কারবার তাদের কারবারটি অল্প-বিস্তর সীমাবদ্ধ। যদিও পরিবেশ সৃষ্টির কাজটি সম্পূর্ণই মানুষের আয়ত্তাধীন, তথাপি মানুষ ইচ্ছা করলেই সব শিশুকে নিছক জড় পদার্থের মত একই ছাঁচে ঢেলে তৈরি করতে কখনো পারে না। ব্যক্তিগত রুচি ও সার্বজনীন মাপকাঠির ভিতর একটা সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টাই মানুষ করে আসছে। অতএব পরিবেশ যোগান দেওয়াই শিক্ষার আসল কাজ। কিন্তু ফলাফল সবটাই মানুষের হাতে নেই, খানিকটা দৈবের হাতে রয়েছে—একথা অস্বীকার করারও উপায় নেই। সুতরাং বলা চলে, বংশগতি যদি কিছু থেকে থাকে তা'হলে সেটা সম্পূর্ণই মানুষের আওতার বাইরে। শিক্ষকের কাজ শুধু বিশেষ যত্ন সহকারে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করা। অতএব পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের কৌশলসমূহ আয়ত্ত করাই সুশিক্ষকের সর্বপ্রধান কর্তব্য; এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশটিকেই প্রাধান্য দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

॥ আট ॥

কৌতূহল-প্রবৃত্তি (Curiosity)

মানুষের জীবনীশক্তি সদাই বেড়াচ্ছে আত্ম-বিকাশের পথ। প্রবৃত্তির ধারা বেয়ে সে চায় বাইরে আসতে। তার গতিপথ রুদ্ধ হলে, নিষ্ফল আক্রোশে অন্তর্জগতে সে সৃষ্টি করতে চায় বিপ্লব। শক্তির এই সব স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ না করে তাদের শিক্ষার কাজে লাগানোই বিজ্ঞানসম্মত পন্থা। অতএব শিক্ষার পদ্ধতি রচনা করার সময় সর্বাগ্রে এদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, যাতে শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ধারা-সমূহ শুকিয়ে না যায়। যাতে বিশৃঙ্খল প্রবৃত্তিসমূহের উদ্‌গতিসাধন (Sublimation) সম্ভবপর হয়, সেদিকেও বিশেষ নজর রাখাই শিক্ষার পক্ষে প্রয়োজন।

শিশুর যে প্রবৃত্তিসমূহকে অবলম্বন করে শিক্ষা-কার্যে দ্রুত অগ্রসর হওয়া যায়, তন্মধ্যে **কৌতূহল-প্রবৃত্তিটিই সর্বশ্রেষ্ঠ**। এ প্রবৃত্তিটির মারফত যত সহজে এবং যত অল্প সময়ে শিশুকে নানা বিষয়ে জ্ঞানদান সম্ভবপর, অপর কোন পথে সেরূপ সম্ভবপর বলে মনে হয় না। মানুষের অতি বাল্যাবস্থায়ই এ প্রবৃত্তিটির উন্মেষ হয়। ছোট ছোট বালক-বালিকার অভ্যস্ত বুলিই হলো—কি? কোথায়? কেন? ইত্যাদি। নবাগত শিশুর কাছে এ বিরাট বিশ্বের প্রায় সবকিছুই অপরিচিত এবং বিস্ময়কর। তাই সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিচিত হতে চায় সবকিছুর সাথে।

সে চায় অচেনাকে চিনতে, অজানাকে জানতে। তাইত শিশুর প্রশ্নের আর যেন শেষ নেই। যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই তার মুখে শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন। একটি প্রশ্নের সম্যক জবাব পাবার পূর্বেই সে আরো অনেক প্রশ্ন করে বসে। কৌতূহল একটি সহজাত সংস্কার (Instinct)। বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নিতেই হবে। তাই এই সহজাত সংস্কারটিও মূলতঃ উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনেরই একটি উপায় মাত্র। এ প্রবৃত্তিটিকে কেন্দ্র করেই ক্রমে শিশুর আগ্রহ বর্ধিত হয় এবং

পরে মনোযোগের সহিত সে আসরে নেমে পড়ে। এই কৌতূহল-প্রবৃত্তিটিকে সজাগ রাখতে পারলেই শিক্ষার কার্য দ্রুততর হবে সন্দেহ নেই।

ক্ষেত্র প্রস্তুত না করে বীজ বপন করলে যেমন কোন ফল পাওয়া যায় না, ঠিক সেইরূপ জানবার ইচ্ছা বা আগ্রহ না জন্মান পর্যন্ত জানাবার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রমেরই নামান্তর। ক্ষুধার সময় খাদ্য না পেলে যেমন ক্ষুধা ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি অনবরত জানতে চেয়ে চেয়ে যদি জানতে না পারে তবে জানবার আগ্রহও ক্রমে লোপ পেতে থাকে। প্রয়োজন অনুরূপ খাদ্য না পেলে যেমন স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং অতিরিক্ত ভোজনে যেমন বদহজমের সম্ভাবনা থাকে, ঠিক তদ্রূপ, কৌতূহল জাগরিত হওয়া মাত্রই শিশুর গ্রহণ ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাকে তার প্রয়োজনানুরূপ জ্ঞান পরিবেশন করাই সঙ্গত।

শিশুর কৌতূহল চরিতার্থ করার পদ্ধতি একটি কলা (Art) বিশেষ। পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক সম্প্রদায় অর্থাৎ, এক কথায়, যাঁরা শিশুর নিত্য সহচর বা সহচরী তাঁদের সবারই কিন্তু এ কলাটি আয়ত্তে থাকা বাঞ্ছনীয়। অজ্ঞানতা বা অক্ষমতার দরুন আমরা কত শিশুর যে সেই 'কেন'র জবাব দিতে না পেরে তাদের জানবার আগ্রহকে চিরতরে দমিত করে দিচ্ছি তার ইয়ত্তা নেই। আবার কখনো বা তাদের প্রশ্নের এমন উত্তর দিয়ে বসি যা শিশুর মনের সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে। আবার অনেক সময় তাদের অনেক প্রশ্ন এড়িয়ে চলা ভিন্ন আমাদের আর কোন উপায় থাকে না। যেমন, যদি কোন শিশুর যৌন-বিষয়ক কৌতূহল হয়, তাহলে তাকে নিয়ে আমরা নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। হয় তার প্রশ্ন সাধ্যমত এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি, নতুবা ভর্ৎসনা করে বা শাস্তি দিয়ে তার সেই কৌতূহল নিবৃত্তি করতে চেষ্টা করি। কিন্তু সে সময় যদি তাকে উদ্ভিদের প্রজনন পদ্ধতি বুঝাবার ছলে যৌন মিলন সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু কিছু জ্ঞান দান করি, তাহলে শিশুর যৌন-বিষয়ক কৌতূহল খানিকটা চরিতার্থ হবে বৈ কি! এমনি ভাবে বিশেষ বিবেচনা করে শিশুর সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। শিশু প্রশ্ন করবেই, কোন্‌টা উচিত কোন্‌টা অনুচিত সে জ্ঞান তার নেই। **অতএব শিশুর সব কয়টি 'কেন'র যথাসময় উত্তর দিতে না পারলেও তার প্রশ্ন করার স্পৃহাটিকে সর্বদা কৌশলে জাগিয়ে রাখতে হবে।**

"Modern Science is a monument of sublimated curiosity"—কথাটি অভ্রান্ত। কৌতূহল-প্রবৃত্তিই মানুষকে আজ দাঁড় করিয়েছে তথাকথিত সভ্যতার উচ্চ শিখরে। কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই সমস্ত বিপদ, সমস্ত বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে মানুষ এগিয়ে চলেছে নিত্য নূতনের সন্ধানে। এই প্রবৃত্তির তাড়নায়ই 'পিয়ারী' বেরিয়ে পড়েছিলেন বিপৎসঙ্কুল মেরু অভিযানে, 'কলম্বস' অচিন সমুদ্রপথে, 'লুই পাস্তুর' ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুর সন্ধানে, 'মাদাম কুরী' পদার্থকণার পেছনে। এই প্রবৃত্তির তাড়নায়ই মানুষ বিপদ নিশ্চিত জেনেও অগ্রসর হয় অজানাকে জানতে, অচেনাকে চিনতে। এ ভাবেই জ্ঞানের ভাণ্ডার মানবের কাছে ক্রমে ক্রমে অনাবৃত হচ্ছে। অতএব. শিক্ষাদানের একটি সহজ পন্থা হলো শিশুর কৌতূহল-প্রবৃত্তির উদ্‌গতি সাধন। এ প্রবৃত্তিটির মোড় ফেরান খুব শক্ত নয়। এ প্রবৃত্তিটিকে সজাগ রেখে প্রয়োজনানুরূপ বিষয়ান্তরে ধাবিত করাই শিক্ষকের একমাত্র কার্য। শিশুর কৌতূহলে এমনভাবে ইন্ধন যোগাতে হবে যেন তা স্তিমিত না হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অতি শৈশবে এ প্রবৃত্তিটি কতকটা অনিশ্চিত অবস্থায় থাকে। একসঙ্গে শিশু অনেক-কিছুই জানতে চায়, অথচ ঠিক কোন্ প্রশ্নটির সমাধান তার আশু প্রয়োজন তা' সে নিজেই জানে না। এ জন্যই শিশুর প্রশ্নসমূহ অসংলগ্ন হলেও তাতে বিরক্ত না হয়ে বরং সুশৃঙ্খলভাবে তার প্রশ্নগুলিকে সাজিয়ে একটি একটি করে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টাই সুশিক্ষকের কর্তব্য।

শিশুর সব 'কেন'র জবাব দেবার মত বিদ্যা হয়ত সবার নেই, তাই বলে ভাঁওতা দিয়ে তার সব চাইতে ধারাল অস্ত্রটিকে ভোঁতা করে দেবার অধিকারও আমাদের নেই। কৌতূহল-প্রবৃত্তিটিকে বিধিবদ্ধভাবে সুপথে চালিত করার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে বৈ কি! শিশুর স্বভাবই চঞ্চল, তাই কোন একটি বিষয় জানবার আকাঙ্ক্ষাও তার বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। একটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে অপর আর একটি প্রশ্ন করে বসে। অতএব, এমনভাবে তার প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করতে হবে যাতে শিশুর মনোযোগ অন্যত্র ধাবিত না হয়। একটি প্রশ্নের সম্যক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কৌশলে অপর প্রশ্নসমূহ এড়িয়ে চলতে হবে। উত্তরসমূহ এমন হৃদয়গ্রাহী হওয়া চাই যাতে শিশুর মন তা'তে একান্তভাবে নিবদ্ধ থাকে। শিশু একটু বড় হলে, তখন সরাসরি তার সব

প্রশ্নের উত্তর বলে দেওয়া ঠিক হবে না। সমাধানটির প্রতি এমনভাবে তাকে ইঙ্গিত দিয়ে দিতে হবে যাতে সে আপন চেষ্টায় সমাধানটি আবিষ্কার করতে পারে। এতেই সে পাবে সৃষ্টির আনন্দ এবং উত্তরোত্তর বর্ধিত হবে তার কৌতূহল। তার নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি অনুশীলনের সুযোগ না পেলে, ক্রমে সেগুলো সবই অকেজো হয়ে পড়বে যে! প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে শিশুকে সাহায্য করতে গেলে তার আত্ম-শক্তির উপর নির্ভরতাও কমতে থাকবে। এমনভাবে তাকে সমস্যার ভিতর ফেলতে হবে যাতে সে আপন চেষ্টায়ই তার সমাধান খুঁজে পায়। সংক্ষেপে, কৌশলে শিশুর কৌতূহল-প্রবৃত্তিটি সদা সজাগ রাখার চেষ্টা করা শিক্ষক মাত্রেরই কর্তব্য।

আর একটি কথা, বৈচিত্র্যই কৌতূহলের জন্মদাতা। বিস্ময়ই কৌতূহলের উদ্রেক করে, আবার কৌতূহলই সৃষ্টি করে আগ্রহ। এই আগ্রহই শিক্ষার মূল। নূতন কিছু দেখলেই শিশু বিস্মিত হয়ে ভাবে, এটা কেন হয়, ওটা কেন হয় না, ইত্যাদি। তারপরই জাগে তার জানবার আগ্রহ। এই আগ্রহ না জন্মান পর্যন্ত শিশুকে কোন বিষয় শিক্ষা দিলে সেটা কখনো কার্যকরী হয় না। এ-কারণে সর্বদা নূতন নূতন জিনিস অর্থাৎ শিশুর বিস্ময় উদ্রেক করে এমন জিনিস শিশুর পরিবেশে স্থাপন করতে হবে এবং পুরাতন জিনিসেও রং লাগিয়ে শিশুর সমক্ষে নূতনের মত করে উপস্থিত করতে হবে। এক কথায়, নূতনত্ব বা বৈচিত্র্যের সমাবেশ শিশুদের পাঠ্যতালিকায় থাকতে হবে। শিশু যদি আবিষ্কারকের মন নিয়ে অগ্রসর হবার সুযোগ পায়, তাহলে আর জোর করে তাকে পড়াতে বসাতে হবে না। সে তখন আপন আগ্রহেই পড়তে আরম্ভ করবে। শিক্ষকের কাজ হবে তখন তাকে শুধু নির্দেশ দেওয়া। তার চলার পথে সে যেন হোঁচট না খায় সে দিকে একটু সজাগ দৃষ্টি রাখলেই তখনকার মত কাজ চলে যাবে।

যে শিশুর কৌতূহল-প্রবৃত্তিটি প্রবল, কেবল তার কাছেই এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। যদিও কৌতূহল একটি সহজাত সংস্কার, তবু এর সংরক্ষণ এবং পরিবর্ধন এ সবই শিক্ষকের আওতার মধ্যে।

॥ নয় ॥

অভ্যাস (Habit)

জীবের ধর্ম বাঁচা ও বাড়া। প্রথমটি স্থিতিবাচক ও দ্বিতীয়টি গতিবাচক। যেটুকু এগিয়েছি সেটুকু বজায় রেখে তবে তো আবার এগিয়ে যাবো। বার বার যদি প্রথম থেকেই শুরু করতে হয় তবে পথের শেষ হবে কবে? অতএব স্থিতি ও গতি, পার্সি নান (Percy Nunn)-এর ভাষায়, ম্নিমি (Mneme) ও হর্মি (Horme) একটি অপরটির পরিপূরক। সৃষ্টির সাথে সাথেই চলে স্থিতির কাজ। অতীতকে ধরে রাখার একটি কৌশল হলো অভ্যাস। অভ্যাসের দ্বারা অতীতকে কিছুটা বাগে এনে, তার উপর গড়ে তুলতে হয় নূতন ইমারত। চিন্তার সূত্রকে অবলম্বন করে এ কাজে অগ্রসর হতে হয়।

অভ্যাস মানুষের সহজাত সংস্কার নয়, মানবের চেষ্টালব্ধ ফল। বরং অভ্যাসের দ্বারা মানুষের সহজাত সংস্কারসমূহ মার্জিত করা সম্ভবপর। একই কার্য বার বার একই নিয়মে পুনরাবৃত্তি করা, অর্থাৎ একই প্রকার উত্তেজনায় যদি প্রতিবার একই নিয়মে সাড়া দেওয়া যায়, তাহলে স্নায়ু-পথে একটি গভীর রেখাপাত হয়। তারপর স্নায়ুমণ্ডলীর সন্ধিপথে একটি সহজ পথ অচিরেই তৈরী হয়ে যায়। এমনি ভাবে কিছুকাল পরে কোন প্রকার আয়াস বা চিন্তা ব্যতীতই অনুরূপ উত্তেজনায় অনুরূপ সাড়া ঐ পথ বেয়ে নেমে আসে। এ প্রক্রিয়াকেই অভ্যাস গঠন বলা হয়ে থাকে।

শিশু অক্ষর লেখা শিখবে। কিছুকাল সে একই নিয়মে তার হাতের পেশীসমূহকে চালনা করে, অবশ্য সাথে থাকে তার ইচ্ছা-শক্তি। অর্থাৎ আমি শিখব, এই আগ্রহ তার থাকা চাই। অনেক ভ্রান্তি ও সফলতার (Trial and error) ভিতর দিয়ে অবশেষে শিশু একদিন সত্যিসত্যি যন্ত্রবৎ লিখতে শুরু করে দেয়। এভাবে একবার লেখার অভ্যাস গঠিত হয়ে গেলে, বিনা আয়াসেই সে লিখতে পারবে। তখন, লেখার সাথে সাথে শিশু বিভিন্ন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতেও সক্ষম হবে। মন যদি বা কোন বিষয়ে আকৃষ্ট থাকে, তথাপি লেখনী আপনাআপনি তার কাজ

করে যেতে থাকবে। বার বার একটি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে কিছুকাল পরে বিনা আয়াসেই শিশু সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তি করে যেতে পারবে। তখন এ-কার্যে স্মৃতিশক্তিকেও বিশেষ খাটাতে হয় না।

কোন বিষয়ে একবার অভ্যাস গঠিত হয়ে গেলে, অভ্যাসবশে যখন কোন কাজ আপনা হতেই চলতে থাকবে তখন মস্তিষ্কের আর বিশেষ কোন কাজ থাকে না। মস্তিষ্ক তখন বিশ্রাম উপভোগ করে, অথবা অপর কোন বিষয়ে গবেষণা করার অবকাশ পায়। অভ্যাস একবার গঠিত হয়ে গেলে, তার পিছনে আর লেগে থাকার প্রয়োজন নেই একথা মনে করা ভুল। অভ্যাসটিকে জীবনে স্থায়ী ভাবে পেতে হলে, অভ্যাস গঠিত হবার পরও কিছুকাল সে-কাজে লেগে থাকতে হয়। অভ্যাস গঠনের সহজ পন্থা হলো, একটানা একই কাজ বার বার করে যাওয়া। আজ একটু, কাল একটু, এভাবে অগ্রসর হলে সহজে অভ্যাস গঠিত হয় না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, শুধু যন্ত্রবৎ একটি কাজ বার বার করে গেলেই চলবে না, চেষ্টার সাথে ইচ্ছা-শক্তিরও যোগ থাকা চাই—একথা ভুললে চলবে না।

অনেক মনীষীই অভ্যাস-গঠনকে মানবজীবনের একটি অত্যাবশ্যক হাতিয়ার বলে উল্লেখ করে গেছেন। উইলিয়ম জেম্‌স্ (William James) তো বলেছেন, মানুষের জীবন কতকগুলো অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। মানুষের অহঙ্কার, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পছন্দ-অপছন্দ—এ সবই অভ্যাসের ফলে গঠিত হয়। মানুষের চরিত্র-গঠনেও কতকগুলো অভ্যাস-গঠন অপরিহার্য। ক্ল্যাপার (Klapper)-এর মতে মানুষের ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত কতকগুলি সু-অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য, অভ্যাস-গঠনের বিপক্ষেও যুক্তির অন্ত নেই। রুশো (Rousseau) তো স্পষ্টই তাঁর 'এমিলি'তে বলেছেন, "The only habit I would teach him (Emile) is the habit of forming none." কারণস্বরূপ তিনি বলেছেন, অভ্যাস অনেক সময় মানবজীবনের উপর প্রভুত্ব পর্যন্ত করে থাকে, ব্যক্তিত্বকে দেয় ক্ষুণ্ণ করে। মানুষ অভ্যাসবশে যে কার্য করে থাকে, তাতে ব্যক্তিত্বের ছাপ বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। অভ্যাসবশে মানুষ অনেকটা যন্ত্রবৎ কাজ করে যায়। এভাবে মানুষকে একটি যন্ত্র হিসাবে কল্পনা করতে তিনি বার বার সাবধান করে দিয়ে গেছেন।

চিন্তা, ভাবনা, আবেগ, প্রক্ষোভ ইত্যাদি সবই মানুষের নিজের এলাকায়। এ সবই অভ্যাসের গণ্ডির বাইরে। একই শিশু আজ যেটাকে ভাল বলে গ্রহণ করছে, কাল সেটাকে হয়ত মন্দ বলে প্রত্যাখ্যান করতেও দ্বিধা করছে না। কিন্তু অতিরিক্ত অভ্যাস-গঠনের ফলে মানুষের নিজস্ব সত্তা ক্রমশঃ হারিয়ে যায়। তার ভাল-লাগা মন্দ-লাগাও যেন শেষ পর্যন্ত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। **তথাপি একথা বলা বোধ হয় অতিশয়োক্তি হবে না যে, স্বল্প-পরিসর এ মানবজীবনে অভ্যাস-গঠনের দ্বারা সময়ের অপচয় অধিক পরিমাণে নিবারিত হয় সন্দেহ নেই।** অভ্যাস পরিশ্রমের অনেক লাঘব করে। জীবনের ছোটখাট কাজগুলি যদি বার বার নূতন করে শিক্ষা করে নেবার দরকার না হয়, সেগুলি যদি বিনা আয়াসেই সংঘটিত হতে থাকে, তাহলে বৃহৎ বৃহৎ কার্যসমুদয় নির্বাহ করার প্রচুর অবসর জীবনে পাওয়া যায় বৈ কি! চিন্তা-শক্তির এ প্রকার মিতব্যয়িতা মানবজীবনে অতিশয় প্রয়োজন। তাই বলে অভ্যাসের দাস হওয়াও সমর্থনযোগ্য নয়। এমনভাবে অভ্যাস গঠন করতে হবে, যাতে অভ্যাস আমাদের চালক না হয়, বরং আমাদের হুকুমেই সে চালিত হয়। কথায় বলে, "Habit is a good servant, but a bad master."

মানবের শৈশবকালই অভ্যাস-গঠনের প্রকৃষ্ট সময়। এ কালে শিশুর প্রবৃত্তি, আচরণ, প্রক্ষোভ ইত্যাদি সবই অতি নমনীয় অবস্থায় থাকে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সু-অভ্যাস এবং কু-অভ্যাস এই দুইয়ের বিচার করে শিশুর অভ্যাস-গঠনে সহায়তা করতে হয়। শিশু যে কাজ পছন্দ করে না, জোর করে সে কাজের অভ্যাস গঠিত করতে যাওয়া পণ্ড-শ্রমেরই নামান্তর। যে কাজ করতে শিশুর ভাল লাগে, সে বার বার করতে প্রলুব্ধ হয়। অসতর্ক মুহূর্তে যদি একটি কু-অভ্যাস শিশুর প্রবৃত্তিতে দানা বেঁধে ওঠে, তা'হলে তা থেকে তাকে মুক্ত করাও সহজ নয়। একটি কু-অভ্যাস তাড়াতে হলে, তৎপরিবর্তে তৎস্থলে একটি সু-অভ্যাস গঠনের চেষ্টা করতে হয়। কু-অভ্যাসের হাত থেকে শিশুকে বাঁচাতে হলে, দমন নীতির সাহায্য গ্রহণে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না; কারণ অভ্যাস-বশে সে ঐ কাজ করে যায়, মনের সাথে তার যোগ অতি অল্পই। **কু-অভ্যাস ছাড়াবার প্রকৃষ্ট পন্থাই হলো সু-অভ্যাস গঠনে**

মনোযোগী করা। অভ্যাস-গঠনের মূলসূত্রই হলো কাজের সাথে এষণার (Motive) যোগ করা। যে কাজের সাথে এষণার যোগ নেই, সে কাজ একই ভাবে বার বার করতে থাকলেও সহজে অভ্যাস গঠিত হয় না। অতএব অভ্যাস-গঠনে সাহায্য করতে হলে সর্বাগ্রে শিশুকে সেই কাজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে দিতে হবে। তাকে বুঝতে দিতে হবে এ কাজে তার নিজেরই ইষ্ট সাধিত হবে। একবার যদি সে বুঝতে পারে যে, এ অভ্যাসটি গঠিত হলে তার নিজেরই স্বার্থোদ্ধার হবে, তা'হলে অতি অল্প আয়াসেই সেই অভ্যাসটি তার আয়ত্তাধীন হয়ে যাবে।

অভ্যাস মানুষকে অধিকতর শক্তিশালী করে একথা সত্য। অতএব, জীবনের শুরুতেই যাতে শিশুর কিছু কিছু সু-অভ্যাস গঠিত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক অভিভাবক ও শিক্ষকেরই কর্তব্য। জীবনের প্রথম দশটি বছরই শারীরিক অভ্যাসমূহ গঠনের প্রকৃষ্ট সময়। এ বয়সে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলো পালনে যদি শিশু একবার অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক অপচয়ের হাত হতে যে সে রেহাই পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ বয়সে কিছু কিছু নৈতিক অভ্যাস গঠিত হলেও ভবিষ্যতে শিশুর চরিত্র-গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়। শিশুর পরানুকরণ-স্পৃহার সূত্র ধরেই অভ্যাস-গঠন কার্যটি শুরু হয়। শিশুর সংসর্গ যদি সে সময় ভাল না হয়, তা'হলে সেই কু-অভ্যাসের ছাপ জীবনের প্রান্তে এসেও তার আচরণে স্পষ্ট উঁকি মারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, প্রারম্ভেই কতকগুলি অভ্যাস গঠন অপরিহার্য। ঐ অভ্যাসসমূহকে ভিত্তি করেই নূতন নূতন জ্ঞান আহরণের সুযোগ সে পায়। লেখাপড়ার অভ্যাস গঠিত না হলে, প্রতিবারই যদি তাকে প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হয় তা'হলে জীবনে ক'খানা পুস্তক পড়ে সে শেষ করতে পারবে? লেখাপড়া কাজটি যদি আপনাআপনি বিনা আয়াসে চলতে থাকে, অতিরিক্ত চিন্তা-শক্তি তার জন্য যদি ব্যয়িত না হয়, তাহলেই শুধু গ্রন্থাগারের সার্থকতা উপলব্ধি করা তার পক্ষে সম্ভবপর। এ-কারণে অভ্যাস-গঠনকে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে কেউ কেউ অভিহিত করে থাকেন। অভ্যাসের কুফলও যে নেই তা নয়। অভ্যাস মানেই গতানুগতিকতা। অর্থাৎ নূতনের প্রতি আগ্রহের অভাব। বেশ ত' চলে যাচ্ছে, আবার মাথা ঘামিয়ে কি হবে?—এমনি

একটা আমেজের ভাব আসাও বিচিত্র নয়। অতএব মনে রাখা প্রয়োজন—অভ্যাস শুধু একটি কৌশল মাত্র। অভ্যাস-গঠনই শেষ কথা নয়। বার্গসোঁ (Bergson) তাই হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন—**মানুষের প্রকৃতি যদি একবার অভ্যাসের মোহে তার গতি হারিয়ে ফেলে তা'হলে বুঝতে হবে আপন সমাধি রচনার ভার সে আপন হাতেই নিয়েছে।**

॥ দশ ॥

অনুকরণ (Imitation)

একের আচরণ লক্ষ্য করে অপরেও যদি সেভাবে আচরণ করার চেষ্টা করে, তা'হলেই বলব সে অনুকরণ করছে। দেখে দেখে বা শুনে শুনে অনুরূপ ভাবে কাজ করার প্রয়াসকে অনুকরণ বলা যেতে পারে। এই অনুকরণের প্রবৃত্তিটি জীবের জন্মগত। জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার একটা প্রয়াসই অনুকরণের আকারে আত্মপ্রকাশ করে থাকে—ইহাই পণ্ডিতগণের অভিমত।

ইতর প্রাণী চলে প্রবৃত্তির বশে। এ-কারণ, অনুকরণ ক্রিয়াটি তাদের অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত। এবং ইতর প্রাণীর জীবনের ধারার সবটাই অনুকরণ সাপেক্ষ। অধিকাংশ পশুপাখীই জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সবকিছু শিক্ষা করে নিছক অনুকরণের সাহায্যে এবং এ অনুকরণের সাথে বুদ্ধি-বিবেচনার কোন যোগ নেই বললেই চলে। প্রবৃত্তির তাড়নায়ই তারা অনুকরণ করতে বাধ্য হয়। জীবনের প্রয়োজনে লাগে না এমন-কিছু অনুকরণ করতে ইতর প্রাণীর কখনো কোন বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। পিতামাতাকে দেখে দেখেই শাবকেরা শিখে নেয়—কিভাবে বাসা তৈরি করতে হবে, কিভাবে খাবার সংগ্রহ করতে হবে, কি উপায়ে অপরাপর প্রাণীর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করে চলা যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি সবকিছু। কিন্তু মানবশিশু দরকারী-অদরকারী সবকিছুই অনুকরণ করতে ভেতর থেকে যেন একটা তাগিদ অনুভব করে। নিছক অনুকরণ করেই যেন শিশু পায় প্রচুর আনন্দ। অপরের চলা-ফেরা, হাব-ভাব ইত্যাদি অনুকরণ করা শিশুর স্বভাব-ধর্ম। ভালমন্দ, দরকারী-অদরকারী, সে-সব খোঁজ নেবার অবকাশ নেই। কেবল অপরকে সার্থক অনুকরণ করেই তার আত্মপ্রসাদ। এ ধরনের অনুকরণের ভিতর মননশীলতার কোন স্থান নেই। সবটাই যেন একটা আকস্মিক ব্যাপার। অনুকরণ করে আনন্দ পায় তাই তারা অনুকরণ করে। শিশু যে কাজ কোনদিন করে নি, বা কাকেও করতে দেখেনি, সে কাজ

অপরকে করতে দেখে তৎক্ষণাৎ তার পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টাকেই অনুকরণ বলে। যাত্রাগান দেখে এসে বিছানার বালিশটিকেই গদা বানিয়ে ভীমের ন্যায় যুদ্ধ করতে শুরু করছে, কোন সভায় ভাল বক্তৃতা শুনে এসে বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবের কাছে অনুরূপ ভাবে বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করছে, গান শুনে এসে অনুরূপ ভাবে গান গাইবার চেষ্টা করছে—এসব কাজকেই নিছক অনুকরণ বলা চলে। ভীমের ন্যায় যুদ্ধ করতে আগে সে জানত না, যুদ্ধ করে কোন্ রাজ্য জয় করবে তাও তার জানা নেই, অথচ ভীমকে নকল করে ভীমের মত করে গদা চালাতে তার কি আনন্দ! এসব অনুকরণের কাজে শিশু কারো আদেশ বা নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না। মানবশিশুর এ অনুকরণ-প্রবৃত্তিটিকে শেখাবার কাজে লাগাতে পারলে বিশেষ সুফল পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই।

শিশু জানে না—কোন্‌টা অনুকরণ করলে তার ভাল হবে কিংবা কোন্‌টা অনুকরণ করলে তার মন্দ হবে। তাইত দেখতে পাওয়া যায় শিশু বয়সে অনুকরণের মারফত তারা অনেক সময় এমন সব আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যা তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অন্ধ অনুকরণের সাহায্যে শিশুরা অনেক সময় এমন সব অসামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে যার হাত থেকে তাদের মুক্ত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব শিশু জন্মাবার পর অন্ততঃ পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত তার পরিবেশটিকে বিশেষ ভাবে মার্জিত করে রাখা দরকার। নচেৎ স্বভাবসিদ্ধ অনুকরণ ক্রিয়াটি তার অলক্ষ্যে তার আচরণের তহবিলে অনেক অদরকারী এবং অশোভন আচরণ জমা করে ফেলবে। অনেক সময় দেখা যায় একটি ছেলে স্কুলে ভরতি হবার পর তার সঙ্গীদের সাথে কথাবার্তায় এমন সব ভাষা ব্যবহার করছে যা সভ্যসমাজে চলে না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে—তার জীবনের প্রথম কয়টি বছর যে পরিবেশে তাকে থাকতে হয়েছে সেখানকার বাঁধা বুলিই ছিল ঐগুলি। শাসন করে এ কু-অভ্যাস হতে তাকে মুক্ত করা সহজসাধ্য নয়। এ অপরাধের জন্য ছেলেটিকেও দায়ী করা চলে না। যে পরিবেশে শিশু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে সে পরিবেশের ছাপ শিশুতে থাকবেই। অতএব শিশুশিক্ষার প্রথম এবং প্রধান কাজই হল শিশু জন্মাবার পরই তার পরিবেশটি বিশেষ ভাবে মার্জিত করে রাখার দিকে নজর দেওয়া।

অনুকরণ ক্রিয়াটিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা

যেতে পারে। যথা,—**মননশীলতা বা বিচারবিবেচনা-শূন্য অন্ধ যান্ত্রিক অনুকরণ** এবং **উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মননশীল অনুকরণ।**

যান্ত্রিক অনুকরণকে কতকটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্রিয়া বলা যেতে পারে। যেমন, একটি শিশু কাঁদছে দেখে নিকটে যে অপর শিশুটি ছিল সেও মিছিমিছি কান্না জুড়ে দিল। কান্নার কোন কারণ নেই, অথচ কান্নার এই সংক্রমণকে রোধ করাও যায় না। এ অনুকরণের কাজটি জীবের স্বভাবেই নিহিত। পাখীর ঝাঁকে একটা ঢিল এসে পড়ল। যে পাখীটির নিকটে পড়েছে কিংবা গায়ে একটু লেগেছে সে প্রাণভয়ে উড়ে পালাল। একটি পাখী উড়ে যেতেই দেখাদেখি সব পাখীই উড়ে পালাল। কেন তারা উড়ে পালাল তার কোন কৈফিয়ৎ নেই। কোন উদ্দেশ্য নেই অথচ অপরের অনুরূপ ভাবে কাজ করার যে প্রবৃত্তি তাকেই অন্ধ অনুকরণ আখ্যা দেওয়া যায়।

কোন উদ্দেশ্যসাধন মানসে বিচারবিবেচনা-পূর্বক যে অনুকরণ তার সাথে মনের যোগ রয়েছে। তাই এ অনুকরণকে মননশীল অনুকরণ বলা হয়। এ অনুকরণ একমাত্র মানুষেই সম্ভব। বুদ্ধির পরিণতি ভিন্ন মানুষও প্রায়ই যান্ত্রিক অনুকরণেরই দাস হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এ অনুকরণে চেষ্টার প্রয়োজন। প্রথমে জাগবে অনুকরণ করার ইচ্ছা, তারপর শুরু হবে চেষ্টা ও যত্ন এবং সর্বশেষে সাফল্যলাভের আনন্দ। এ ধরনের অনুকরণে অনুকরণীয় বিষয়, বস্তু, হাব-ভাব, আদর্শ ইত্যাদি হুবহু নকল করা সকলের পক্ষে সকল সময় সমমাত্রায় সম্ভবপর হয় না। অনেক ছেলেই কুকুর, বেড়াল ইত্যাদির ডাক নকল করার প্রয়াস পায়। কিন্তু ক'টি ছেলে ঠিকভাবে কৃতকার্য হয়? তাছাড়া, উদ্দেশ্যমূলক অনুকরণ কল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে আসলকেও অনেক সময় ছাড়িয়ে যায়। অনেককে দেখা যায়—বহুদিন পূর্বে হয়ত একদিন কাউকে বক্তৃতা দিতে শুনেছিল, ক'মাস পরে সেই বক্তৃতা নকল করে বলে যেতে তার কোন অসুবিধাই হচ্ছে না। দূর থেকে নকল মানুষের বক্তৃতা বলে বুঝাই যায় না। এ ধরনের ক্ষমতা সকলের সমান থাকে না। অতএব বলা চলে—সচেষ্ট অনুকরণে সফলতা অর্জন করতে হলে নিজস্ব কিছু মূলধন থাকাও আবশ্যক। চেষ্টা করলেই যে সবাই সমানভাবে অনুকরণ করতে সক্ষম হবে একথা ঠিক নয়।

অনুকরণ একটি সহজাত প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তিটি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান। শিশুদের এ স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তিটিকে অস্বীকার করে আমরা অনেক

সময় অথবা শিশুদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তাকে সংশোধন করতে গিয়ে উৎপীড়নের আশ্রয় নিয়ে থাকি। শেখার ব্যাপারে অনুকরণ প্রবৃত্তিটি যথেষ্ট সহায়তা করে। অন্ধ অনুকরণ শিক্ষার পথে অনেক অন্তরায়ও সৃষ্টি করতে পারে। শিশুর বোধশক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত তার পরিবেশটিকে অত্যন্ত নির্মল রাখতে হবে। কোন অসঙ্গত আচরণে কদাচ যেন সে অভ্যস্ত না হয়ে পড়ে। ক্রমে বোধশক্তি জাগ্রত হলে কোন্‌টা অনুকরণ করা সঙ্গত কোন্‌টা অসঙ্গত সে সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা তাকে দেবার চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য দরকার সর্বাগ্রে শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সম্যক ব্যবস্থা করা। একবার শিশুর ব্যক্তিত্ব জাগিয়ে তুলতে পারলে যে-কোন অসঙ্গত আচরণ অনুসরণ করতে নিজেই সে লজ্জিত হবে। শিশুর বোধশক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত তার নিকটে এমন-কিছু রাখা সঙ্গত নয় যা অনুকরণ করে উত্তর জীবনে তাকে ঠকতে হয়। শিশুর যারা নিকটতম সহচর বা সহচরী তাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে শিশুকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। সে যা-কিছু দেখবে বা শুনবে, তাই অনুকরণ করতে দ্বিধা করবে না। অতএব উচ্চ আদর্শ এবং উপদেশ-পূর্ণ গল্প বা উক্তি শিশুর দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে পরিবেশন করতে হবে। শিশুকে জোর করে, শাস্তির ভয় দেখিয়ে শেখাবার চেষ্টা না করে শুধু ভাল ভাল আদর্শ তার কাছে তুলে ধরা হলেই সে অনুকরণের সহায়তায় সবকিছু আয়ত্ত করে নেবে এবং ক্রমে সঙ্গত আচরণ করা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। এক কথায়, শিশুর পরিবেশে অনুকরণযোগ্য বস্তু বা ঘটনার যোগান দিতে পারলেই শেখাবার কাজটি খুব সহজ হয়ে পড়বে। শিশুর সমক্ষে যেন কোন অনুচিত কার্য সংঘটিত না হয় সেদিকে পিতামাতার বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

ছাত্রছাত্রীদের জীবনে ভাল ভাল অভ্যাস গড়ে তোলার আসল উপাদান আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা। কোন উপদেশ ও কাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে ছাত্রছাত্রীদের জীবনে সদভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভবপর হয় না। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবন যদি আদর্শ জীবন হয়, তাহলে তাঁদের অনুকরণ করেই সহজে ছাত্রছাত্রীরা আদর্শ চরিত্র গঠনে সক্ষম হয়। শিক্ষকের আদর্শ জীবন পুস্তকে লিখিত উপদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী। লক্ষ্য রাখা দরকার—গৃহে এবং বিদ্যালয়ে বিপরীত আদর্শ স্থাপন করে

ছাত্রছাত্রীদের যেন বিভ্রান্ত করে না ফেলা হয়। শিশু যাকে ভালবাসে ও ভক্তিশ্রদ্ধা করে তাকেই সে বেশী করে অনুকরণ করে। কাজেই যে-সব শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁদের মধুর ব্যবহার দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের মন জয় করতে সক্ষম হন, তাঁদের চলা-ফেরা, হাব-ভাব এমন কি পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা অনুকরণ করতে শুরু করে দেয়। আবার যাদের ব্যবহারে তারা বিরক্তি বোধ করে, সময় সময় বিদ্রূপের ছলে তাদের সবকিছু নকল করে অপরকে দেখিয়েও তারা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। এবং অজ্ঞাতসারে তারা নানা অসঙ্গত আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অতএব ভাল আদর্শের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের অনুরাগ জন্মাতে হলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আদর্শ জীবন যাপন করা দরকার। এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সর্বপ্রথম কাজই হল ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধা অর্জন। ছাত্র এবং শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলে শিক্ষার কাজে প্রচুর বাধা এসে উপস্থিত হবে। জোর করে শিশুকে সৎপথে চালিত করা প্রায় অসম্ভব। উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে দেশের ভাবী বংশধরদের না রাখতে পারলে দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

মানুষের জীবন হতে অনুকরণকে বাদ দেওয়া চলে না। কারণ এ সহজাত প্রবৃত্তিটি মানুষের নিজের অজ্ঞাতেও অপরের ভাব এবং চিন্তা-ধারা পর্যন্ত আয়ত্ত করতে প্রয়াস পায়। অতএব অনুকরণ প্রবৃত্তিটিকে সুষ্ঠু পথে চালিত করার দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই নিতে হবে। জীবনে নানা সু-অভ্যাস গঠনে অনুকরণ একটি বিশেষ শক্তিশালী হাতিয়ার।

এ অনুকরণ স্পৃহাটি মানুষের এত প্রবল যে, কোন প্রকার বিচার-বিবেচনার অপেক্ষা সে রাখে না। তাছাড়া অনুকরণের শক্তিটি মানুষের এত ভীষণ যে, অনুকরণ করে অনেক সময় অনুকরণীয়কেও সে অতিক্রম করে ফেলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই, মানুষের এ স্পৃহাটিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হলেই বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। শুধু লক্ষ্য রাখা দরকার—এমন-কিছু অনুকরণে যেন সে প্রবৃত্ত না হয়, যা তার জীবনের প্রয়োজনে লাগবে না বা তার জীবনের উন্নতির পথে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

॥ এগারো ॥

সঙ্গপ্রিয়তা

(Gregariousness)

ইতর প্রাণীরা সবাই প্রায় সর্বক্ষণই দলবদ্ধ হয়ে চলে। মানুষ যদিও একদা আত্মরক্ষার খাতিরেই দলবদ্ধ হয়েছিল কিন্তু এই সঙ্গপ্রিয়তা বা সহযোগিতা মানবের একটি সহজাত সংস্কার। এই **সঙ্গপ্রিয়তা সংস্কারটি** (Gregarious instinct) জীবের আত্মরক্ষা এবং আত্ম-বিস্তৃতির কারণেই বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রবৃত্তিটি জীবের প্রকৃতিদত্ত। আদিম মানব একদা যে-দল বেঁধেছিল তাই ক্রমে বর্তমান সমাজের রূপ নিয়েছে। দল নানা ধরনের হতে পারে। জনতা, সঙ্ঘ, সমিতি, ক্লাব ইত্যাদিও এক একটি দল। কিন্তু এই সব দল বা উপদলের ধর্মের বিভিন্নতা রয়েছে।

কিছু সংখ্যক লোক একত্র হয়ে কোন একটি কাজ করলেই তাকে সকল সময় দল বলা চলে না। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় সত্যিকারের দল সৃষ্টি হলে **দলীয় মন** বলে একটা কিছু থাকবেই। যখন দলের সবাই একইভাবে ভাবতে শুরু করে এবং একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে প্রবৃত্ত হয় তখনই প্রকৃত দল সৃষ্টি হয়েছে বলা চলে। যখন দলের প্রতিটি সভ্যের সহজাত বৃত্তি, ভাব ও প্রবৃত্তি একত্রিত হয়ে একই পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হয়, অর্থাৎ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সবাই একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলতে শুরু করে, তখনই তাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় দল বলা যেতে পারে। সত্যিকারের দল সৃষ্টি হলে দলের প্রতিটি সভ্যের উপরই দলের একটি ছাপ পড়ে যায়। একটি সাধারণ উদ্দেশ্য বা দায়িত্ব নিয়ে দল গড়ে না উঠলে দলের অস্তিত্ব বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে না। দলের সকলেই যে যার মত কাজ করে চললে সহজেই দলটি ভেঙ্গে যাবে। এ জন্যই আমাদের দেশে যেমন নিত্য নূতন দল গড়ে উঠছে শুনতে পাই, তেমনি দল ভেঙ্গে যাবার খবরও হামেশাই আমরা

পাচ্ছি। আর এক ধরনের দল আছে যা গড়ে ওঠে ভেঙ্গে যাবার জন্যেই। যেমন, বাজারে একটি চোর ধরা পড়েছে শুনে সবাই ছুটল সেই দিকে। সবার মুখেই মার মার শব্দ। সবাই যেন একই উদ্দেশ্য নিয়ে একস্থানে মিলিত হচ্ছে। একেও দল বলতে আপত্তি নেই। কিন্তু, খানিক বাদে পুলিস এসে চোরটিকে বেঁধে নিয়ে গেল। চোরের অন্তর্ধানে দলের সভ্যগণও দল ছেড়ে যে যার মত বাজার করে ঘরে ফিরল। দলের অস্তিত্বও এভাবে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। এ ধরনের দল রোজই কত গড়ছে, আবার রোজই কত ভাঙ্গছে। রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, খেলার মাঠ, সিনেমার টিকিট ঘরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ, রেল স্টেশন ইত্যাদিতে রোজই এ প্রকার কতনা দলের সৃষ্টি হচ্ছে এবং কিছু সময়ের মধ্যেই আবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এসব দলের অস্তিত্ব অনেককে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিয়েও ছাড়ে। এই সব জনতা-ধর্মী দলসমূহের দ্বারা কাজের চেয়ে অকাজই হয় বেশী। দলের সভ্যদের উপর দলের প্রভাবও হয় অতি ক্ষণস্থায়ী। দেশের হবু নেতারাও প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্য যে-সব দল গড়ে তোলেন সেগুলোর অবস্থাও প্রায় অনেকটা এইরূপ। যেই কার্যসিদ্ধি হল অমনি নেতার সাথে দলের আর কোন সম্পর্ক রইল না। সভ্যরাও ক'দিন অপেক্ষা করে আবার যে যার মত চলে গেল আপন আপন কাজে।

তরুণ সঙ্ঘ, কৃষ্টি সংসদ, সেবা সমিতি ইত্যাদি হাজার রকমের দল আজ আমাদের দেশে গজিয়ে উঠছে। অনেক ক্ষেত্রেই এ দলগুলো সভ্যদের উপর কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় না। তা'ছাড়া এ ধরনের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা দলগুলোতে দলাদলি হানাহানি যেন লেগেই আছে। আমাদের দেশের বিপ্লবী দল সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে, তাদের কার্যকলাপ যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, দলের জন্য তাদের আত্মত্যাগের নমুনা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই জানেন সত্যিকারের দলীয় মনোবৃত্তি কাকে বলে। ঐ সব বিপ্লবী দলে যাঁরা যোগ দিতেন, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁরা দলের এক একটি অঙ্গস্বরূপ হয়ে দলের সাথে নিজেদের মিশিয়ে দিতেন। এ ধরনের দলসমূহই কেবলমাত্র পারে দলের সভ্যদের ভাবধারা এমন কি জীবনের আদর্শ পর্যন্ত পালটে দিতে। এ দলের সভ্যদের নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অবসান ঘটে যায়, অর্থাৎ দলের প্রভাবে

সভ্যদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। দলের প্রভাবে প্রতিটি মানুষের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। দলের সকলের স্বার্থ এবং লক্ষ্য থাকে সম্পূর্ণ এক। সহযোগিতার আদর্শ, আনুগত্য, নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ দলের সবাই স্বেচ্ছায় বিনা যুক্তিতে মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়। তাইত শৃঙ্খলার সত্যিকারের অর্থ এখানে খুঁজলেই পাওয়া যায়। এইসব দল মানবমনের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। এভাবে দলের শক্তি অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এ ধরনের দলের প্রেরণা অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলতে সক্ষম হয়। মানুষের সঙ্গপ্রিয়তা যখন মানুষকে এভাবে দলবদ্ধ করে তখন দলের প্রভাব হতে তাদের ফিরিয়ে আনা একরূপ অসাধ্য সাধনের মত।

স্বেচ্ছায় দলে যোগ না দিলেও, মানুষ সর্বদাই বড় একটি দলে বাস করতে বাধ্য। এ বড় দলটিকেই সমাজ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এবং সত্যি কথা বলতে কি—এই বৃহৎ দলটিই মানুষের অজ্ঞাতসারে তার সমগ্র জীবনটিকে নিয়ন্ত্রিত করতে প্রয়াস পায়। ইচ্ছা না থাকলেও, জানিনা কোন্ প্রবৃত্তি মানুষকে সমাজের চিন্তা, ভাব ও কার্যসমূহকে অনুকরণ করতে প্ররোচিত করছে। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেই এ বৃহৎ দলের একটি ছাপ অঙ্কিত হয়ে যায়। একটি শিশুকে তার নিজের সমাজ হতে অপর একটি সমাজে রেখে লালনপালন করতে গেলেই একথার সত্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। এক কথায়, মানুষের জীবনে সমাজের প্রভাবই সর্বাধিক। এই বৃহৎ দলটিরও চালক আছে। চালক বা নেতাই হল দলের শক্তির উৎস। দলের মান,—তাও প্রায় সম্পূর্ণই নির্ভর করে দলপতির উপর। দলের নেতার দেহ ও মনটি যদি সুস্থ ও সবল হয় তা'হলে দলের অস্তিত্বও অধিককাল স্থায়ী হয়। দলের চালকের যদি ব্যক্তিত্বের অভাব হয় তা'হলে সে দলে স্বেচ্ছাচারিতা অবাধে চলতে থাকে। চালকের নৈতিক প্রভাব দলের সভ্যদের উপর বিশেষভাবে ক্রিয়া করে। উন্নত চরিত্রের নেতার সাহায্যে দল গঠিত হলে, সেই দল সমাজের নানাবিধ উন্নতি বিধানে সহজেই সক্ষম হয়।

(দল বাঁধার প্রবৃত্তি সবারই আছে। দলে যোগ দিয়ে দলের শক্তিতে শিশুরা অনেক শক্তিমান হয়ে ওঠে। একা যে কাজ শিশু করতে চায় না, দলে পড়ে সে কাজ অতি আয়াসে এবং আনন্দের সঙ্গে সে করে যায়।

দলের শক্তি অসীম। এই দলীয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিশেষ সুফল পাওয়া যেতে পারে। দলে পড়ে দেখাদেখি শিশুরা এমন অনেক-কিছু করে যা ঘরে কিংবা বিদ্যালয়ে অনেক সাধ্যসাধনা করে বা ভয় দেখিয়েও তাকে দিয়ে করান যেত না। দলে থাকতে গেলেই দলের প্রেরণা সভ্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে বাধ্য। মোটামুটি বলা যেতে পারে—অনুকরণের সাহায্যেই শিশুরা দলের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। নিজের অজ্ঞাতে শিশু যখন দলের অপর সভ্যদের অনুরূপ চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয় তখনই বুঝা গেল দলীয় মন সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াটিকে **চিন্তা-সংক্রমণ** (Suggestion) বলা হয়। দলে সকলে মিলে নানাভাবে একযোগে কাজ করার ফলে সঙ্গীদের জন্য যেন একটা মায়া পড়ে যায় এবং একজনের ভাবাবেগ ক্রমে অপরে সঞ্চারিত হতে আরম্ভ করে। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় **ভাব-সংক্রমণ** (Sympathy)। এ ছাড়া একসঙ্গে চলতে ফিরতে একে অপরকে নানাভাবে **অনুকরণ** (Imitation) করতে থাকে। এভাবে চিন্তা, ভাব এবং কর্ম অনুকরণ করে করেই দলের সভ্যদের মধ্যে নানাদিক দিয়ে একটা সমতা এসে যায়। পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাব-ভঙ্গী, আচার-ব্যবহার, কাজের ধারা, চিন্তার বিষয়-বস্তু এবং ধারা—সবই যেন দলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে একটি নির্দিষ্ট খাত ধরে চলতে থাকে। যে দলে যে শিশু মিশেছে, অচিরেই সেই শিশুর উপর সে দলের একটি ছাপ পড়ে যাবে।

বালক-বালিকাদের দল গঠনের স্পৃহাটি বাংলাদেশে সরস্বতী পূজার সময় বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। এই পূজা উপলক্ষ করে পূজার ক'দিন আগে থাকতেই শহরের আনাচে-কানাচে কতনা দলের আবির্ভাব ঘটে। গ্রামেও এর প্রাদুর্ভাব ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে। এই হঠাৎ গড়ে ওঠা দলগুলোর স্থায়িত্ব বেশীদিন থাকে না। পূজা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দলের অস্তিত্ব শেষ হতে আরম্ভ করে। অতএব এ দলগুলো দলের সভ্যদের উপর কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় না। পূজার সময় ও আগে পরে কয়েকটা দিন সকলে মিলেমিশে চললেও এ দ্বারা জীবনের কোন স্থায়ী পরিবর্তন ঘটান যায় না। তথাপি দলটির সাময়িক প্রভাব বালক-বালিকদের উপর যে কত ক্রিয়াশীল তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। একটা দিন দলের নেতার আদেশে তারা অনেক অসাধ্য সাধন করে

ফেলে। ঐ ক'টা দিন যেন তারা নেতার আদেশ ও নির্দেশ পালন করার জন্যই সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই স্বেচ্ছাকৃত বশ্যতাকে তখনকার মত কোন ভাল কাজে লাগাতে পারলে সমাজ যথেষ্ট লাভবান হতে পারে সন্দেহ নেই। এইসব দলের কার্যাবলী বালক-বালিকাদের চরিত্রে কোন স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে না পারলেও ভাল কাজ করার স্পৃহা তাদের বাড়িয়ে দেয় এতে কোন সন্দেহ নেই। সেইরূপ সমগ্র বিদ্যালয়টিকেই যদি এভাবে একটি স্থায়ী দলে পরিণত করে নেওয়া যায়, তা'হলে বিদ্যালয়ের দলীয় প্রভাব ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে বিশেষ সাহায্য করবে। ছাত্রছাত্রীদের জীবনে বিদ্যালয়ের আদর্শ গভীর ছাপ এঁকে দেবে সন্দেহ নেই। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা যদি নিজেদের একটি দলভুক্ত মনে করেন এবং প্রধান শিক্ষককে সেই দলের নেতার আসনে বসিয়ে সবাই একযোগে এক লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য কাজ শুরু করে দেন তা'হলে তাঁদের দেখাদেখি ছাত্রছাত্রীরাও নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হবে এবং বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা স্বেচ্ছায় মেনে চলবে। নিজেদের দলটির সুনামের খাতিরেই সবাই স্বেচ্ছাকৃত আত্মসংযম, আজ্ঞানুবর্তিতা এবং আনুগত্য স্বীকার করে চলতে অভ্যস্ত হবে। সমগ্র বিদ্যালয়টিকে একটি দলে পরিণত করে বিদ্যালয়ের কৃষ্টি ও আদর্শকে দলের সকলের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারলে ছাত্রছাত্রীরা আপনা হতেই নানাবিধ ভাল ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হবে।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের জীবনে কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে কতটুকু সক্ষম? ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে' সংগ্রহ করে কেবল খানিকটা পুঁথিগত বিদ্যা। এই কলেছাঁটা বিদ্যা নিয়ে তারা সমাজে প্রবেশ করে সেখানে খাপ খাইয়ে চলতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করে। যে যত বেশী জ্ঞানের বোঝা বহন করে চলতে পারে সেই তত বিদ্বান। কিন্তু, বৃহত্তর সমাজে চলার মত আচার-ব্যবহার তার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে কিনা সে খবর নেবার দরকার নয় কি? বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন বিদ্যালয়ে দলীয় মন সৃষ্টি করে নেওয়া। বিদ্যালয়ে দলীয় মন গঠিত করে নিলে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই তখন হবে দলের এক একজন

অংশীদার। বিদ্যালয়ের আদর্শের ধারক ও বাহক হবে তখন বিদ্যালয় দলের সকল সভ্য। সবাই তখন এক উদ্দেশ্য নিয়ে একযোগে কাজ করে চলবে। একসঙ্গে চলতে গিয়ে যেখানে অসুবিধা বোধ হবে সেখানে নিজেকে সংস্কার করে নিতে তখন নিজেরই আগ্রহ বাড়বে। একযোগে কাজ করতে হলে যে-সব কৌশল আয়ত্ত করা দরকার তা আপনা হতেই সবাই আয়ত্ত করে নিতে চেষ্টা করবে। ক্রমে একের অসুবিধায় অপরে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। এমনি করে চিন্তা, ভাব ও কার্যের অনুকরণ দ্বারা একই আদর্শে সবাই গড়ে উঠবে। সহানুভূতি, সহযোগিতা, দরদ ইত্যাদি যে-সব গুণ বৃহত্তর সমাজে বসবাসের পক্ষে অপরিহার্য, দলের স্বার্থে তখন দলের প্রত্যেকটি সভ্য সে-সব গুণ আয়ত্ত করে নিতে চেষ্টা করবে। দলের ঐতিহ্য যাতে ম্লান না হয় সেদিকে লক্ষ্য থাকবে সবারই। বিদ্যালয়ের জন্য একবার দরদ জেগে উঠলে বিদ্যামন্দিরটিকে তখন আর কেহ অপবিত্র করবে না। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব এ ধরনের দল গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। দলীয় মন একবার সৃষ্টি করে দিতে পারলে নিয়মানুবর্তিতা, সংযম, সহনশীলতা, আজ্ঞানুবর্তিতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সুশৃঙ্খল আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সদ্‌গুণসমূহ দলে বাস করার তাগিদেই স্বেচ্ছায় মনের আনন্দে সবাই অর্জন করে নেবার চেষ্টা করবে। মোট কথা, বিদ্যালয়ে দলীয় মন সৃষ্টি করে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ লাভবান হতে পারি। সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের প্রতি সুস্থ মনোভাব গড়ে তুলতে হলে, প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে এক একটি যোগ্য নাগরিক করে তৈরি করতে বিদ্যালয়ে দলীয় মন সৃষ্টি করে নেওয়াই সবচেয়ে সমীচীন। আত্মসম্মান-বোধ, নাগরিক অধিকার, শ্রমের মর্যাদা-জ্ঞান ইত্যাদি গুণসমূহই গণতান্ত্রিক সমাজের সভ্যদের আসল মূলধন। বিদ্যালয়ে মামুলী ধরনের পাঠদানের মধ্য দিয়ে এ সমস্ত গুণের বিকাশ আমরা কখনো আশা করতে পারি না। বিদ্যালয়ে পুঁথির পড়া ছাড়া অপর কোন উদ্দেশ্য আছে বলে আজও আমরা অনেকে ভাবতে পারি না। কিন্তু প্রতিটি শিশুকে যোগ্য নাগরিক করে গড়ে তুলতে হলে বিদ্যালয়ের একটি দল-মন সৃষ্টি করে নানা প্রকার যৌথ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নাগরিকের গুণাবলীর অনুশীলন সবচেয়ে সহজ পন্থা। চিন্তা, ভাব ও কার্যের অনুকরণ দ্বারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে একত্রে

বসবাস এবং যৌথ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সমাজে বসবাসের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার সবাই সংগ্রহ করে নেবে। পড়ালেখা ছাড়া বিদ্যালয়ের এসব দিক আজও আমাদের কাছে তেমন উপাদেয় মনে হয় না। অনেক সময় বিরুদ্ধ সমালোচনার চাপেও আমরা এসব লেখাপড়া-বহির্ভূত কাজে অগ্রসর হতে সাহস পাই না। ফলে, বিদ্যালয়ের সজীবতা নষ্ট হয়ে যায় এবং পাঠাগারসমূহ ধীরে ধীরে শিশুদের কারাগারে পরিণত হয়। শিশুদের সঙ্গপ্রিয়তা প্রবৃত্তিটিকে শিক্ষার কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যেই বর্তমানে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কার্যাবলীর প্রচলন করা হয়েছে।

॥ বারো ॥

খেলা (Play)

আমাদের দেশে একটি চলতি কথা আছে—"লেখাপড়া করে যেই গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সেই।" কাজেই খেলাধুলা করে যেই—তার পরিণাম সহজেই অনুমেয়। কিন্তু মুশ্‌কিল হল—ছেলেমেয়েরা যে সারাদিন কেবল খেলাধুলাই করতে চায়। এ অবস্থায় লেখাপড়ার প্রতি তাদের আগ্রহ জন্মান সত্যি একটি সমস্যার ব্যাপার। পড়ালেখার চাইতে খেলার দিকেই যে ছেলেমেয়েদের ঝোঁক বেশী। তাদের এ স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তিটিকে একেবারে রুদ্ধ করাও সম্ভবপর নয়, এবং সমীচীনও নয়। তা'হলে খেলার সাথে পড়াকে কোন রকমে জুড়ে দেওয়া যায় না কি? কিন্তু এ অসমসাহসিক পরীক্ষায় কে প্রবৃত্ত হবে? তার চেয়ে এ দুয়ের মধ্যে একটা রফা করে নেওয়াই ভাল। লেখাপড়া, সে ত ওরা করবেই। সেটাই সবার আগে দরকার। তারপর ফাঁকে ফাঁকে একটু আধটু খেলাধুলা করুক তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু পড়তে বসেও যদি খেলার ভাবনাই ভাবে তা'হলে সেটা বরদাস্ত করব কেমন করে? পড়ার সময় পড়া, আর খেলার সময় খেলা—"Work while you work and play while you play."—এই মতবাদটিকে আঁকড়ে থাকাই সুবিধাজনক বলে মনে হয়। তবু, যত বলি তাদের পড় পড়, কিছুতেই যে ছেলে-মেয়েরা খেলার নেশা ত্যাগ করতে পারে না। ভয়ে ভয়ে খানিক পড়তে বসলেও সমস্ত মন তাদের পড়ে থাকে খেলার ভিতর। কতক্ষণে পড়া ছেড়ে খেলতে নামবে, এই থাকে তাদের চিন্তা।

মনকে তখন প্রবোধ দিই, যাক্‌ খেলার ভিতর দিয়ে অন্ততঃ শরীরটি সুগঠিত হবার কাজ কিছু হচ্ছে বৈ কি। কিছু সময় খেলাধুলাও করুক, তবে পড়ার সময় খেলাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। এ আইন জারি করার পর দেখা গেল, শিশুর দল মাতাপিতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ফাঁকি দেবার নানাপ্রকার পন্থা আবিষ্কারের কাজেই মাথা ঘামাতে

শুরু করেছে। শাসন এড়াবার জন্য তখন তারা মিথ্যার আশ্রয় নিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করছে না। যখন দেখা গেল তর্জন-গর্জন, শাসন, বেত্রাঘাত ইত্যাদি সমস্ত উপেক্ষা করেও শিশুরা খেলা কিছুতেই ছাড়তে পারছে না, তখন থেকেই মনীষীরা গবেষণা শুরু করলেন—তা'হলে খেলাটা কি? খেলায় শিশুদের এত মাদকতা আসে কোথা থেকে? এ অফুরন্ত শক্তির উৎস শিশুরা পায় কোথায়? এ-সব প্রশ্নের সমাধান করা নিতান্ত প্রয়োজন।

অনেকেই মত প্রকাশ করলেন, শিশুর বাড়তি শক্তির (Surplus Energy) প্রকাশই খেলার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। শিলার (Schiller) ও স্পেনসর (Spencer) সর্বপ্রথম পরিবাহবাদের অবতারণা করলেন। স্টীম এঞ্জিন যেমন তার বয়লারটিকে বাঁচাবার জন্য মাঝে মাঝে বাড়তি বাষ্প Safety Valve দিয়ে বের করে দেয়, শিশুরাও তেমনি বের করে দেয় তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তি খেলার মধ্য দিয়ে। নান্ (Nunn) একটু খটকা বাধালেন। তিনি বললেন, খেলার ভিতর দিয়ে যদি শিশুর অতিরিক্ত শক্তিই ব্যয়িত হয়, তা'হলে খেলার মধ্য দিয়েই তারা অতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে কেমন করে? কার্লগ্রুস্ (Karlgross) ও রাসেল (Russel) বললেন, খেলার মধ্যেই চলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি। জীবনসংগ্রামে ভবিষ্যতে যে-সব হাতিয়ারের প্রয়োজন হবে, তারই প্রস্তুতির মহলা দিয়ে নেয় শিশুরা খেলার ভিতর দিয়ে। ম্যাক্‌ডুগল (McDougall) সমর্থন জানালেন প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নীতিকে। তিনি বললেন, মানুষের বিভিন্ন সংস্কার যথা, দল বাঁধার প্রবৃত্তি, প্রতিযোগিতার স্পৃহা ইত্যাদি বিকাশ প্রাপ্ত হয় খেলার মাধ্যমে। খেলা রেচকের (Catharsis) কাজ করে। এ-মতের সমর্থকও অনেকেই আছেন। অনেকে বলেন, অবদমিত বাসনা ও আবেগসমূহ খেলার ভিতর দিয়েই পরিতৃপ্তি লাভ করার সুযোগ পায়। তাঁদের মতে মনের ভারসাম্য রক্ষার নিমিত্ত খেলার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করা চলে না। জন ডিউই (John Dewey) মত প্রকাশ করলেন, খেলা শিশুর স্বভাব-ধর্ম। শিশুর স্বভাবই খেলা। খেলার এত সব ব্যাখ্যা শুনবার পরও বুঝতে পারি না একমাত্র খেলাতেই শিশুর কখনো অরুচি দেখতে পাওয়া যায় না কেন? খেলাতে শিশুরা

কখনো ক্লান্তি বোধ করে না কেন? খেলাতেই বোধ হয় শিশুরা আনন্দ উপভোগ করে সবচেয়ে বেশী। শিশুরা খেলতে খেলতে অনেক সময় এত তন্ময় হয়ে পড়ে যে খাবার কথাও তাদের মনে থাকে না। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, খেলার মধ্যে ক্রিয়ারত থাকে একটা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার গোপন ইচ্ছা। নিজেদের গরজেই যেন শিশুরা খেলে।

খেলার এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তিটিকে শিক্ষার কাজে লাগান যায় কিনা, এ অসমসাহসিক পরীক্ষায় রবার্ট আওয়েন (Robert Owen)-ই সর্বপ্রথম কৃতকার্য হন। তারপর থেকেই খেলা সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্‌গণের দৃষ্টিভঙ্গী পালটাতে শুরু করে। খেলা আর পড়া এ দুইয়ের মধ্যকার ব্যবধান বর্তমানে প্রায় অন্তর্হিত। রবার্ট আওয়েনই সর্বপ্রথম সগর্বে ঘোষণা করলেন, শিশুকে খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা। এমনি করে একদিন লেখাপড়ার রাজ্যে খেলা এসে আসর জাঁকিয়ে বসল। শুরু হলো নিত্য নূতন খেলার সামগ্রী প্রস্তুতের কাজ। এক একটি উদ্দেশ্য নিয়ে এক এক প্রকার খেলার সরঞ্জাম তৈরী হতে লাগল। শিক্ষাবিদ্‌গণও শেষ পর্যন্ত একদিন পড়ার চর্চা ছেড়ে, ছেলে-মেয়েদের টানে, খেলার আসরে এসে নামলেন।

খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার কৌশল নির্ভর করে বিভিন্ন বয়সের খেলার বৈশিষ্ট্যের উপর। শিশুরা খেলে। আপন মনেই তারা খেলে যায়। তার ভিতর কোন উদ্দেশ্য আরোপ করতে গেলে ব্যর্থ হতে হবে। খেলার উদ্দেশ্যেই শিশুরা খেলে। তারপর বড় হয়ে ক্রমে ক্রমে তারা চেষ্টা করে তাদের উদ্ভট কল্পনাসমূহকে খেলার মধ্যে একটা রূপ দান করতে। ধীরে ধীরে শুরু হয় দল বেঁধে খেলার বিভিন্ন পর্ব। এই সব দলের সংস্পর্শে এসে তাদের বুদ্ধি ও অনুভূতিসমূহ বিকাশপ্রাপ্ত হবার সুযোগ পায়। এ বয়সের খেলার ভিতর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার বাসনাই বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এস্থলেও আত্ম-প্রতিষ্ঠার গোপন ইচ্ছাই যেন খেলার মূল উপাদান যুগিয়ে যাচ্ছে।

তার পরের বয়সের খেলাকে আর খেলা বলা যায় না। খেলার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে তাকে তখন ঘিরে ফেলা হয় বিধি-নিষেধের গণ্ডি দিয়ে। এ সময়ে খেলার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের নিয়মানুগ করা, এবং নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগান বিশেষ সুবিধাজনক। নিজেদের স্বার্থের

খাতিরেই তখন তারা নিয়ম মেনে চলবে। এভাবে বিভিন্ন বয়সে খেলার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে তারই সূত্র ধরে সময়ানুরূপ জ্ঞান পরিবেশন করাই সুশিক্ষকের কর্তব্য। শিশুর স্বাভাবিক কাজই হচ্ছে খেলা এবং খেলাতেই তাদের সবচেয়ে আনন্দ। জয়-পরাজয় নিয়ে তারা বিশেষ মাথা ঘামায় না। বড়রাও খেলে, কিন্তু ছোটদের মত সমস্ত মনঃপ্রাণ ঢেলে তারা খেলতে পারে না। শিশুদের এই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ কেড়ে নিয়ে লাভ কি? সারাদিন খেলাতেও শিশুর কোন আপত্তি নেই; কিন্তু খেলা ছাড়া অন্য কিছু করতে বললেই দেখা যায় তার আগ্রহ যেন ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসছে। খেলার মধ্যে শিশু উপভোগ করতে চায় পূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ তাই বার বার আমাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেছেন, আনন্দ ও স্বাধীনতা ছাড়া শিশুর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির আশা করা দুরাশা মাত্র। খেলার মধ্যে শিশুর কল্পনাসমূহ বিভিন্ন দিকে বিকাশের প্রয়াস পায়। তার দেহমনের উন্নতি ছাড়াও খেলার মধ্যেই শিশু খুঁজে বেড়ায় আত্মতৃপ্তি।

শিশুর এই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ থেকে তাকে বঞ্চিত না করে, তাদের মনের অজ্ঞাতসারে কিভাবে শিক্ষার কাজ শুরু করা যায়, এ নিয়ে ফ্রয়েবল ও মন্তেসরীর গবেষণার অন্ত নেই। মন্তেসরীর খেলনা ও ফ্রয়েবলের Gifts and Occupations এগুলো খেলার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা দেবার বিভিন্ন কৌশল মাত্র। অক্ষর ও সংখ্যা পরিচয় এই সব খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া কত সুবিধাজনক তা আজ আর কারও অবিদিত নেই।

একবার পণ্ডিতপ্রবর বিষ্ণুশর্মার ডাক পড়ল রাজপুত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য। ছেলেরা যদি ঘুণাক্ষরে টের পায় যে গুরুমশাই তাদের পড়াচ্ছেন, তা'হলে আর রক্ষা নেই। তৎক্ষণাৎ তারা পড়া ফেলে অন্দরে ঢুকবে। পণ্ডিতপ্রবর অনেক ভেবেচিন্তে খেলা ও গল্পের মাধ্যমে তাদের শিক্ষার কাজ শুরু করলেন। এভাবে রাজপুত্রেরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে নিজেদের জীবন সার্থক করে তুলল। এতকাল পরে, ঘুরে ফিরে আবার আমরা সেই জায়গায় এসেই পৌঁছেছি।

মাদাম মন্তেসরী দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াই সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী পন্থা। ছেলেকে পড় পড় বলেও

পড়ায় মন বসান যায় না, কিন্তু একটু ফাঁক পেলেই সে খেলা শুরু করে দেয়। শিশু যদি টের পায় যে, এ খেলাগুলি তাকে শিক্ষা দেবার একটা কৌশল মাত্র, তাহলে তক্ষুণি তার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ কোথায় অন্তর্হিত হয়ে যায় তা কে জানে! অতএব খেলার মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্যটি অতি সাবধানতার সাথে চালিয়ে যেতে হয়। উদ্দেশ্যমুখীন খেলার মারফত ছেলেমেয়েরা নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পায়, আর দলগত খেলার মাধ্যমে তারা আপন প্রয়োজনেই নিয়মানুগ হয়ে ওঠে। এই নিয়মানুবর্তিতা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার অভ্যাস হয়ে গেলে, শৃঙ্খলা ও শাসন ব্যাপার নিয়ে শিক্ষকদের দুশ্চিন্তা অনেক পরিমাণে লাঘব হয়ে যাবে বৈ কি!

বিদ্যালয়ের চারি দেয়ালের কারাগারে বসে শিশুরা যে কিরূপ আনন্দের সঙ্গে পাঠগ্রহণ করে, ছুটির ঘণ্টার সাথে সাথে তাদের উল্লাস-ধ্বনিই তা সপ্রমাণ করে দেয়। হঠাৎ কোন অনিবার্য কারণ উপলক্ষে যদি মাঝপথে ছুটির ঘণ্টা বেজে ওঠে, তাহলে ছাত্রছাত্রীদের চোখেমুখে যে আনন্দের লহরী খেলে যায় সেদৃশ্য বাস্তবিকই উপভোগ্য। অন্ততঃ সেদিনকার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মত এত ভাল মানুষ তারা বুঝি আর খুঁজে পায় না! অতএব এহেন কারাগারে আবদ্ধ করে শিশুর সত্যিকারের বিকাশের আশা দুরাশা নয় কি?

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি বর্তমানে শিক্ষাবিদ্‌গণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু শিশুদের কাছে খেলা ও কাজের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট বিভেদ-রেখা টানা যায় না। ভাঙ্গা আর গড়া নিয়েই তাদের খেলা। গড়তে যেমন তাদের উৎসাহ আবার ভেঙ্গেও তারা কম আনন্দ পায় না। লাভ-লোকসান খতিয়ানের ধার তারা ধারে না। মাটির পুতুল তৈরি করা, হাতী-ঘোড়া খেলা, রেলগাড়ি খেলা, ছবি আঁকা ইত্যাদি খেলা শিশুর বিশেষ প্রিয়। অর্থাৎ কোন নূতন জিনিস তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই, সে চায় তাকে অনুকরণ করতে। অতএব শিশুর খেলা ও কাজের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। খেলা ও কাজ উভয়ের মধ্যেই মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তি ক্রিয়ারত। এই সব প্রবৃত্তির মারফত শিশুকে নানা বিষয়ে জ্ঞান দান করার চেষ্টাকেই Ply-way Method বলা যেতে পারে। ইহাই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মূলসূত্র। অতএব অনর্থক ভূরি ভূরি পুস্তকের বোঝা জোর করে শিশুর মস্তিষ্কে চাপিয়ে তাকে পঙ্গু করে না দিয়ে, তার চাহিদা মত স্বাধীন ভাবে তাকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার সুযোগ দিলেই তার শক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভবপর। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত

আনন্দ ও গতি-প্রবাহকে ধ্বংস না করে, কিভাবে তাকে কাজে লাগান যায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ এ সমস্যাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। খেলাকে ছেলেখেলা বলে উড়িয়ে দেবার সময় আর নেই। শিশুকে জানতে হলেও খেলার সূত্র ধরেই অগ্রসর হতে হবে। অতএব, শিক্ষাবিদ্‌গণের দৃষ্টিতে খেলা এখন নিত্য নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে।

॥ তেরো ॥

ব্যক্তিত্ব (Personality)

চেহারায়, স্বাস্থ্যে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, নিপুণতায় এমনকি চরিত্রে পর্যন্ত দুটি ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য সহজে পরিলক্ষিত হয় না, তথাপি এদের পৃথক করে ভাবতেও কিন্তু আমাদের কোন বেগ পেতে হয় না। ব্যক্তির এই স্বাতন্ত্র্যের মূলেই রয়েছে তার ব্যক্তিত্ব। সমস্ত দোষগুণের পরিচয় পাবার পরও ব্যক্তিটিকে সম্যগ্‌রূপে চিনে উঠতে আরও যেন কি বাকী থেকে যায়। আসল ব্যক্তিটি রয়েছে ঠিক যেন তার সমস্ত দোষগুণের অন্তরালে দাঁড়িয়ে। অথবা আসল ব্যক্তিটি যেন তার সমস্ত দোষগুণের যৌগিক মিলনে গঠিত। একেই ব্যক্তিত্ব বলা যেতে পারে।

অলপোর্ট (Allport), ম্যাককার্ডি (MacCurdy), মার্ফি (Murphy), ম্যারে (Marray) প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ মানুষের এই ব্যক্তিত্বের এক একটি সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন।

অলপোর্টের ভাষায়—"...It is the dynamic organization within the individual of those psycho-physical systems, that determine his unique adjustment to his environment."

ম্যাককার্ডির মতে—"...Personality is an integration of patterns (interest) which gives a peculiar individual trend to the behaviours of the organism."

মার্ফি কিন্তু দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। দেহগত বৈশিষ্ট্যের দিকথেকে তিনি বলেছেন—"...Tissues of the body making their responses to outer or inner stimulation." সামাজিক দিক থেকে বিচার করে তাঁর বক্তব্য—"Personality is viewed as responses which serve to enact specific roles assigned to the individual by virtue of age, sex, race, occupational status, religion or any other category which society emphasizes."

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, মনোবিজ্ঞানীরা বলতে চেয়েছেন—"It is the unique aspects of self arising out of personal history." আর সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষায়—"It is the relationship which determines the role of individual in the group and differentiate him from other members."

এইভাবে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশকে শুধু যাচাই করার একটা চেষ্টা অনেকেই করেছেন। কিন্তু স্থূলের সাহায্যে সূক্ষ্মের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব কিনা জানি না। তবুও কি মানুষের চেষ্টার বিরাম আছে!

ক্ষুদ্র শিশু—কোন প্রকার প্রভাব পারে নি তখনও তাকে স্পর্শ করতে, অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও তার শূন্য, অথচ খুঁজলে তার সমস্ত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য যেন স্বতঃই ধরা পড়ে। ভাই-বোনেরা বই নিয়ে পড়তে বসেছে দেখে, এগিয়ে এসে একটি শিশু হয়ত বইয়ের পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে মুখে পুরতে লাগল, অপর শিশুটি তখন হয়ত দূরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। এভাবে একই পরিবেশের উত্তেজনায় বিভিন্ন প্রকার সাড়া স্বভাবতঃই আমরা দেখে থাকি। একের হলো অপার আনন্দ, অপরের চোখে-মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের ছাপ। **একই পরিবেশে এই যে বিভিন্ন রূপ প্রতিক্রিয়া, এর উৎস সন্ধানে বের হলেই আমরা ব্যক্তিত্বের দেখা পাব বলে মনে হয়।** কোন্ উপাদানের প্রভাবে একই পরিবেশে দুটি শিশুর প্রতিক্রিয়া দু'রকম রূপ পরিগ্রহ করে এ প্রশ্নটির মীমাংসা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

মানবশিশু বংশানুবর্তনে যে মূলধনটুকু নিয়ে আসে, পরিবেশ তাকে খাটিয়ে তার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নেয় এ-কথা সত্য। পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতেই শিশুর মনের ভাণ্ডারে অভিজ্ঞতা-সংস্কার ক্রমে জমা হতে থাকে। কিন্তু কি বিচিত্র! একইরূপ পরিস্থিতিতে কিন্তু সব শিশুর একইরূপ শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন আশা করা যায় না। তা'হলে তো ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এত বিভেদের আর কোন কারণই থাকত না। ইচ্ছামতো সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের যন্ত্রে সবাইকে ঢেলে একই ছাঁচে গড়ে তোলাও বিশেষ কষ্টসাধ্য হতো না। ঘুচে যেত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এত পার্থক্য। পূর্বেই বলা হয়েছে, অবস্থা সৃষ্টির কর্তা আমরা, কিন্তু গ্রহণ বা বর্জনের মালিক

শিশু নিজে। শিশু যেন বলতে চাচ্ছে, আমার যাতে আনন্দ হবে সে কাজই তো আমি করব। আখেরে আনন্দলাভ হবে একথা যদি আমায় সমঝে দিতে পার তাহলে আমার কাজের উদ্যম দেখে তোমরা অবাক্ হয়ে যাবে। ভয় দেখিয়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নিলে তোমাদের কোন লাভ হবে কি? প্রথমে আমাকে বাঁচতে দাও। আমার আনন্দ থেকে আমায় বঞ্চিত কোরো না। এই 'আমি'ই শিশুর ব্যক্তিত্ব।

Thinking, Willing, and Feeling অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম, ও ভাব— এই তিনটি বৃত্তি একটি অপরটির সাথে সম্পর্কহীন নয়। মানবের ইচ্ছা-বৃত্তির সাথে জড়িত রয়েছে তার জ্ঞানবৃত্তি ও ভাববৃত্তি। কাজের অন্তে আনন্দলাভ হবে এ-জ্ঞান জন্মালে আপনা হতেই তখন কাজ করার ইচ্ছা বা আগ্রহ জাগে। মানবের এই স্বাধীন ইচ্ছাকেই তার ব্যক্তিত্ব আখ্যা দেওয়া যেতে পারে বৈ কি! ভারতীয় ঋষিদের ভাষায় সৎ, চিৎ, এবং আনন্দই ব্রহ্মের অর্থাৎ জীবের স্বরূপ। এই তিনটি শক্তি ব্যক্তি মাত্রেরই ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান। জীবের স্বরূপই সচ্চিদানন্দ। অতএব মানব মাত্রেরই ব্যক্তিত্ব আছে একথা বললে ভুল হবে না। তবে ইংরেজীতে Personality শব্দটির সচরাচর আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি সে অর্থে ব্যক্তিত্ব অনেকের নাও থাকতে পারে। অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা সবার কাছ থেকে সমান আশা করা যায় কি? অপরের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাটিকে শুধু ব্যক্তিত্বের একটি লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু **ব্যক্তিত্ব এমন একটি উপাদান যাকে ব্যক্তির সমস্ত আচার-ব্যবহারেই ক্রিয়ারত দেখতে পাওয়া যায়।**

যে-কোন কাজ করার প্রেরণা বা ইচ্ছার সাথে জড়িত রয়েছে কাজের লাভালাভের বিচার এবং অনুভূতির আনন্দ। যে কাজে আনন্দ নেই, স্বেচ্ছায় সে কাজ করার আগ্রহ শিশুর না থাকাই স্বাভাবিক। সৃষ্টির শুরু থেকে জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে মানুষ ধেয়ে চলেছে শুধু আনন্দের সন্ধানে। কোথাও আনন্দের একটু আস্বাদ পেলে তার সুপ্ত শক্তি যেন তখনই জেগে ওঠে। এই 'আত্মশক্তিকে' ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বলে ধরে নিতে আপত্তি কি? তাই বলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অনুশীলন-সাপেক্ষ নয়, এ যুক্তিও অসার। আদি ইচ্ছাশক্তিটি মানুষের জন্মগত হলেও তার

বিকাশ এবং পরিমার্জন মানবের আয়ত্তের বাইরে নয়। শক্তিটি যদিও স্বাধীন তবু অধিকাংশ স্থলেই এর বিকাশ বিভিন্ন স্থূলবস্তুর প্রভাব হতে কখনও মুক্ত নয়। দৈহিক গঠন, শরীরের ও মনের খোরাক, পারিবারিক পরিবেশ এবং সর্বোপরি বিত্থালয়ের পরিবেশই শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। নানা প্রকার সু-অভ্যাস গঠন করে, ব্যক্তিত্বের মুখে সাময়িকভাবে বল্গা পরিয়ে রাখাও অসম্ভব নয়। ব্যক্তিত্বের মূলধনটুকু মানুষের জন্মগত হলেও মানবসৃষ্ট নানা প্রকার অবস্থার চাপ দ্বারা একে একটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করা মানুষের আয়ত্তের বাইরে নয়।

ব্যক্তির সমগ্র রূপটি দেখতে হলে শুধু তার দোষগুণের খতিয়ান করলেই চলে কি? দেখতে হবে সমস্ত দোষগুণ মিলিয়ে ব্যক্তিটি কোন্ অবস্থায় কিভাবে সাড়া দিচ্ছে। শুধু যে-কোন একটি দোষ বা একটি গুণকে অবলম্বন করেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না। স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, নৈপুণ্য, প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, মেজাজ, মর্জি, আবেগ, অনুভূতি ও আচরণ ইত্যাদির সমন্বয়েই ক্রমে তার নিজস্ব একটি Style গঠিত হয় এবং এই Style-এর মাধ্যমেই প্রকৃত ব্যক্তিটি ধরা পড়ে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—"Style is the man himself." সত্ত-প্রসূত মানবশিশু ধরায় অবতীর্ণ হবার সময় থেকেই সাথে করে নিয়ে আসে কতকগুলো প্রতিক্রিয়া (Reflex) যার জন্য কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে না। তাই নূতন করে কোন অভ্যাস গড়ে উঠবার পূর্ব পর্যন্ত তার নিয়ে আসা স্বভাবজাত প্রবৃত্তিসমূহই তাকে চালিত করে। মাতৃগর্ভের পরিবেশে যা-কিছু অভ্যাস তার গড়ে উঠেছিল, নূতন পরিবেশে এসে সে সবই হয়ে যায় একরূপ অকেজো। নূতন পরিবেশে চলার মতো কিছু কিছু সম্বল তার থাকলেও বাকী সবকিছুই তাকে নিতে হয় আহরণ করে। এক কথায়, নূতন করে আবার তাকে লাগতে হয় প্রস্তুতির কাজে।

ব্যক্তিত্বের বীজ সাথে করে শিশু ধরায় অবতীর্ণ হলেও তার বিকাশ বা প্রকাশ সে সময় থাকে অত্যন্ত অস্পষ্ট। তারপর কেবলমাত্র অনুকূল পরিবেশের সহায়তায়ই বীজটি ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়ে ফুলে ফলে সুসজ্জিত হয়। অর্থাৎ পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতেই শিশুর ব্যক্তিত্ব ক্রমে প্রতিভাত হতে শুরু করে। এমনি করে শিশুর দল যেন

বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে যে যার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দলভ্রষ্ট হতে থাকে। যার যার প্রেরণা অনুযায়ী নূতন পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নেবার চেষ্টায় সবাই একাগ্রভাবে লেগে যায়। এমনি করেই শিশুতে শিশুতে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

সামাজিক ব্যবহারের মাধ্যমেই দোষ-গুণ সম্যগ্‌রূপে পরিস্ফুট হয়। তা বলে সামাজিক প্রভাবই ব্যক্তিত্বের একমাত্র নিয়ামক এ-কথাও বলা চলে না। জীবের দেহগত (Biological) বৈশিষ্ট্যও ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। দেহের সাথে মনের যে কী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তা কারো অজানা নেই। মানবের বুদ্ধি, নিপুণতা ইত্যাদির সাথে মস্তিষ্কস্থিত ধূসর পদার্থের (Grey matter) যোগাযোগের সংবাদ বৈজ্ঞানিক-গণের কাছে ধরা পড়েছে। তাছাড়া মানুষের কতকগুলো আচরণের সাথে সাথে দেহযন্ত্রেরও নানা পরিবর্তন হতে দেখা যায়। যেমন রাগে অথবা ভয়ে দেহের অভ্যন্তরস্থ কতিপয় গ্রন্থি (Gland) থেকে প্রচুর পরিমাণে অ্যাড্রেনেলিন ক্ষরিত হয়। অবশ্য এই পরিবর্তনসমূহ আচরণের হেতু না হলেও আবেগের প্রকাশ-ভঙ্গিমাকে রূপ দিতে যে কিছুটা সাহায্য করে এতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব মানুষের আবেগসমূহের বহিঃ-প্রকাশকে রূপায়িত করতে দেহযন্ত্রের এসব পরিবর্তন উপেক্ষণীয় নয়। মানুষের বুদ্ধি, নিপুণতা, আবেগ, অনুভূতি, মনের ধরন (Temperament)—এসব মিলিয়েই গঠিত হয় তার ব্যক্তিত্ব। অতএব ব্যক্তিত্ব গঠনে মানবের দেহগত প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। দেহগত বৈশিষ্ট্য যদিও মানুষ তার জন্মের দ্বারাই লাভ করে থাকে, তথাপি উপযুক্ত সাবধানতা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করলে, আমাদের জমার ঘরের অঙ্ক বাড়ে বৈ কমে না।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সমাজের সংস্পর্শে এসেই পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করে। অনেক স্থলে, আমাদের অজ্ঞতা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য না করে বরং বাধা দান করে। পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের অসাবধানতায় অনেক সময় ছেলেমেয়েদের এমন সব স্বভাব গড়ে ওঠে যা তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল নয়। শিশুর ভীরুতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, বিশ্রী মেজাজ, খিট্‌খিটে স্বভাব ইত্যাদি অসামাজিক ব্যবহার প্রতিকূল পরিবেশেরই বিষময় ফল। প্রতিটি শিশুর মাঝেই ঘুমিয়ে আছে এক একটি বয়স্ক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ

সম্ভাবনা। তাই শিশুর ব্যক্তিত্বের যাতে কোনপ্রকার অমর্যাদা না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। অতিরিক্ত আদর দিয়ে কিংবা আপন আপন বাসনা অনুযায়ী তাদের গড়তে গিয়ে অনেক সময়ই আমরা তাদের পঙ্গু করে ফেলি। বিদ্যালয়ের প্রভাব শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে গৃহপরিবেশের চেয়ে কম কার্যকরী নয়। লক্ষ্য রাখা দরকার, বিদ্যালয় এবং গৃহ এ দুটি যেন দু'দিক থেকে আকর্ষণ করে শিশুর কর্তব্য নির্ধারণে খটকা না বাধায়। এ সময় দোটানায় পড়ে অনেক শিশুই ভবিষ্যতে সন্দিগ্ধচিত্ত হয়ে ওঠে। কর্তব্য নির্ধারণে অনেক সময়ই তারা চিত্ত স্থির করতে পারে না।

বিদ্যালয়-সমাজের সবচেয়ে কার্যকরী শক্তিই হলো শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব। শিক্ষকের বিরাট ব্যক্তিত্ব অজ্ঞাতসারে ছাত্রছাত্রীর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। উচ্চ ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হলে কোন শিক্ষকের পক্ষেই ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধা অর্জন করা কিংবা আপন কর্তৃত্বাধীনে তাদের রাখা সম্ভবপর হয় না। উপযুক্ত শিক্ষক তাঁর অন্তরের সমস্ত স্নেহমমতা ঢেলে দিয়ে শিশুর অহংকে সর্বদা বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সাহায্য করবেন। এ কথা তাদের বুঝতে দিতে হবে যে তারা সবাই অমৃতের সন্তান। এমনি ভাবে তাদের পরিবেশ সাজিয়ে রাখতে হবে যেন অক্ষমতার গ্লানি তাদের সহজে স্পর্শ করতে না পারে। ছাত্রছাত্রীদের সমক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারাই এক একটি বাস্তব আদর্শ। এ সময় সহপাঠীদের প্রভাবও ব্যক্তিত্বের উপর নানা ভাবে রং লাগাতে সাহায্য করে। অতএব বিদ্যালয়ের সমগ্র পরিবেশটি যাতে ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং বিকাশে সম্যক সহায়তা করে তার উপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

চরিত্র বলতে আমরা ব্যক্তিত্বের নীতিগত উপাদানটিকেই শুধু বুঝি। "Character is the social evolution of behaviour." সমাজের চোখে বা বিচারে মানুষের যে-সব ব্যবহার সঙ্গত বলে বিবেচিত হয় সেগুলো আয়ত্ত করতে পারলেই চরিত্রবান আখ্যা লাভ করা যায়। সামাজিক ব্যবহারের বিচারকর্তা সমাজ। এক সমাজ যে ব্যবহারকে বলছে উত্তম, অপর সমাজ হয়ত তাকে মন্দ বলে আখ্যা দিচ্ছে। এক সমাজ যাকে মার্জিত রুচি বলে স্বীকার করে নিচ্ছে, অপর সমাজ তাকে অমার্জিত বলতেও দ্বিধা করছে না। ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, এ-সব সংজ্ঞাগুলোও মানব-সৃষ্ট মানের বিচারেরই ফল। অতএব পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, এ-সবের একটি

নিরপেক্ষ তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে মোটামুটি সর্বসমাজগ্রাহ্য ব্যবহারসমূহ আয়ত্ত করলেই চরিত্রবান হওয়া যায়। এই সব সামাজিক ব্যবহারে শিশুরা যাতে অভ্যস্ত হয় সেভাবে পরিবেশটিকে সাজিয়ে রাখাই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

শিশু কেন এ-সব ব্যবহারে অভ্যস্ত হবার জন্য লালায়িত হবে? শিশুকে যদি একবার বুঝিয়ে দিতে পারা যায় যে, এই সব ব্যবহারে অভ্যস্ত হলে তার নিজেরই মঙ্গল হবে, তাহলে আপন চেষ্টায়ই সে সেগুলি আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে। পূর্বে বলেছি, ইচ্ছার সাথে জ্ঞান ও ভাব অর্থাৎ চিৎ এবং আনন্দ-শক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আগে জানতে হবে এ-কাজে আমার লাভ কি। যখনই হৃদয়ঙ্গম হবে যে এ-কাজে আখেরে আমারই আনন্দলাভ হবে, তখনই ইচ্ছা যাবে সে কাজ করতে। **এ ইচ্ছাশক্তিকেই ব্যক্তিত্ব বলে ধরে নিতে পারা যায়।** অতএব, **সমস্ত শিক্ষা ব্যাপারটাই হচ্ছে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ।** সবার আগে শিশুকে দিতে হবে তার শক্তির পরিচয়। তার মনের বল সুদৃঢ় হবে তখনই যখন সে জানবে আমিও নগণ্য নই। তারপর পরিবেশ সৃষ্টি করে পরিবেশের মারফত তাকে জানিয়ে দিতে হবে, এটা করলে লাভ, ওটা করলে ক্ষতি ইত্যাদি।

এমনি ভাবে সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, এক কথায় কাজের ফলাফল চিন্তা করে সে যখন কাজে লাগবে তখন থেকেই শুরু হবে তার চরিত্রগঠন। নৈতিক বোধটি সমস্তই সামাজিক জীবনযাত্রার অবদান। অতএব যে সমাজে নৈতিক গুণের বাস্তব উদাহরণ যত বেশী সে সমাজের শিশুদের পক্ষে আপনা হতেই ন্যায় নীতিতে শ্রদ্ধাবান্ হয়ে ওঠার অবকাশও তত বেশী। চরিত্র কেবলমাত্র পরিবেশেরই দান নয়। সহজাত প্রেরণার বৈষম্য হেতুই একই পরিবেশেও চারিত্রিক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় এবং এ-কথাও সত্য যে প্রত্যেক স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তিই ইচ্ছা করলে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে পারেন। তাই তো বলা হয়েছে যে, চরিত্রবল অর্জন করা সাধন-সাপেক্ষ। ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ উন্নত চরিত্রলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। শিশুকে নানারূপ অবস্থায় ফেলে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণের ভার তাকেই নিতে বাধ্য করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে সাফল্যের আনন্দ থেকে শিশু যেন বঞ্চিত না হয়। কারণ, এ আনন্দই শিশুর কর্ম-প্রেরণার মূল উৎস।

শিশুকে সর্বদা সাহস যোগান দিতে হবে। সে যে ভাল এবং তার শক্তিও যে কোনপ্রকারে ন্যূন নয় এ বিষয়ে তাকে সজাগ করে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে আত্মশক্তিতে সে যেন বিশ্বাস না হারায়। আসল কথা হলো—শিশুকে সাহায্য করতে হবে তার আত্মপরিচয় জানতে। কারণ আত্মপরিচয় অবগত হলে আত্মপ্রত্যয় আপনা হতেই আসবে, নিজের সত্তা ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বোধও তার জাগ্রত হবে। আত্মসম্মান-বোধ একবার জেগে উঠলে কোন প্রকার অন্যায় কাজ করতে তখন তার একটু বাধবে। চরিত্র গঠনে এই আত্মসম্মান-বোধটি একটি সজাগ প্রহরীর কাজ করে। মানবের সমগ্র চেষ্টা ও সাধনা নিজেকে জানার জন্যই যদি ব্যয়িত হয়, শিক্ষার মারফত যদি আত্মজ্ঞান লাভ হয়, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ তা'হলেই হয় সহজসাধ্য।

॥ চৌদ্দ ॥

কর্ম-প্রেরণা (Motivation)

গতি সৃষ্টি করতে হলে গতি-উৎপাদনক্ষম একটা কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে। মানুষ যে কাজই করুক না কেন, তার পেছনে একটা প্রেরণা বা গতিবেগ থাকতেই হবে। যেমন,—ক্ষুধা পেলেই আমরা খাই, পাবার বাসনা জাগলেই পেতে চেষ্টা করি, অভাব বোধ করলেই অভাব পূরণ করতে চেষ্টা করি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে মোটামুটি ধরে নিতে পারা যায়—প্রয়োজন-বোধই জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। এ প্রয়োজন দেহেরও হতে পারে আবার মনেরও হতে পারে। দেহের এবং মনের চাহিদা (Physiological & Psychological needs) এ দুটোকে সব সময় পৃথক করে ধরাও যায় না। দেহের প্রয়োজনকে মনের প্রয়োজন বলে আমরা অনেক সময়ই ভুল করি। কর্মে প্রেরণার উৎস যেমন জীবের ভিতরে রয়েছে, আবার বাইরের উদ্দীপনার (Incentive) সহায়তায়ও জীবকে কর্মে প্রেরণা দান করা যায়। অবশ্য, কর্মে প্রবৃত্তি না জাগিয়েও জীবকে দিয়ে অনেক কাজ করান যায় বটে, কিন্তু ঐ সব কাজের সাথে প্রাণের যোগ অতি অল্পই থাকে। প্রাণহীন অভ্যাসের দ্বারা জীবকে কতকগুলো কৌশল আয়ত্ত করতে বাধ্য করান যায় একথা সত্য, কিন্তু **ঐ সকল অভ্যাস কখনো তার নিজস্ব হয় না।** নির্দেশ ব্যতিরেকে সে স্বেচ্ছায় জীবনে কখনো ঐ সকল কাজের পুনরাবৃত্তি করতে প্রবৃত্ত হবে না। প্রাণহীন কর্ম জীবনে কখনো স্থায়ী আসন অধিকার করতে সক্ষম হয় না। বাঁদর-নাচ দেখে লোকে কত আনন্দ পায়; কিন্তু মালিকের নির্দেশ ভিন্ন বানর স্বেচ্ছায় কখনো নাচতে চায় কি? কারণ—ঐ কাজটির সাথে তার প্রাণের কোন যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি। কর্ম-প্রেরণার উদ্দীপনা ভিন্ন কর্মের কোন সার্থকতা নেই।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিশুকে শেখাতে হলে, প্রথমে শেখার জন্য শিশুর

একটা প্রেরণা যোগান (Motivation) দরকার। সংক্ষেপে—"Motivation is an essential condition of learning" একথা বললে বোধ হয় অতিশয়োক্তি হবে না। শিখবার আগ্রহ জাগ্রত করে দিতে পারলে শিখবার শক্তিও যেন শতগুণে বর্ধিত হয়। শেখার জন্য শিশুর ইচ্ছাশক্তি সঞ্চারিত হলে, কি করে সহজে শেখা যায় সে সন্ধান শিশু নিজেই আবিষ্কার করে নিতে পারে। অতএব, শেখাবার মূল লক্ষ্য হল—কি উপায়ে শিক্ষার্থীর শেখার জন্য আগ্রহ বা প্রেরণা যোগান যায়। এভাবে শিক্ষার্থীর ইচ্ছাশক্তির সঞ্চার করতে যিনি সক্ষম তাঁকেই সুশিক্ষক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

মানুষ কি চায়? অধিকাংশ মানবের কাছ থেকেই এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর সহসা আশা করা যায় না। আমরা আজ যেটা চাই, কাল হয়ত সেটা আর চাই না। আজ যে দৃশ্যটি ভাল লাগে, কাল হয়ত সে দৃশ্যটিকেই চোখের আড়ালে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আজ যে কাজ করতে উৎসাহ বোধ করি, কাল হয়ত সে কাজে আর তেমন উৎসাহ থাকে না। আর, আমাদের চাহিদাগুলোরও যেন কোন অন্ত নেই। তবে, সকল মানুষের জীবনেই এমন কতকগুলো সাধারণ চাহিদা আছে যা না হলে সে কিছুতেই তৃপ্তি পায় না। খুঁজে খুঁজে এ ধরনের সাধারণ চাহিদাগুলোর একটা ছোট তালিকা তৈরি করে নিলেও দেখা যাবে—বিভিন্ন মানুষের জীবনে সেগুলোও যেন বিভিন্ন রকমেই আত্মপ্রকাশ করছে। ব্যক্তিটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের রঙে রঞ্জিত হয়েই যেন সেগুলো তার জীবনে দেখা দেয়। এবং ঐগুলির মারফতই সে খুঁজে বেড়ায় আত্মতৃপ্তি। আত্মতৃপ্তিই সকলের কাম্য। কেবল পথের বিভিন্নতা মাত্র। অধিকাংশ মানবের জীবনেই ঐসব চাহিদাগুলোর পেছনে কোন মূল উদ্দেশ্য নিহিত নেই। কেবল মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যক্তির জীবন অনুসন্ধান করলেই তার সমস্ত চাহিদারই একটা কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সাধারণ মানুষের জীবনের চাহিদাসমূহের কোন স্থির লক্ষ্য নেই। অতএব কেন্দ্রচ্যুত চাহিদাসমূহ সদা পরিবর্তনশীল। তথাপি, অসংখ্য চাহিদার মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ চাহিদাগুলি বাছাই করে নেবার সামর্থ্য একমাত্র মানুষের কাছেই আশা করা যায়। জন্মাবার পর হতেই এক এক রকম জীব এক এক ধরনের কর্ম শুরু

করে দেয়। যেমন, হাঁসের বাচ্চা জলে ডুব দেয়, গরুর বাছুর মাতৃস্তন্য পান করে, বানর-শিশু বৃক্ষশাখা অবলম্বন করে ইত্যাদি কর্মসমূহের প্রেরণা তাদের জন্মগত। এগুলোকে স্বভাবজ কর্ম বলা যেতে পারে। আমাদের শাস্ত্র একেই পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার বলেছেন, যা জীবের সূক্ষ্মদেহের সাথে লিপ্ত থাকে। পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারবশতঃই শিশুতে শিশুতে এত প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারবশতঃই এক একটি শিশু এক এক ধরনের কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়। কোন কোন শিশু নোংরা ঘাঁটতে পছন্দ করে, আবার কোন কোন শিশু হয়ত পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করে। কেউ বা মিষ্টি খেতে ভালবাসে আবার কেউ বা টক, ঝাল ইত্যাদি বেশী পছন্দ করে। এই পছন্দ-অপছন্দগুলো মানুষের জন্মগত হলেও এগুলো জীবনে অপরিবর্তনীয় নয়। তিক্ত দ্রব্য খেতে অনেকেই ভালবাসে না; কিন্তু, তিক্ত খেলে শরীরের উপকার হয় এ বিশ্বাস যদি একবার কারো ভেতর জন্মিয়ে দেওয়া যায়, তা'হলে দেখা যাবে ক'দিন বাদেই তিক্ত গ্রহণে সে আর কোন আপত্তি করছে না। ক্ষুধা পেয়েছে, ছেলে খাবারের থালা নিয়ে খেতে বসেছে—মা রাগ করে বল্লেন—পরীক্ষায় পাস করতে পারিস্ নি, খেতে লজ্জা করে না? অভিমান হল, তখনই হয়ত খাবার ফেলে রাগ করে সে চলে গেল। এস্থলে, খাবারের চাহিদার চেয়েও সম্ভ্রমের চাহিদা তার জীবনে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাইত কোন্ চাহিদা কখন কার জীবনে বড় হয়ে দেখা দেবে সেটা সম্পূর্ণই নির্ভর করছে ব্যক্তিটির উপর। বসে বসে গল্প করছ, একজন বললে—আগুন লেগেছে। শুনে জিজ্ঞেস করছ—কোথায় লেগেছে? কি করে লাগল? ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার রাস্তা দিয়ে 'আগুন' 'আগুন' চিৎকার করে লোক ছুটে যাচ্ছে—শুনে দিগ্‌বিদিক ভুলে তুমিও হয়ত তৎক্ষণাৎ ছুটতে আরম্ভ করলে দলের পেছনে। এভাবে বাইরের উদ্দীপনা (Incentive) অনুভূতির রাজ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত কর্মে প্রেরণা আসে না। এই অনুভূতির মালিক ব্যক্তিটি নিজেই। অতএব, মানুষের ভিতর তার সত্যিকারের 'আমি'টাই মানুষকে কর্মে প্রেরণা যোগায়। এবং এই 'আমি'র সত্যিকারের চাহিদা জানতে পারলেই সহজে তাকে কর্মে প্রবৃত্ত করান যায়। মানবের আদিম বাসনাই হল **নিজেকে জানা**। এবং নিজেকে জানবার উদ্দেশ্যেই

মানুষ সারা জীবন ধরে কর্ম করে চলেছে। নিজেকে উপভোগ করেই মানুষ পায় আনন্দ। জন্মের পর হতেই মানুষ চায় নিজেকে বিস্তার করতে, বিকাশ করতে। এই বিকাশের উদ্দেশ্যে যা-কিছু করা প্রয়োজন সে কাজেই সে লাভ করে অন্তরের প্রেরণা। মানুষের সবচেয়ে বড় দাবিই হল—'আমি বড় হব'। সবাই আমার মূল্য স্বীকার করুক, সবাই মিলে আমার মহিমা কীর্তন করুক, আমি যে কত বড় তা আমি উপলব্ধি করতে চাই। অতএব, শিশুর ভিতরের সত্যিকারের 'আমি'টাকে তৃপ্ত করতে হলে—সবার আগে তাকে দিতে হবে তার প্রাপ্য মর্যাদা। এমন ব্যবহার তার সাথে করা সঙ্গত নয় যাতে তার আত্মমর্যাদা কোন প্রকারে ক্ষুণ্ন হয়। অক্ষমতার জন্য ধিক্কার দিয়ে নয়, ভরসা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, প্রশংসা করে তার 'আমি'টার তৃপ্তি বিধান করতে হবে। এভাবে শিশুর 'আমি'টার যোগ্য মর্যাদা দিলেই শিশুকে সে করে তুলবে গতিশীল। গতিটি একবার শুরু হলে, উত্তরোত্তর তা বেড়েই চলবে যতদিন না তার অভীষ্ট লাভ হয়। শিশুর এ স্বাভাবিক গতিটি কোন কালে রুদ্ধ হলে, ভিতরে ভিতরে সে গুমরে মরবে। ফলে ইন্দ্রিয়সমূহ সংযম হারিয়ে যে যার খুশিমত চলতে চাইবে। অতৃপ্ত 'আমি'টা তখন নানাভাবে তার তৃপ্তি খুঁজে বেড়াবে। অবরুদ্ধ বাষ্প যেমন ইঞ্জিনটিকে গতিশীল করতে না পারলে বাষ্পাধারটিকে ভেঙ্গে এলোমেলো ভাবে বেরিয়ে আসতে চায়, শিশুর সত্যিকারের চাহিদাটির তৃপ্তি না হলে শিশুর কর্মশক্তিও অবাঞ্ছিত পথ ধরে এমনি এলোমেলো চলতে শুরু করে দেয়। অতএব, শিশুর কর্মের গতি সৃষ্টি করতে হলে সর্বাগ্রে তার আমিত্বকে স্বীকৃতি দিতে হবে। আমিত্বের তৃপ্তিবিধান করলেই কর্মে গতি-উৎপাদনক্ষম শক্তি সৃষ্টি করা হল।

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার দিকে একবার প্রেরণা দিয়ে দিতে পারলেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আগ্রহ সৃষ্টি করে তা পূরণের ব্যবস্থাও ত তাঁদেরই করতে হবে। কারণ, চাহিদা অপূরণ থাকা পর্যন্ত তৃপ্তি আসতে পারে না। অতৃপ্তি কর্মের গতি শ্লথ করে দেয়। আর একটি কথাও স্মরণ রাখা দরকার—ছেলেমেয়েদের জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগাতে হলে যেমন বাইরে উত্তেজনা সৃষ্টির একটি উৎস থাকা দরকার, সঙ্গে সঙ্গে বিচার করে দেখাও দরকার এ চাহিদার বীজ তার ভেতরেও রয়েছে

কি না। নচেৎ বহুশ্রমে আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হলেও তার ফল অনেক কাল স্থায়ী হয় না। সিনেমা দেখে এসে ছেলের খুব ইচ্ছা হল—যদি সুযোগ মিলত তা'হলে সেও একদিন সিনেমার নায়কের মত বীরত্ব দেখিয়ে সকলের কাছ থেকে আদায় করত উচ্চ প্রশংসা। জীবনে যেদিন সে সুযোগ উপস্থিত হল, সেদিন তার কর্মের গতিবেগ দেখে সবাই অবাক। বীরত্ব দেখিয়ে লোকের কাছ থেকে সুখ্যাতি আদায় করার প্রবৃত্তি তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। বাইরের উদ্দীপনায় আজ রুদ্ধদ্বার খুলে গেছে, তাই অল্প শ্রমেই এস্থলে কর্মে প্রেরণা সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়েছে। আর, পূর্ব হতেই যদি এ ধরনের কাজকে সে অপছন্দ করে থাকে, তা'হলে এ বীরত্বব্যঞ্জক কাজে তার উৎসাহ বা আগ্রহ জাগান সহজসাধ্য নয়। প্রেরণা যোগাবার একটি সহজ কৌশল হল—প্রয়োজনীয়তাবোধ সৃষ্টি। কেন আমি পড়াশুনা করব? পড়াশুনা করে কি লাভ হবে? এতে আমার কোন্ প্রয়োজন মিটবে? শিক্ষার্থী মাত্রই মনে মনে এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে চায়। এ প্রয়োজনটি যদি তার সত্যিকারের প্রয়োজনের সাথে মিলে যায়, তা'হলে তৎক্ষণাৎ সে ঐ কাজ অর্থাৎ পড়াশুনা করতে আগ্রহান্বিত হবে।

ছোট শিশু, প্রয়োজন অপ্রয়োজন, এ বোধ তার হয় নি। তাকে লেখা-পড়ায় কিভাবে উৎসাহিত করা যায় এ নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। অপরিণত শিশু, ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, এসব ধারণা বা বিচারের যোগ্যতা যার জন্মে নি তাকে বুঝিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে লেখাপড়ায় লাগান সহজসাধ্য নয়। এদের বেলায় প্রেরণা যোগাবার কৌশলটি একটু স্বতন্ত্র রকমের। প্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ কোন্ পথ ধরে চল্‌ছে। তার স্বাভাবিক কর্মের গতিপথ রুদ্ধ না করে সেই পথেই ঢেলে দিতে হবে নানা অভিজ্ঞতা। তাকে শেখাবার চেষ্টা না করে তাকে শিখতে দিতে হবে। শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও ঔৎসুক্যকে কেন্দ্র করেই রচিত হবে তার শিক্ষার ধারা। কাজেই শিশুশিক্ষা পুস্তক-কেন্দ্রিক হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। যে কাজ করে শিশু আনন্দ পায় সে কাজ থেকে জোর করে তাকে বিরত করতে গেলে তার কর্মের গতিটি সাময়িক ভাবে রুদ্ধ হয়ে যাবে। এবং সুযোগ মত আবার যে-কোন অবাঞ্ছিত পথ ধরেই সে গতিশীল হয়ে উঠবে। তখন তাকে অযথা তিরস্কার করে কোন লাভ হবে না। কিংবা তাকে সে পথ থেকে তখন ফেরানও খুব সহজসাধ্য হবে না। অতএব শিশুর

স্বাভাবিক আগ্রহ যেন কোন প্রকারে দমিত না হয় এবং তার চাহিদার বিষয়বস্তু লাভে সে যেন অল্পায়াসেই সমর্থ হয় এ ব্যবস্থাই শিশুশিক্ষার প্রথম ধাপ। শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রেরণার সূত্র ধরেই তাকে শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রেরণা রুদ্ধ হলে তার স্বাধীন কর্মোদ্যম ব্যাহত হবে সন্দেহ নেই। অবশেষে গতি ফুরিয়ে সে জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হলেও কৈফিয়ৎ কিছু থাকবে না। পুঁথি পড়ার আগ্রহ নেই, অথচ পুঁথির রাজ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখলে লাভ কিছু হবে কি? বরং সমগ্র চেষ্টা দিয়ে এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা সে করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুঁথির প্রতি তার একটা স্থায়ী বিতৃষ্ণা জন্মলাভ করবে। এভাবে জোর করে শিশুকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালিত করতে যেয়ে অনেক সময় আমরা তাকে পঙ্গু করেই ফেলি। শিশুকে শেখাবার জন্য প্রয়োজন শুধু পরিবেশ সৃষ্টি করা—যে পরিবেশে সে তার চাহিদার সবকিছু খোরাক পাবে, যে পরিবেশের সবকিছুই করতে পারে তার চিত্তকে আকর্ষণ। শিশু নিজে প্রবৃত্ত হয়ে যে কাজে অগ্রসর হয় সে কাজের মাধ্যমেই তাকে দিতে হবে শিক্ষা। ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা শিশুর জন্মে নি, তাই তার পরিবেশটি অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতেই যেন তার সমুদয় আচরণ মার্জিত হয় এবং ভবিষ্যতের পাথেয় হিসাবে জীবনে গঠিত হয়ে যায় প্রয়োজনীয় নানা সুঅভ্যাস। বই পড়বার জন্য শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করার কাজে বৃথা কালক্ষেপ না করে, কি উপায়ে শিশু তার আপন গতিতে, আপন ছন্দে চলে প্রয়োজনীয় সবকিছু আয়ত্ত করে নিতে পারে তার ব্যবস্থা করাই শিশুকে শেখাবার সহজ কৌশল। অতএব, শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রেরণার মোড় ফিরিয়ে কাজে লাগাবার চেষ্টা করাই শিশুকে শিক্ষা দেবার একমাত্র পথ।

পরিণত সুস্থ মানুষ, জীবনের মূল্যবোধ যাদের জাগ্রত হয়েছে, অনুভূতির রাজ্যে নাড়া দিয়ে যাদের উন্মাদনা জাগিয়ে তোলা যায়, তাদের শেখাবার জন্য অন্য পথ ধরতে হবে। লেখাপড়ায় তাদের প্রেরণা দিতে হলে সবার আগে পাঠের প্রয়োজনীয়তাটি তাদের বুঝিয়ে দিতে হয়। প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হলে ভিতরের প্রেরণায়ই সে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এ উদ্দেশ্যে এ-স্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠের ব্যবহারিক দিক্‌টির প্রতি বিশেষ ভাবে ইঙ্গিত করতে হয়। পুঁথি হতে আহৃত বিদ্যা কিভাবে জীবনের দৈনন্দিন

কাজে সাহায্য করে তার সন্ধান তাদের দেওয়া প্রয়োজন। তা'ছাড়া লেখাপড়া শেখার সাধারণ প্রয়োজনটি স্পষ্ট করে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। "জ্ঞান যার মান তার", "লেখাপড়া করলে গাড়ি-ঘোড়া চড়া যায়"—এ ধরনের ভুল মূল্য অঙ্কন করা কখনো সঙ্গত হবে না। কারণ আজকাল সমাজের দিকে একটু নজর করলেই তারা দেখতে পায়—মানের হিসাব এখন টাকায় মাপা হয় এবং বিদ্যালয়ের গণ্ডি যারা অতিক্রম করেনি গাড়ি-ঘোড়া চড়বার লোকের সংখ্যা তাদের মধ্যেই বেশী। 'মানুষ'-পদবাচ্য হতে গেলে যে-সব গুণ থাকা দরকার সে-সব গুণাবলী পড়ালেখার ভিতর দিয়েই সহজে আয়ত্ত করা যায়। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি লেখাপড়া শিখেই হস্তগত করা যায়। সারা জীবন ধরেই চলে মানুষের শিক্ষা। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ ছেড়ে গেলেই জ্ঞান-আহরণ শেষ হয়ে যায় না এ উপলব্ধি তাদের দিতে হবে। লেখাপড়া না জেনেও শিক্ষিত হওয়া যায়, কিন্তু সে বড় কঠিন পথ। সে পথ মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের জন্য। বর্তমান যুগটি পুঁথির যুগ; এ-যুগে পুঁথির মারফত জ্ঞান অর্জন করাই সহজ পন্থা। এভাবে লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা-বোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে; এবং তা'হলেই এ বিষয়ে বাড়বে তাদের আগ্রহ এবং অন্তরের প্রেরণায়ই তখন তারা কর্মে প্রবৃত্ত হবে।

লেখাপড়া শেখার আগ্রহ জন্মাতে হলে, ব্যক্তিত্বের সোনার কাঠির স্পর্শে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সর্বাগ্রে জাগাতে হবে। সর্বদা তাকে উৎসাহ-বাণী শুনিয়ে তার কাজের প্রশংসা করে, সে যে সামান্য নয় একথা তাকে বার বার শুনিয়ে, ইচ্ছা করলে সে অনেক-কিছুই করতে পারে সে শক্তি তার ভিতরই রয়েছে একথা তাকে বুঝিয়ে তাকে সরস করে তুলতে হবে। তার অনন্ত সম্ভাবনার ভাণ্ডার তার কাছে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এমনি করে তার আত্মশক্তিতে নির্ভরতা জাগিয়ে তুলতে হবে। **আত্মোপলব্ধি হলেই কর্মপ্রেরণা ভিতর হতেই আসবে।** তখনই সে বুঝতে পারবে তার করণীয় কি। যখন শিক্ষার্থী হৃদয়ঙ্গম করবে যে, তার শক্তি অনন্ত এবং তার সম্ভাবনাও অনন্ত তখন আপনা হতেই সে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এভাবে শিক্ষার্থীদের কর্মে একবার গতি দিয়ে দিতে পরলেই সে গতিই তাদের সারা জীবন ধরে চালিয়ে নিয়ে যাবে তাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যস্থলে। কোন্‌টা প্রয়োজন, কোন্‌টা অপ্রয়োজন, সে-

সব নির্দেশ দেবার তখন আর দরকার হবে না। আপন তাগিদেই তারা কর্ম করে যাবে এবং আহরণ করে নেবে প্রয়োজনীয় সবকিছু। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাজ তখন শুধু পরিবেশ পরিমার্জন। তাদের নাগালের ভিতর তখন রেখে দিতে হবে গ্রহণযোগ্য সবকিছু। শেখাবার জন্য পদ্ধতি নিয়ে তখন আর গবেষণার প্রয়োজন হবে না। কর্মপ্রেরণায় (Motivation) উদ্দীপন ভিন্ন ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে কিছু আদায় করতে গেলে সেটা শুধু পণ্ডশ্রমেই পর্যবসিত হবে। অতএব **শেখাবার আসল কৌশল হল কর্মপ্রেরণায় উদ্দীপনা দান।**

যা লাভ করতে আমার আগ্রহ বেশী তা পেলেই হই আমি তৃপ্ত। সফলতার আনন্দ মনের বল বাড়িয়ে দেয় এবং কর্মের বেগ তাতে উদ্দীপ্ত হয়। চেষ্টা করে কর্মে সফলতা না এলে, সাধ পূর্ণ না হলে, আসে বিরক্তি। অক্ষমতাজনিত লজ্জায় আসে বেদনা আর হতাশা এসে ফেলে ঘিরে। থমকে যেতে হয় চলার পথে। নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস হারিয়ে পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে গিয়ে অন্য পথ ধরে চলতে প্রবল ইচ্ছা জাগে। এজন্যই ত, যে-সব ছেলেমেয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে অকৃতকার্যতা বরণ করতে বাধ্য হয় তাদের নিয়েই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভাবনা বেশী। আত্মশক্তিতে ক্রমে যেন তারা বিশ্বাস হারিয়ে না ফেলে সেজন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন পূর্বাহ্ণেই প্রয়োজন। এমন কোন কাজ ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে চাপান উচিত নয় যা তাদের সামর্থ্যের বাইরে। শিশুর মানসিক পরিণতিটি লক্ষ্য করেই তার ঘাড়ে বোঝা চাপাতে হবে। এমন কাজের ভার তাকে দিতে হবে যা সে অনায়াসে সুসম্পন্ন করতে পারে। তা'হলেই সাফল্যের আনন্দে দিন দিন তার উৎসাহ বেড়ে চলবে। আত্মশক্তিতে তার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবে। মোট কথা, কিছু শেখাতে হলে আগে শিক্ষার্থীর সে বিষয়ে অনুরাগ জন্মাবার চেষ্টা করতে হবে। শিশুর জন্মগত কতকগুলো আগ্রহকে সংযত করার চেষ্টা করতে হবে। তাকে দিয়ে এমন ভাবে কর্ম করাতে হবে যাতে সফলতার বিজয় গর্বে তার বুকখানা ফুলে ওঠে। সর্বোপরি তাকে তার আত্মোপলব্ধি করার সুযোগ দিতে চেষ্টা করতে হবে। এভাবে একবার শিশুর কর্মপ্রেরণা জাগিয়ে তুলতে পারলেই হল। তারপর সে চলবে তার নিজের গতিতেই।

॥ পনরো ॥

শেখার রহস্য (Secret of Learning)

শেখা মানেই যা জানা ছিল না তা জানা। অর্থাৎ নূতন কিছু আয়ত্ত করা। শিশু লিখতে পড়তে জানত না এখন লিখতে পড়তে পারে, নূতন একটি অঙ্ক কষতে দিলে অনায়াসে এখন তা কষে ফেলতে পারে। বুঝা গেল, শিশু কিছু শিখেছে। এ শেখার কাজটি দু'ভাবেই চলে—এক, আপন গরজে বাঁচার তাগিদে ঠেকে ঠেকে নিজে নিজে শেখা, আর অপরটি, অবস্থার চাপে ফেলে শিশুকে শিখতে বাধ্য করা। এ উভয় ব্যবস্থায়ই শিশুর নিজস্ব কিছু মূলধন একান্ত আবশ্যক। স্থূলভাবে দেখতে গেলে শেখার জন্য আশু প্রয়োজন শিক্ষার্থীর উপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য। বিকলাঙ্গ শিশুকে যেমন পেশী পরিচালনার দরকার এমন কোন কাজ শেখান সম্ভবপর নয়, মানসিক শক্তি পরিপক্ক হয় নি এ-স্তরের শিশুকেও যাতে চিন্তার দরকার এমন কোন কাজ শেখান যায় না। অতএব, শেখার ব্যাপারটিও সম্বন্ধহীন নিরপেক্ষ নয়। যে মূলধনটুকু সম্বল করে শিশু ধরায় আসে, তাকে খাটিয়েই সে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ক্রমে বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করে। অতএব, শিশুকে শিখতে হলে আগে তার নিজের ট্যাঁকের কড়ি খরচা করতে হবে। নিজের যা পুঁজি আছে তার সাথে বোঝাপড়া করেই না সে নবাগতের জন্য দ্বার খুলে দেবে। নূতন এসে ক্রমে পুরাতনের সাথে মিলে মিশে এক হয়ে চলতে অভ্যস্ত হবে। সোজা কথায় বলা যেতে পারে—শেখার অর্থ অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে—একাজে শিশুকে প্রেরণা যোগাচ্ছে কে? কিসের প্রেরণায় জীবমাত্রই তার নিজের পুঁজিটুকু উজাড় করে দিয়ে নূতনকে আমন্ত্রণ জানায়?

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়—জীবমাত্রই নিজেকে বিকাশ করতে চায়। এ বিকাশেই তার আনন্দ এবং এ আনন্দের অন্বেষণেই জীব কাজ করে চলেছে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত। সংক্ষেপে বলা চলে—এই আনন্দ লাভের প্রেরণাই জীবকে প্রবৃত্ত করছে তার মূলধনটুকু কারবারে নিয়োজিত করতে।

তাইত দেখতে পাওয়া যায় শেখার কোন ব্যবস্থা না থাকলেও সবাই কিছু-না-কিছু শিখে নেয় আপন প্রয়োজনের তাগিদে। এবং এই প্রয়োজন-বোধ-সৃষ্টিই শিক্ষকের সর্বপ্রথম কাজ।

মানুষের মনটি এমন একটি জিনিস যাকে সহজে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না। অথচ এ মনটিকে নিয়েই মনোবৈজ্ঞানিকদের কত গবেষণা! শেষ পর্যন্ত কোন হদিস না পেয়ে, ব্যবহারবাদী পণ্ডিতগণ (Behaviourist) মনকে বাদ দিয়েই লেগে গেলেন মানুষের জীবন-টাকে ব্যাখ্যা করতে। তাঁদের মতে, শেখা ব্যাপারটি একটি অন্ধ যান্ত্রিক ক্রিয়া মাত্র। শেখা কাজটির মধ্যে মননশীলতা স্বীকারের যৌক্তিকতা তাঁরা খুঁজে পান না। শেখা ব্যাপারটি আসলে তা'হলে কি? শেখা হয়ে গেলে শিশুর কোথায় কি পরিবর্তন হল এ নিয়ে আজও গবেষণার অন্ত নেই। শেখাটা তা'হলে কি শুধু যান্ত্রিক ক্রিয়া, না তার পেছনে জীবের নিজস্ব কিছু অবদানও আছে? এ প্রশ্নের সদুত্তর আজও আমরা পাই নি। কিন্তু, কিভাবে অগ্রসর হলে শিশুর শেখার কাজটিকে ত্বরান্বিত করা যায়, সহজে তাকে শেখান যায় তার কিছু কিছু হদিস আমরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি বৈজ্ঞানিকদের কৃপায়। থর্ণডাইক (Thorndike), প্যাভ্‌লভ (Pavlov), কোহ্‌লার (Kohler), কফ্‌কা (Koffka) এঁরা ইতর প্রাণীদের উপর নানা পরীক্ষা চালিয়ে শেখা সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি সূত্রও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয়—ঐ সকল সূত্র অবলম্বনে অগ্রসর হয়ে মানবশিশুর শেখার ব্যাপারেও অনেক সুফল পাওয়া গেছে। আসলে, কোনকিছু শেখা হয়ে গেলে মানবশিশুর ব্যবহারের যে একটা স্থায়ী পরিবর্তন সূচিত হয় এতে কোন সন্দেহ নেই। এ-কারণ, যে-সব উত্তেজনা মানবের ব্যবহারকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম সে-সব উত্তেজনা যুগিয়েই মানবশিশুকে শেখান যায়। কিন্তু, শিশু শিখতে না চাইলেও তাকে শেখান সম্ভব কিনা এ প্রশ্নের সমাধান আমরা পেয়েছি কি?

আঘাতে সাড়া দেওয়া জীবের একটি ধর্ম। কিন্তু, কিরূপ উত্তেজনায় কোন্ প্রাণী কখন কিভাবে সাড়া দেবে তা নির্দিষ্ট করে আগে থেকেই কিছু বলা সকল সময় সম্ভব হয় না। একই ধরনের উত্তেজনায় সকল মানুষের কাছ থেকেই সমান প্রতিক্রিয়া আশা করা যায় না। তা'ছাড়া,

একই উত্তেজনায়ও একই মানুষের কাছ থেকে সকল সময় একই প্রতিক্রিয়া আশা করা যায় না। যে উদ্দীপনায় (Stimulus) যে সাড়া (Response) পেলে কিছু শেখা হয়েছে বলে আমরা মনে করি সেই উদ্দীপনা ও সাড়ার মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করার বা গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থাকেই শেখাবার রহস্য বলা যেতে পারে। এ ধরনের যোগসূত্র একবার স্থাপিত হয়ে গেলে তখন উত্তেজনার সাথে সাথেই অনুরূপ সাড়া বিনা আয়াসেই পাওয়া যায়। যেমন, প্রশ্ন করার সাথে সাথেই একটু চিন্তা না করেই ছেলে জবাবটি দিয়ে ফেলে—এর ভিতর মননশীলতার স্থান কোথায়? এ ধরনের কাজগুলোকে অভ্যাসগঠন বলতেই বা আপত্তি কি? **ঠেকে ঠেকে ভুল সংশোধন করে শেখার কাজটিও** (Trial and error method) অনেকটা এ পর্যায়ের। বার বার ভুল উত্তর করে শিশু যখন শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে কোন উৎসাহ পায় না, তখন থেকেই উদ্দীপনা ও সঠিক সাড়ার মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হতে শুরু করে। উত্তেজনা ও সঠিক সাড়ার মধ্যে বাঁধুনিটি শক্ত করতে হলে পুনঃ পুনঃ চর্চা বা অনুশীলনই প্রকৃষ্ট পন্থা। ব্যবহারবাদী **ওয়াটসন** (Watson) তাই বললেন—বার বার একটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তিই সে বিষয়টি শেখার পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

থর্ণডাইকের (Thorndike) সূত্র

থর্ণডাইক জীবজন্তুর উপর নানা পরীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ করলেন যে, প্রতিক্রিয়ার ফলটি সুখকর না হলে বার বার একটি কাজ কেউ করতে চায় না। যে কাজের ফলটি বেদনাদায়ক সে কাজ হতে দূরে থাকতেই সবাই চায়। অতএব কাজের ফলটি সুখকর না হলে সে কাজটি শিক্ষার্থীকে শেখান অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। ইতর প্রাণীর পক্ষে যা সুখকর মানবশিশুর পক্ষে তা সুখকর নাও হতে পারে। উৎসাহ দিয়ে বা প্রশংসা করে ইতর প্রাণীকে সুখী করা যায় না, কিন্তু প্রশংসায় খুশী হয় না এমন মানুষ পৃথিবীতে কমই দেখা যায়। অতএব, থর্ণডাইকের **ফল লাভের সূত্রটি** (The law of effect) শিক্ষার্থী মানবশিশুর উপর প্রয়োগ করতে হলে—

শিশুর কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করাই সর্বাগ্রে কর্তব্য। শিশু যখন বুঝবে, ঠিক এমনি ভাবে সাড়া দিলেই সবাই খুশী হয়, তখন সেও বার বার একইরূপ সাড়া দেবার জন্যে উৎসাহিত হবে। এবং এভাবেই ক্রমে উত্তেজনা ও সাড়ার মধ্যে একটি স্থায়ী বন্ধন রচিত হয়ে যাবে। পুনঃ পুনঃ চর্চার ফলে শিশু যখন কোন কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখনই আমরা বলি শিশু শিখেছে। কিন্তু একঘেয়ে কাজ শিশু বার বার করতে যাবে কেন? একটি অক্ষরের উপর দিয়ে বার বার হাত ঘুরাতে শিশুর ভাল লাগবে কেন? ভয় দেখিয়ে শিশুকে দিয়ে এ কাজটি করাতে গেলে ক্রমে এ কাজের উপর তার বিতৃষ্ণাই এসে যাবে। কিন্তু, শিশু মাত্রই চায়—সবাই তাকে ভালবাসুক, আদর করুক। অতএব ভালবেসে শিশুকে আগে বশে আনতে হবে। তারপর তার ইচ্ছার সাথে তাল মিলিয়ে তাকে দিয়ে বার বার অক্ষরের উপর হাত ঘুরিয়ে নিতে হবে। এভাবে যখন সে নিজে নিজেই অক্ষরটি লিখতে পারবে, তখন **সফলতার আনন্দই** তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এমনি ভাবে দেখা যায়, ইতর প্রাণীর শিক্ষা অর্জনের বিধিসমূহ মানবশিশুর বেলায় প্রয়োজ্য হলেও কাজের ফলটি সুখকর করার কায়দা সকল ক্ষেত্রে সমান হয় না। প্রহারের ভয় দেখিয়ে ইতর প্রাণীকে একটি কাজ বার বার করতে বাধ্য করা যায়। এবং এভাবে কিছু কিছু তাকে শেখানও যায়। কিন্তু প্রহারের ভয়রূপ উত্তেজনা ভিন্ন সে প্রাণীটি কখনো অনুরূপ সাড়া দেবার প্রয়োজন বোধ করবে না। কিন্তু মানবশিশুকে কিছু শেখান হলে অনুরূপ উত্তেজনা ছাড়াও তার খেয়াল মত স্বেচ্ছায় অনেক সময়ই ঐ কাজের পুনরাবৃত্তি করে সে তার শক্তির পরখ করতে উৎসাহ বোধ করে। জোর করে শিশুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কোন কাজ বার বার করতে বাধ্য করা হলে, কাজের পরিচালকের সাথে সাথে কাজটির প্রতিও তার বিতৃষ্ণা বা বিরক্তি আসা স্বাভাবিক। এভাবে কাজের স্মৃতিই যদি দুঃখ বহন করে আনে, তা'হলে কাজের পুনরাবৃত্তি তার কাছ থেকে আশা করা যায় না। অতএব শিশুকে জোর করে কিছু শেখান হলেও সে শিক্ষা তার স্থায়ী হতে পারে না। এভাবে একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখব—থর্ণডাইকের **চর্চা বা পৌনঃপুনিকতার বিধি** (The law of exercise) সম্পূর্ণ আপেক্ষিক (Relative)। সুখদায়ক ফল লাভের সূত্রটিই রয়েছে পুনঃ

পুনঃ ক্রিয়া বিধিটির মূলে। পরিণামে সুখ হবে এ আশায়ই শিক্ষার্থী বার বার একটি কাজ করতে উৎসাহ বোধ করে।

বাবুল সমস্ত গুছিয়ে নিয়েছে, এইবার সে খেলতে যাবে। হঠাৎ রাঙ্গাকাকার নজরে পড়ে গিয়ে তার রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। কারণ, তার রাঙ্গাকাকার বিশ্বাস—খেললেই ছেলেরা পড়াশুনায় খারাপ হয়ে যাবে। এজন্য ছেলেপিলেরা তাঁকে এড়িয়ে চলতে চায়। চোখে পড়লেই ধম্‌কে তিনি তাদের বই নিয়ে বসতে বাধ্য করবেন। বাবুলের সমস্ত মনঃপ্রাণ প্রস্তুত হয়েছিল খেলার জন্যে। এখন কাকার ভয়ে সে বই নিয়ে বসল। অনেকক্ষণ ধরে ইতিহাসের একটি অংশ সে বারে বারে কাকার কর্ণেন্দ্রিয়ে পৌঁছাবার জন্য উচ্চরবে পাঠ করল। পরের দিন তাকে ইতিহাসের ঐ অংশটুকু জিজ্ঞেস করে দেখা গেল তার এক বর্ণও তার মনে নেই। বুঝা গেল, শেখার সাথে মনের প্রস্তুতিরও সম্বন্ধ রয়েছে। শেখার জন্য শিক্ষার্থীর মনটি প্রস্তুত না থাকলে ভয়ে ভয়ে একটি কাজ বার বার করে গেলেও তার কিছুই শেখা হয় না। যন্ত্রবৎ কিছুকাল তোতাপাখীর মত অনুরূপ ভাবে সাড়া দিতে সক্ষম হলেও শিক্ষার্থীর মনে কোনরূপ গভীর রেখাপাত হতে পারে না। থর্ণডাইকের **মনের প্রস্তুতি বিধিটি** (The law of readiness) শেখার পক্ষে সবচেয়ে মূল্যবান। কাজটি করার জন্য মনের প্রস্তুতি না থাকলে কাজের অন্তে শিশু আনন্দিত না হয়ে বরং বিরক্তই হবে বেশী। শিশুর চাল-চল্‌তি যাঁরা লক্ষ্য করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন—শিশু নিজে থেকে যে কাজ করতে অগ্রসর হয় তাতে বাধা দিলে শিশু অত্যন্ত চটে যায়। এমন কি, সে কাজে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে গেলেও সে তা মোটেই পছন্দ করে না। আর, শিশুর কাজে বাধা না দিয়ে যদি তাকে প্রশংসা করা যায়, তা'হলে দ্বিগুণ উৎসাহে সে কাজটি করতে অগ্রসর হয়। এবং আপন চেষ্টায় কাজে সফলতা লাভ করলে তার আনন্দ আর ধরে না। তা'হলে দেখা যাচ্ছে, প্রথমেই চাই মনের প্রস্তুতি। **প্রীতিপ্রদ ফললাভ, পুনঃ পুনঃ চর্চা,** এবং **মনের প্রস্তুতি** —থর্ণডাইকের শেখার এই তিনটি বিধি পরস্পর সম্পূর্ণ সম্বন্ধযুক্ত। ইচ্ছা যখন জাগে তখন কাজটি করে আনন্দও হয় এবং পুনঃ পুনঃ চর্চায়ও কোন বিরক্তি আসে না। উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি যদিও

ফললাভের উপর নির্ভরশীল, তথাপি মনের বিমুখতা দিতে পারে সমস্ত-কিছু ওলটপালট করে, সমস্ত প্রচেষ্টাকে পণ্ড করে।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক মহাশয় যখন কোন প্রশ্ন করেন, তখন যে-সব ছেলের উত্তরটি জানা আছে তারা বলবার জন্য অধীর হয়ে পড়ে এবং তাদের কাউকে বলবার সুযোগ দিলে তারা উৎসাহিত হয় এবং অতি-মাত্রায় খুশী হয়। আর যারা উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত নয় তাদের বলতে বললে, এবং বার বার তাড়না করলে তাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। অতএব মনের প্রস্তুতি ছাড়া শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মনের আদান-প্রদান সম্পূর্ণ নিরর্থক। শেখাতে হলে, আগে শিক্ষার্থীর মনটিকে গ্রহণ-উপযোগী করে তুলতে হবে। উত্তেজনা বা অবস্থার সাথে প্রার্থিত প্রতিক্রিয়ার বাঁধনটি শক্ত করার কাজটিকেই শেখান বলা হয়। কাজেই, অনেকে একে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলেই অভিহিত করেছেন। তথাপি মানুষের মনটিকে বাদ দিয়ে শেখাবার কাজে অগ্রসর হলে ঠকুতে হবে বলেই মনে হয়। থর্ণডাইকের শেখার সূত্র তিনটি মূলতঃ একটি তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই রচিত। মনের প্রস্তুতাবস্থার সূত্রটিকে বাদ দিয়ে ফললাভের সূত্র এবং চর্চার সূত্রটির ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীর মনটি যদি শেখার জন্য প্রস্তুত না থাকে, তা'হলে শেখাবার সমস্ত রকম প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে সন্দেহ নেই।

তা'ছাড়া একই উত্তেজনায় বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে শিক্ষার্থী কোন্‌টি বাছাই করে নেবে সেটা সম্পূর্ণই নির্ভর করছে সুখকর ফল লাভের উপর এবং সেটাও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপরই নির্ভরশীল। প্রতিক্রিয়াটি সুখকর হলে, চর্চার জন্য শিশুকে আর নূতন করে নির্দেশ দিতে হয় না। যদিও কিছুকাল চর্চার পর অনুরূপ উত্তেজনায় প্রার্থিত সাড়া দেবার জন্য অনেক সময়ই আর মননশীলতার প্রয়োজন হয় না, তথাপি একে নিছক অন্ধ যান্ত্রিক ক্রিয়া বলা যায় না। শিক্ষার্থী শিশুর দেহমনের অবস্থা যদি অনুকূল না থাকে, অর্থাৎ উক্তরূপ সাড়া দেবার জন্য মনটি যদি সায় না দেয়, তা'হলে প্রতিক্রিয়ার ফলটি কখনই সুখকর হতে পারে না এবং চর্চার স্পৃহাও তখন ফুরিয়ে যায়। ফলে, কার্যকালে প্রার্থিত প্রতিক্রিয়াও আমরা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আশা করতে পারি না।

প্যাভ্‌লভের (Pavlov) সূত্র

খাদ্যদ্রব্যের দর্শনেই কুকুরের জিভে জল আসে। একটি কুকুরকে ক'দিন ধরে একটি ঘণ্টা বাজিয়ে তারপর খাবার দেওয়া হতে লাগল। কিছুদিন পর লক্ষ্য করে দেখা গেল ঘণ্টার শব্দ শুনেই কুকুরের জিভে জল আসছে। এমনি করে ঘণ্টারূপ একটি কৃত্রিম উত্তেজক সৃষ্টি করেই প্যাভ্‌লভ কুকুরটির কাছ থেকে তাঁর প্রার্থিত প্রতিক্রিয়াটি আদায় করতে সক্ষম হলেন। এস্থলে, খাদ্যের সাথে ঘণ্টার কোন সাদৃশ্য নেই, তথাপি খাদ্যের পরিবর্তে ঘণ্টার সাহায্যেই অনুরূপ প্রতিক্রিয়ায় কুকুরকে অভ্যস্ত করান সম্ভবপর হল। তাই, মানবশিশুকে শেখাবার ব্যাপারেও এই **নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ার** (Conditioned Response) সূত্রটিকে বিশেষ কার্যকরী বলে তিনি মত প্রকাশ করলেন।

এর পর কিছুদিন ঘণ্টা বাজান হতে লাগল, কিন্তু কুকুরকে কোন খাদ্য দেওয়া হল না। ধীরে ধীরে কুকুরের জিভে জল আসাও যেন বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। বুঝা গেল—থর্ণডাইকের প্রতিক্রিয়ার অন্তে **সুখকর অবস্থার সূত্রটি এস্থলেও কার্যকরী**। কুকুরকে খাদ্য না দেওয়াতে সে বুঝল ঘণ্টা বাজালে হবে কি? খাদ্য নিশ্চয়ই আসবে না। এভাবে প্রতিক্রিয়ার অন্তে সুখকর অবস্থার অভাবে ঘণ্টা ও কুকুরের জিভে জল আসা অর্থাৎ উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়ার বাঁধন যেন ক্রমে শিথিল হতে আরম্ভ করল। অতএব, নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ার সূত্রটি তখনই শুধু কার্যকরী হতে পারে যখন ফললাভের সূত্রটি বর্তমান থাকে।

এছাড়াও একটানা কিছুদিন ধরে ঘণ্টা, খাদ্য ও জিভে জল আসা, এ তিনটি কাজ চালিয়ে না গেলে ঘণ্টা ও জিভে জল আসা প্রতিক্রিয়াটির যোগসূত্রও সহজে স্থাপিত হতে চায় না। অতএব, থর্ণডাইকের চর্চা বিধিটিও এস্থলে উপেক্ষণীয় নয়।

প্যাভ্‌লভ এভাবে প্রমাণ করলেন যে, বিধিপূর্বক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা যে-কোন উত্তেজনার সাহায্যেই বাঞ্ছিত সাড়া জাগিয়ে তোলা অসম্ভব নয়। তাঁর মতে, শেখান ব্যাপারটিই হচ্ছে—বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ায় অভ্যস্ত করা এবং অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াটি রুদ্ধ করা। অতএব, উত্তেজনা ও সাড়ার

মধ্যে এ-ধরনের সম্পর্কের পরিবর্তন করাকেই শেখান বলা যেতে পারে। শেখান একটি নিছক যান্ত্রিক ব্যাপার। মননশীলতাকে আমল না দিয়েই শুধু যান্ত্রিক উপায়েই শেখান কাজটি সম্পন্ন হতে পারে এই তাঁর অভিমত। কিন্তু, প্যাভ্‌লভের মননশীলতা ছাড়া শেখানর এই সূত্রটি একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে, দেখা যাবে—এস্থলেও সেই ভাল-লাগা মন্দ-লাগার প্রশ্নটিকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। অতএব, দেহ ও মনের অবস্থাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, তার ব্যক্তিত্বকে আমল না দিয়ে, মানব-শিশুকে শেখাবার চেষ্টা না করাই শ্রেয়ঃ।

সমগ্রতাবাদ

জেস্টল্ট (Gestalt) মনোবিজ্ঞানীগণ শেখার ব্যাপারে মননশীলতাকে উপেক্ষা করতে রাজী নন। **কোহ্‌লার** (Kohler) স্পষ্ট করেই বললেন—শেখার ব্যাপারে বুদ্ধিসংযুক্ত বিশ্লেষণপ্রজাত **অন্তর্দৃষ্টিই** (Insight) প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তাঁর শিম্পাঞ্জী নিয়ে পরীক্ষাই এ উক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

একটি শিম্পাঞ্জীকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হল। ঘরের মধ্যে তার নাগালের বাইরে এককাঁদি কলাও রেখে দেওয়া হল। একখানি ছোট ও একখানি বড় লাঠি তাকে সরবরাহ করা হল। দু'খানি লাঠি জোড়া না দিয়ে নিলে কলার কাঁদি থেকে কলা টেনে আনা সম্ভব নয়। একবার ছোট লাঠি দিয়ে একবার বড় লাঠি দিয়ে, এমনি করে নানাভাবে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শিম্পাঞ্জীটি যেন বসে বসে একটু ভেবে নিল। তারপর একটু বাদেই উঠে গিয়ে লাঠি দুইটি জোড়া দিয়ে সে অনায়াসে তার কাজ হাসিল করে নিল। শিম্পাঞ্জীর এবংবিধ কাজটিকে নিছক অন্ধ যান্ত্রিক ক্রিয়া বলা চলে কি? কেমন করে হঠাৎ শিম্পাঞ্জীর মাথায় এ ফন্দিটুকু খেলে গেল সেটাই আমাদের গবেষণার বিষয়। শিম্পাঞ্জীটি প্রথমে কিছুক্ষণ নানাভাবে চেষ্টা করে যখন কৃতকার্য হতে পারল না, তখন চুপ করে বসে বসে মনে মনে তার ভুলগুলি বিশ্লেষণ করতে শুরু করল। তারপরই শুরু হল মনে মনে বাছুনির কাজ। হঠাৎ সঠিক প্রতিক্রিয়াটি তার মনোমুকুরে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক্ষেত্রে

ভুল শুধরে শেখার (Trial and error) কাজটি সংঘটিত হয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে অর্থাৎ মনে মনে। যেইমাত্র সঠিক প্রতিক্রিয়াটির সন্ধান সে পেল অমনি উঠে গিয়ে সে তার কাজ হাসিল করে নিল। অতএব, কোহ্‌লারের অন্তর্দৃষ্টি (Insight) বা অগ্রদৃষ্টি (Foresight)-ও ঠেকে শেখার সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা চলতে পারে। তা'ছাড়া, থর্ণডাইকের প্রস্তুতিবাদ, ফললাভের সূত্র এবং চর্চাবাদও এস্থলে প্রয়োগ করা চলে। তবে, মনের অস্তিত্ব স্বীকার না করে এ-ধরনের ক্রিয়ার অর্থ বুঝান সম্ভবপর নয়।

সমগ্রতাবাদ তত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা বলেন—মানুষের মন কতকগুলো ক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র। এ-ধরনের ক্রিয়াসমূহ মানুষের দৈহিক এবং পারি-পার্শ্বিক বা সামাজিক প্রভাবের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হয়। যে-কোন উদ্দীপনায় ভুল বা শুদ্ধ যে-কোনরূপ সাড়া বার বার দিতে দিতে মনের ক্রিয়াসমূহে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ক্রমে আলোড়ন-জনিত ঢেউসমূহ প্রশমিত হতে থাকে। নিশ্চল বারিরাশিতেই তটের দৃশ্যাবলী স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হয়। মনের আলোড়ন থেমে গেলেই মনোমুকুরেও সবকিছুই স্পষ্টতর হতে থাকে এবং অবশেষে সমস্ত রহস্যই তাতে প্রতিবিম্বিত হয়। মনের এই প্রশান্ত অবস্থা কখন কিভাবে আসবে বলা কঠিন। অনেক সময় আকস্মিক ভাবেও মনের ক্রিয়াসমূহ স্থির হয়ে পড়ে। এবং তখনই মানুষের কাছে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে; যে-কোনরূপ উত্তেজনাই শিশুর মনটিকে নানাভাবে আন্দোলিত করে থাকে। এভাবে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা একসঙ্গে এলোমেলো ভাবে যতক্ষণ শিশুর মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে ততক্ষণ শিশুর কাছে কোন সত্য প্রতিভাত হতে পারে না। এরপর কোন একসময় এলোমেলো অভিজ্ঞতাগুলো শিশুর মনে একটি স্পষ্ট চিত্র নিয়ে দেখা দেয়। তখনই আমরা বলতে পারি শিশু এইবার কিছু জানতে পেরেছে। অজানাকে সে এইবার জেনেছে। অতএব, অভিজ্ঞতার এই **অস্পষ্ট চিত্র স্পষ্টরূপে দেখা দেওয়ার নামই শেখা।**

মননশীলতাকে বাদ দিয়ে শেখার রহস্য ভেদ করা সম্ভব নয়। তথাকথিত অন্তর্দৃষ্টির বেলায়ও দেখা যায় বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াটি গোপনে শিশুর মনের মধ্যেই রূপ পরিগ্রহ করে। থর্ণডাইকের শেখার সূত্রসমূহও

শিক্ষার্থীর ভাল-লাগা মন্দ-লাগার উপর নির্ভরশীল। সুখকর ফল লাভের সূত্রটি মনের এবং দেহের অবস্থার সাথে সম্বন্ধযুক্ত। শিশুর মানসিক অবস্থা পূর্বাহ্ণে না জেনে তাকে কিছু শেখাতে গেলে আশানুরূপ ফললাভ না হবারই সম্ভাবনা। দেহ ও মনের অবস্থাই উদ্দীপনার সার্থক প্রতিক্রিয়াটি নির্দেশ করে দেয়। প্যাভ্‌লভের কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সূত্রটিও মানসিকতা আমদানি না করে ব্যাখ্যা করা চলে না। চর্চার উপরই নির্ভর করে উদ্দীপনার এবং সাড়ার মধ্যে স্থায়ী বন্ধন রচিত হওয়ার কাজ। আর কাজ করে মনে তৃপ্তি না এলে পুনরাবৃত্তির স্পৃহা জাগে না। ঘণ্টা বাজিয়ে কুকুরকে খাবার না দিয়ে খেলার জিনিস দিলে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ায় তাকে অভ্যস্ত করান সম্ভব হত কি? অতএব, সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—শেখান ব্যাপারটি অনেকাংশেই নির্ভর করে যে শিখবে তার মানসিক অবস্থার উপর। বৈজ্ঞানিকগণ ইতর প্রাণী-সমূহের উপর পরীক্ষা করে শেখার যে-সব নীতি আবিষ্কার করেছেন সেগুলো মানবশিশুকে শেখাবার ব্যাপারেও যথেষ্ট সাহায্য করে সন্দেহ নেই; তবে স্মরণ রাখা দরকার—মানবশিশু ইতর প্রাণী বা জড় পদার্থের সামিল নয়। কাজেই অন্ধ যান্ত্রিক ক্রিয়াবলে তার জীবনটাকে সম্যক ব্যাখ্যা করা চলবে না।

শেখার মূলতত্ত্ব

অভাব-বোধই প্রধানতঃ জীবের কর্মপ্রেরণা যোগায়। কতকগুলো সাধারণ অভাব ছাড়াও মানুষে মানুষে পার্থক্যের দরুন অভাবের রকম ও মাত্রার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, যুগধর্মও মানুষের অভাবের রকম পালটে দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আজকালকার মানুষের যা না হলে চলে না, আমাদের পূর্বপুরুষদের হয়ত সে ধরনের অভাবের কোন বোধই ছিল না। অভাব-বোধ মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাবের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। তবে, সব মানুষই একটি বস্তুর কাঙ্গাল। মানুষ মাত্রই আনন্দ চায়। এই আনন্দের অভাব-বোধ সবারই আছে। অতএব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—জীব আনন্দলাভের বাসনায়ই জন্ম থেকে

মৃত্যু পর্যন্ত কর্ম করে যাচ্ছে। আখেরে আনন্দ পাওয়া যাবে এ বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে পারলেই কর্মের প্রেরণা ভিতর থেকেই আসবে।

শিশু কাঁদছে। কি সে চায়? সে কিসের অভাব বোধ করছে তা নিজে ঠিকভাবে প্রকাশ করতে না পারলেও তার প্রার্থিত সামগ্রীটি পাবা মাত্রই সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। পরক্ষণেই হয়ত সবকিছু ছুড়ে ফেলে আবার কান্না জুড়ে দেয়। আবার হয়ত একটা-কিছু পেয়েই কান্না থামিয়ে হাসতে শুরু করে দিল। এভাবে লক্ষ্য করলে দেখব ক্ষণে-ক্ষণেই যেন শিশুর অভাবের সামগ্রী বদলে যাচ্ছে। এর কারণ, তার সত্যিকারের অভাব কি তা নিজেই সে জানে না। শিশুর নিজস্ব প্রকৃতি বা স্বভাবই তার অভাবের জন্মদাতা। ইচ্ছা অনিচ্ছা, রুচি ও প্রবৃত্তি সব শিশুরই এক নয়। একই ধরনের প্রেরণা কারো কাছে হয়ত বিশেষ উদ্দীপক, আবার কারো কারো কাছে হয়ত নেহাৎ অবাঞ্ছনীয়। সমস্ত শিশুর চাহিদাগুলো যদি একটা নির্দিষ্ট ছকে ফেলা যেত তা'হলে শিশুদের শেখানর কাজটিও অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়ত। শিশুর আগ্রহ ও প্রয়োজনের খবর সংগ্রহ করে নিতে পারলে শিশুকে অল্প আয়াসেই শেখান যেত। শিশু শিখতে না চাইলে তাকে শেখান একরূপ অসাধ্য। শিশু যা চায় তা পেলেই সে হয় খুশী এবং সমস্ত মনঃপ্রাণ ঢেলে তখন সে সেটি জানতে চায় বা বুঝতে চেষ্টা করে। যখনই দেখা যাবে শিশু কোন বিষয় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করছে তখনই বুঝতে হবে ঐ বিষয়টি জানবার প্রয়োজন তার উপলব্ধ হয়েছে। জানি না—জানা দরকার একথাগুলি তার মনে জেগেছে। জানতে পারলেই সে হবে আনন্দিত, পরিতৃপ্ত হবে তার আকাঙ্ক্ষা। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অভাব-বোধই যোগাবে তার শেখার প্রেরণা। অতএব, প্রয়োজনীয় অভাব-বোধ সৃষ্টি করাই সুশিক্ষকের আসল কাজ। শেখার জন্য আগ্রহান্বিত (Motivated) না হলেও শিশুকে কিছু কিছু শেখান যায় একথা অস্বীকার-করার উপায় নেই তথাপি শেখার মূলে বাইরের প্রভাবের চাইতেও শিক্ষার্থীর ভিতরের কামনা, অভাব-বোধ, প্রয়োজনীয়তা-বোধ ইত্যাদি অধিক শক্তিশালী। কাজেই, শেখাবার পদ্ধতিসমূহ রচনা করার পূর্বে শিক্ষার্থী শিশুর প্রকৃতি, রুচি, আগ্রহ ইত্যাদির খবর আগে সংগ্রহ করা দরকার। শিক্ষকের প্রাথমিক কাজ হল ছাত্রের আগ্রহ, ইচ্ছা, চাহিদা ইত্যাদির সংবাদ পূর্বাহ্নে সংগ্রহ করা। শুধু যান্ত্রিক উপায়ে শেখান তখনই সম্ভব যখন শিক্ষার্থীর শেখার জন্য

চাহিদা জন্মে যায়। অতএব, শেখার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করাই (Motivation) শেখাবার প্রথম এবং প্রধান ধাপ।

অভাব-বোধই কর্মের প্রেরণা যোগায় বটে, কিন্তু কর্মের পদ্ধতি নিরূপণ করবে অভাবের স্বভাব। কিসের অভাব, এ খবরটি জানতে পারলেই সঠিক কর্মপথে সে আপনিই অগ্রসর হবে। কাজেই, কিসের অভাব—এ তথ্যটি সর্বাগ্রে শিক্ষাথার কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। মানুষের সত্যিকারের প্রয়োজন কিসের—তা অধিকাংশ মানুষই ঠিকভাবে ধরে উঠতে পারে না। অন্ধকারেই সে শুধু খুঁজে বেড়ায় তার আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রীটিকে। মানবের সত্যিকারের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা সর্বাগ্রে তার কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। যে শিক্ষা আমরা আমাদের বংশধরদের দিতে চাই তা তাদের জীবনে কি প্রয়োজনে আসবে সে বিষয়ে তারা অনেকেই অজ্ঞ। যা শেখাব তা দিয়ে তাদের জীবনের কোন্ কাজটি সিদ্ধ হবে সে সম্বন্ধে তাদের সজাগ করে তুলতে হবে। তাইত মনীষীরা আজকাল বলছেন—শিক্ষাকে দিতে হবে শিশুর জীবনপ্রবাহে ঢেলে। শিক্ষা তখনই হবে প্রাণবন্ত যখন সে যুক্ত হবে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের সঙ্গে। যে বিষয়বস্তুই ছাত্রকে শেখাতে হবে তা তার জীবনের কোন্ প্রয়োজনে লাগবে সে খবর তাকে পূর্বাহ্নে দেওয়া দরকার। পড়াশুনা করে পাস-টাস করে বড় বড় চাকরি করবে, বাড়ী হবে, গাড়ি হবে, অনেক টাকা-পয়সা রোজগার হবে এবং সংসারে খুব সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে ইত্যাদি বলেই ছাত্রছাত্রীদের সচরাচর পড়াশুনায় আগ্রহ জন্মাবার একটা অপচেষ্টার আজও বিরাম নেই। কিন্তু, বর্তমান যুগে চোখ খুলে আশেপাশে একটু তাকিয়ে দেখলেই তারা দেখতে পায় পাস-টাস না করেও ত বহু লোকে অনেক টাকা রোজগার করছে, সমাজে মান-মর্যাদা লাভ করছে। তা'হলে, পড়াশুনার প্রয়োজনীয়তা-বোধ আর থাকবে কি করে? ভবিষ্যৎ জীবনের রঙ্গীন চিত্র শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে পারলে তারা দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগে যাবে। পড়াশুনা করে কি হবে? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব না পেয়ে পেয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ ক্রমে কমে আসছে বলেই মনে হয়।

কচি শিশু—ক্ষুধা পেলে তার খাবার চাই, ঘুম পেলে যেখানে-সেখানে ঘুমিয়ে থাকবে। আত্মীয়-অনাত্মীয় জ্ঞান নেই—যে আদর করবে তার কাছেই যেতে কোন আপত্তি নেই। এদের আগ্রহের যেন অন্ত নেই।

আগ্রহের পরিতৃপ্তি শিশুদের অধিকাংশ কর্মের প্রেরণা যোগায়। গল্প শুনা, ছবি দেখা, সঙ্গী-সাথীদের সাথে খেলাধূলা করা—এসব কাজ শিশুদের প্রিয়। এদের কিছু শেখাতে হলে—বিষয়বস্তুটি খেলা, গল্প বা চিত্রের মারফত এদের কাছে উপস্থিত করতে হবে। তারা যেন বুঝতে না পারে যে, তাদের লেখা-পড়া শেখান হচ্ছে। লেখাপড়ার কোন প্রয়োজন তাদের জীবনে নেই কিংবা লেখাপড়ার অভাব-বোধও তাদের নেই। অতএব সে বিষয়ে তাদের কোন আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক। এছাড়া, মানবশিশু তাদের প্রয়োজনীয় অনেক-কিছু শিখে নেয় অনুকরণের সাহায্যে, তাদের নিকটতম পরিবেশ হতে। নিজেদের গরজে, অনুকরণের সাহায্যে যা-কিছু শিশুরা শেখে, ভবিষ্যৎ জীবনে তা তাদের কোন কাজে আসবে কিনা তা তারা জানে না অথবা জানবার ক্ষমতাও তাদের পুষ্ট হয় নি। অতএব এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে শিশুর পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অপরাপর গুরুজনদের। কোন্‌টা শিশুর প্রয়োজন, কোন্‌টা অপ্রয়োজন—সে বাছুনির ভার নিতে হবে তাঁদের। বুঝিয়ে তাদের সুপথে চালিত করার বয়স তাদের হয় নি। অতএব তাদের শেখার জন্য সৃষ্টি করে রাখতে হবে সুষ্ঠু পরিবেশ। সে পরিবেশ হতে যা-কিছু তারা অনুকরণ করে শিখবে সবই যেন তাদের ভবিষ্যৎ ব্যবহার মার্জিত করতে সাহায্য করে। এমন-সব জিনিস তাদের পরিবেশ হতে সযত্নে সরিয়ে রাখতে হবে যা শিখে ভবিষ্যতে তাদের পাওনা হয় শুধু তিরস্কার। মানুষ সারাজীবন ধরে যা-কিছু শেখে তার বেশীর ভাগই তারা আয়ত্ত করে নেয় তাদের অপরিণত বয়সেই। সে সময়টিতে মানবশিশুর কৌতূহল বা জানবার ইচ্ছা সবচেয়ে প্রবল থাকে। উত্তম থাকে তখন অফুরন্ত। যেদিন থেকে শিশুর মন বাইরের প্রেরণায় সাড়া দিতে আরম্ভ করে সেদিন থেকেই শুরু হয় তার শেখা। শিশুর বাইরের জগৎ ও ভিতরের জগতের মধ্যে আদান-প্রদান তখন থেকেই চলতে থাকে। এই আদান-প্রদানের কাজটি শিশুর মনকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। গ্রহণ এবং বর্জন করার কাজের সাথে সাথেই চলে নির্বাচন বা বাছুনির কাজ। প্রীতিপ্রদ বস্তু গ্রহণ এবং বিরক্তিকর বস্তু বর্জন, ভুল বাদ দিয়ে দিয়ে শুদ্ধটিকে গ্রহণ ইত্যাদি কাজ শিশুমনের সাথে বুঝাপড়া করেই অগ্রসর হয়। এই বাছুনির কাজে সহায়তা করাই শিশুকে শেখাবার মূল তত্ত্ব।

শিশু বড় হয়েছে। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও এখন আর তার খালি নেই।

নূতন কিছু করতে হলেই সে এখন ভেবে দেখে এতে তার কোন লাভ হবে কিনা, জীবনের প্রয়োজনে সেটার মূল্য কতটুকু। এই মূল্যজ্ঞান জন্মাবার পর হতেই শেখাবার পদ্ধতিরও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। লেখা-পড়ায় ভাল হলে সবাই ভাল বলে, আদর করে, পুরস্কার দেয়; আর, অন্যথায় মেলে শুধু তিরস্কার, অবজ্ঞা, অনাদর ইত্যাদি—এ-ধরনের উত্তেজনা যুগিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়শুনায় কতটা আগ্রহান্বিত করা যায় সেইটাই ভাববার বিষয়। জীবনে মূল্যবোধ তাদের জাগ্রত হয়েছে। প্রতিটি কাজের বিচারই এখন তারা প্রয়োজনের মাপকাঠি দিয়ে করতে চায়। কাজেই, এ অবস্থায় তাদের শেখার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে, বিষয়বস্তুর প্রয়োজন বা মূল্যবোধ তাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। **ক্ষেত্র-তত্ত্ব মতবাদটি** (Field Theory) এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোক সম্পাত করেছে। এ তত্ত্ব—শেখাকে—প্রয়োজন, পরিবেশ বা ক্ষেত্রের সঙ্গে একযোগে ভাবতে নির্দেশ দিচ্ছে। **শেখার সাথে শিক্ষার্থীর ইচ্ছার যেখানে সঙ্গতি নেই সেখানে শেখাবার সমস্ত চেষ্টাই প্রায় পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়।** শিক্ষার্থী যখন বুঝবে যে, জীবনের প্রয়োজনেই তার শেখার দরকার তখন আপন চেষ্টায় আগ্রহের সঙ্গে সে শিখতে চেষ্টা করবে। অতএব, শিক্ষার বিষয়বস্তুসমূহ জীবনের প্রয়োজনের সাথে ঐক্য রেখে নির্ধারিত করতে হবে। যদি কোন কাজেই না লাগল তা'হলে এগুলো শিখব কেন?—এ প্রশ্নের সদুত্তর ছেলেমেয়েরা দাবি করতে পারে।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তারতম্য আছে এবং তা থাকবেও চিরকাল। কাজেই, একই ধরনে শিক্ষা দিয়ে সবার কাছ থেকে একইরূপ প্রতিক্রিয়া আমরা আশা করতে পারি না। একটি শ্রেণীতে পাঠদান শেষ করে দেখা গেল—কয়েকটি ছাত্র বিশেষ-কিছুই শিখতে পারে নি। তখনই তাদের তিরস্কার করে নিরুৎসাহ করা সমীচীন নয়। শেখাতে হলে শিক্ষার্থীকে কখনো নিরুৎসাহ করতে নেই। সবাই শিখতে পেরেছে তুমিও চেষ্টা করলে পারবে—এ ভরসা তাকে দিতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই পারবে—এই বলে শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দিতে হবে। এ-ধরনের উৎসাহ-বাণী (Incentive) শুনিয়ে শুনিয়ে নিজের শক্তিতে যেন তার কোনদিন কোন সন্দেহ না জাগে সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকতে হবে। সে যে অক্ষম—এ ধারণা যেন কখনো কোন শিক্ষার্থীর মনে স্থান না পায়।

চেষ্টা করে করে বিফলতা বরণ করতে হলেও সে যেন মুষড়ে না পড়ে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন ব্যবহার কোন শিক্ষার্থীর সঙ্গে করা উচিত নয় যাতে সে মনে করার সুযোগ পায় যে শ্রেণীকক্ষের অপরাপর ছাত্রছাত্রী হতে সে নিকৃষ্ট। অতএব, বিষয়বস্তু ও পাঠদান-পদ্ধতি প্রয়োজন মত পরিবর্তন করাই যুক্তিসঙ্গত। মোট কথা, যা শেখাতে হবে সেটা শিক্ষার্থীর শক্তির পরিধির মধ্যে থাকা দরকার এবং সে বিষয়-বস্তুর প্রয়োজনীয়তা-বোধও তার মধ্যে জাগাতে হবে। যা শিখবে সে সম্বন্ধে যেন শিক্ষার্থীর মনে কোন খট্‌কা না থাকে। সে যদি একবার বুঝতে পারে যে, এসব শেখা তার জীবনের প্রয়োজনেই দরকার, তা'হলে শিখবার জন্য তার নিজেরই আগ্রহ জাগবে। তখন আর পদ্ধতি নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, এবং শেখাবার কাজটিও তখন হয়ে পড়বে অতি সহজ ও সরল। শিক্ষার্থী যখন হৃদয়ঙ্গম করবে—এ জগতে টিকে থাকতে হলে তাকে কিছু-না-কিছু শিক্ষা করতেই হবে, তখন থেকেই শুরু হবে তার সত্যিকারের শেখার কাজ।

॥ ষোল ॥

পাঠদানের কৌশল

(Teaching Devices)

পাঠদান-কাজটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে পাঠদানের প্রচলিত কৌশলসমূহের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা প্রয়োজন। কৌশলসমূহ শুধু আয়ত্ত করে নিলেই চলবে না, কোন্ কৌশলটির সাহায্যে আমরা কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চাই সে সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।

পাঠদানের কৌশলসমূহ মোটামুটি নিম্নরূপ—**বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রদীপন, প্রশ্ন ও উত্তর, পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা, সারাংশ গঠন ও সারমর্ম লিপিবদ্ধকরণ,** ও **পরীক্ষা।**

(i) **বর্ণনা**—শিক্ষাদানের এ কৌশলটিই সবচেয়ে বেশী প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বই নিয়ে শ্রেণীকক্ষে একটানা পড়ে যাওয়াকে বর্ণনা বলা যায় না। পড়াটি জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক না হলে বর্ণনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। এমন ভাবে পাঠ করতে হবে যাতে শিক্ষণীয় পাঠটি ছাত্রছাত্রীর মানস-পটে জ্বলন্ত চিত্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পাঠের ভঙ্গীটি এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহজেই সেদিকে আকৃষ্ট হয়। বর্ণনার সাথে বক্তার অন্তরের যোগ না থাকলে শ্রোতার অন্তর স্পর্শ করা যায় না। বর্ণনা দিতে গিয়ে ভাবাবেগে পাঠের নির্দিষ্ট লক্ষ্য যেন ভ্রষ্ট না হয় সেদিকেও সজাগ থাকা দরকার। তা'ছাড়া বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে ব্যাখ্যা, প্রদীপন, প্রশ্ন করে উত্তর আদায়—এসবের সাহায্য নিতে যেন ভুল না হয়। মোটের উপর, বর্ণনাটি ছাত্রছাত্রীর হৃদয়গ্রাহী করে তোলার সব রকম প্রচেষ্টাই যেন বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে চলে।

বর্ণনাটি হৃদয়গ্রাহী করতে হলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার—

(১) সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ।

(২) ভাষা সরল ও ভাব শিক্ষার্থীর উপলব্ধিযোগ্য।

(৩) বৈচিত্র্যপূর্ণ।

(৪) বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে প্রদীপন।

(৫) সংক্ষিপ্ত ও মর্মস্পর্শী।

প্রায় সকল বিষয়ের পাঠদানকালেই কম-বেশী বর্ণনার সাহায্য নিতে হয়। বিশেষ করে, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা ইত্যাদির পাঠ দিতে বর্ণনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। অতএব শিক্ষক মাত্রেরই বর্ণনা দেবার কৌশলটি আয়ত্ত থাকা দরকার। অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষক মহাশয় বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে বর্ণনা দিয়ে গেলেন এক ঘণ্টা ধরে, কিন্তু প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ অংশের দিকে ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণের ব্যবস্থার অভাবে সমস্ত শ্রমই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। একটানা একঘেয়ে বর্ণনা ছেলেরা কখনো পছন্দ করে না। এ-ধরনের বর্ণনা শিক্ষার্থীদের মনে কোন দাগ কাটতে পারে না। পাঠের বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্ণনার সাথে সাথে মানচিত্র, ব্ল্যাকবোর্ড, নানাবিধ সাজসরঞ্জাম এবং নানা ধরনের উপমার সাহায্যে বর্ণনাটিকে বৈচিত্র্যময় ও প্রাণবন্ত করে রাখতে হবে।

(ii) **ব্যাখ্যা**—শব্দের পরিবর্তে শব্দ কিংবা বাক্যের পরিবর্তে বাক্য ব্যবহারই ব্যাখ্যার শেষ কথা নয়। আকাশ অর্থ অম্বর, বায়ু অর্থ মারুত, জল অর্থ উদক—এভাবে শব্দের পরিবর্তে আরো কঠিন শব্দ ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা পণ্ডশ্রমেরই নামান্তর। ব্যাখ্যার মূল উদ্দেশ্য বাক্যের অন্তর্গত ভাবটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজ করে তুলে ধরা। পাঠ্যাংশের ভাষা খুব কঠিন হলে ভাষাটিকে সরল করা পূর্বাহ্নে প্রয়োজন। তারপর, প্রয়োজন-বোধে তুলনা দিয়ে ভাবটিকে শিক্ষাথাদের গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করতে হবে। ভাবটি ভালভাবে গ্রহণযোগ্য করতে হলে অনেক সময় উদাহরণ এবং পরীক্ষারও প্রয়োজন হতে পারে। মোটের উপর, ব্যাখ্যার আসল উদ্দেশ্য হল—বর্ণনাকালে পাঠের যে সমস্ত অংশের অন্তর্নিহিত ভাবটুকু শিক্ষার্থীদের নিকট একটু দুরূহ বলে প্রতীয়মান হবে সেইসব অংশের বিশ্লেষণ করে ভাবটি তাদের গ্রহণ করতে সাহায্য করা।

(iii) **প্রদীপন**—প্রদীপন অর্থ উজ্জ্বল করণ। পাঠ্যাংশটুকু উজ্জ্বল করে ছাত্রছাত্রীদের সামনে ধরার নামই প্রদীপন। নূতন কোন বিষয়ের

পাঠদানকালে প্রদীপনের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। যে বিষয়টি শিশু জানে না, কোনদিন সে বিষয়ে কিছু শুনেওনি, সে বিষয়ে শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে তৎতুল্য বা তৎসদৃশ কোন বস্তু বা বিষয়ের মারফত শিক্ষককে অগ্রসর হতে হবে। এক কথায়, জানার ভিতর দিয়েই অজানার সন্ধান দিতে হবে। জটিল বিষয়ের জ্ঞানদান করতে হলে সরল বিষয় ধরেই অগ্রসর হতে হয়। শিশুর পূর্বার্জিত জ্ঞানভাণ্ডারের সূত্র ধরেই নূতন জ্ঞান পরিবেশন করতে হয়। সম্বন্ধহীন অসংলগ্ন কতকগুলো জ্ঞান শিশুর জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত হলেই শিশুকে জ্ঞানী বলা যায় না। তা'ছাড়া পূর্বার্জিত জ্ঞানের সাথে সম্পর্ক-বিহীন নূতন জ্ঞান শিশুর স্মৃতিতে অধিককাল স্থায়ীও হয় না। নূতন-কিছু শেখাবার মূল কৌশলই হল পুরাতনের সাথে নূতনকে গেঁথে দেওয়া। ব্যাপক অর্থে এ কৌশলটিকে প্রদীপন বলা চলে।

শিশু সাধারণতঃ তার দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মারফতই জ্ঞান আহরণ করে। জ্ঞান আহরণে এ-দুটি ইন্দ্রিয়ই বিশেষ কার্যকরী। এ-দুটি ইন্দ্রিয়কে পৃথক পৃথক, সম্ভবস্থলে যুগপৎ, কাজে লাগানই প্রদীপনের আসল উদ্দেশ্য।

বাস্তব প্রদীপনের সাহায্যে দর্শন ইন্দ্রিয়টিকে কাজে লাগান যায়। নানারূপ বস্তু, নানা বর্ণের চিত্র, মানচিত্র, নকৃশা ইত্যাদি এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে নানারূপ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করে শিশুর দর্শন ইন্দ্রিয়ের মারফত শিশুকে নূতন জ্ঞান আহরণে সাহায্য করা প্রদীপনের একটি অঙ্গ। বর্ণিত বিষয়ের বাস্তব রূপ পরিদর্শন করা অথবা আদর্শ বা মডেল তৈরি করে শিশুদের সম্মুখে স্থাপন করেও অনেক সময় প্রদীপনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শিশুর শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগাতে হলে বাচনিক প্রদীপনের সাহায্য নিতে হয়। নানা রকম উদাহরণ, গল্প, উপমা ইত্যাদির সাহায্যে প্রদীপনের কাজ চালান যায়। কোন বিমূর্ত (abstract) বিষয়ের বর্ণনা দেবার সময় শিক্ষক মহাশয় যদি একটি গল্পের মারফত বিষয়টি পরিবেশন করেন, তা'হলে গল্প শোনার উৎসাহে ছেলেমেয়েরা বিমূর্ত বিষয়টি বুঝবার চেষ্টা করবে। কোন নূতন বস্তু বা ঘটনা স্বতঃই শিশুদের মনকে আকৃষ্ট করে। ঘটনাটি জানবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে। তাই শিশু তার পুরাতন জ্ঞানের সাথে নূতনকে গেঁথে তুলতে নিজেই চেষ্টা করে। বাচনিক প্রদীপন কার্যকরী করতে হলে বলবার ভাষা ও ভঙ্গী আকর্ষণীয় হওয়া দরকার।

শ্রবণ ও দর্শন ইন্দ্রিয় এ-দুটিকে একসঙ্গে কাজে লাগাতে হলে ব্ল্যাক-বোর্ডের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা উত্তম। ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা গেল—

(১) ব্ল্যাকবোর্ডটি শ্রেণীকক্ষে এমন ভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে প্রত্যেকটি ছাত্র বোর্ডের লেখা স্পষ্ট দেখতে পায়। শিক্ষক মহাশয় লিখবার সময় এমন স্থানে দাঁড়াবেন যেন কারো দেখতে কোন অসুবিধা না হয়।

(২) ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা খুব স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই।

(৩) একটি বিষয় সম্পর্কে লেখা শেষ হয়ে গেলে অপর অংশ লিখবার আগে পূর্বের লিখিত অংশটি পরিষ্কার করে মুছে ফেলতে হবে। নচেৎ ছাত্রদের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হতে পারে।

(৪) লেখাটি যেন নির্ভুল হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৫) শিক্ষক মহাশয় ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে থাকা কালীন শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরাও যেন নিজ নিজ খাতায় লেখে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে হবে।

(৬) একটানা না লিখে, খানিক লিখে এক একবার ছাত্রেরা কি করে না করে দেখে নেওয়া দরকার।

(৭) একটি বিষয় ছেলেরা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম না করা পর্যন্ত অপর বিষয় ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে গেলে ছাত্রদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হবার পক্ষে বাধা জন্মাবে।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানকালে মাঝে মাঝে ছাত্রদের বোর্ডে পাঠান হলে, তাদের সাহস ও উৎসাহ বেড়ে যায়। হয়ত একটি ছেলে মুখে ভাল উত্তর করতে পারে, কিন্তু লিখতে দিলেই ভুল করে ফেলে। এমন ছেলেকে বোর্ডে পাঠান হলে, ভুল লিখে সহপাঠীদের কাছে লজ্জা পেতে হবে এ ভয়ে নিজের গরজেই সে পড়া তৈরি করতে চেষ্টা করে। ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা দেখে দেখেও অনেক সময় ছেলেদের সাধারণ কতকগুলো ভুল সংশোধিত হয়ে যায়। পাঠের সারাংশ বোর্ডে লেখা হলে তা দেখে দেখেও ছেলেরা অনেক কথা মনে রাখতে পারে। এভাবে প্রদীপনের কাজে ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার বিশেষ কার্যকরী হয়।

এছাড়াও বর্তমানে প্রদীপনের উদ্দেশ্যে নানা রকম Audio-visual aidsএর প্রচলন হয়েছে।

(iv) **প্রশ্ন ও উত্তর**—পাঠদানকালে ছেলেদের সর্বদা সক্রিয় রাখার ব্যবস্থা না থাকলে কাজটি অনেক সময়ই একতরফা হয়ে যায়। ছেলেরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করে বসে থাকলে শিক্ষক মহাশয়ের শ্রম প্রায় সম্পূর্ণই ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা। শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় রাখার জন্য পড়াবার মাঝে মাঝে নানা ধরনের প্রশ্ন করে করে তাদের কাছ থেকে উত্তর আদায়ের চেষ্টা করতে হয়। প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা বজায় রাখারও অনেক সুবিধা হয়। ছাত্রদের মনটিকে সর্বদা পাঠগ্রহণে উন্মুখ রাখতে হলে প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। প্রশ্ন করে করে উত্তর আদায়ের চেষ্টা করা হলে ছেলেরা পাঠ-অনুসরণে সর্বদা সজাগ থাকে। প্রশ্ন করে অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের খানিক খানিক চিন্তা করার অভ্যাসও করান যায়। এছাড়া, প্রশ্ন করে পঠন-পদ্ধতি কিরূপ কার্যকরী হচ্ছে তা'ও পরীক্ষা করে প্রয়োজন মত পরিবর্তনও করা চলে। প্রশ্ন করে করে ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগও দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন করা এবং উত্তর আদায় করারও একটা কৌশল আছে। প্রশ্ন করার কৌশলটি শিক্ষা-সাপেক্ষ। প্রশ্নকর্তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব না থাকলে সময়মত কার্যকরী প্রশ্ন করা অনেক সময়ই সম্ভব হয়ে ওঠে না। এছাড়া, ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃতি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে, কিংবা মনের ভাব সহজ ভাষায় ব্যক্ত করার ক্ষমতা না থাকলে দক্ষতার সাথে প্রশ্ন করা সম্ভবপর হয় না। প্রশ্ন একটা করলেই হয় না। অসংলগ্ন, অবান্তর প্রশ্ন সর্বথা বর্জনীয়। চিন্তার খোরাক নেই এমন কোন প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের না করাই ভাল। প্রশ্নটি শুনে একটু ভেবে উত্তর দিলে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই। প্রশ্নটি যেন দ্ব্যর্থব্যঞ্জক না হয়। তাছাড়া, উত্তরটি যেন খুব লম্বা কিংবা অতি সংক্ষিপ্ত (অর্থাৎ শুধু হাঁ বা না বলেই চালিয়ে দেওয়া যায়) না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কোন নির্দিষ্ট ছেলে কিংবা মেয়েকে লক্ষ্য করে শ্রেণীকক্ষে কোন প্রশ্ন করা সঙ্গত নয়। প্রশ্নগুলো শ্রেণীকক্ষে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। পাঠের সাথে সম্পর্কশূন্য কোন প্রশ্ন শ্রেণীকক্ষে উত্থাপন না করাই ভাল। তাতে শিক্ষার্থীদের চিন্তার ধারা হয়ত ভিন্ন খাত ধরে চলতে শুরু করতে পারে। মোট কথা, প্রশ্নগুলো পাঠদান-পদ্ধতিকে সাহায্য করছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে

হবে। প্রশ্নও পাঠদানের একটি কৌশল মাত্র। উদ্দেশ্যের মাপকাঠি দিয়ে প্রশ্নসমূহকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। যথা, **শিক্ষামূলক প্রশ্ন** (Training questions), **পরীক্ষামূলক প্রশ্ন** (Testing questions), এবং **শাসনমূলক প্রশ্ন** (Disciplinary questions) ।

শিক্ষামূলক প্রশ্ন—এ ধরনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছাত্রছাত্রীদের নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কারে সহায়তা করা। প্রশ্নগুলো এমনভাবে উত্থাপন করতে হবে যাতে, ছাত্রছাত্রীরা কোন্ পথ ধরে অগ্রসর হতে পারে তার একটা ইঙ্গিত পেতে পারে। পথ ধরিয়ে দিলে, তখন আপন চেষ্টায়ই তারা সত্য আবিষ্কারে সক্ষম হবে। মোট কথা, এ ধরনের প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের বিচার শক্তি পরিপুষ্টি লাভ করবে, এবং বর্ণিত বিষয়সমূহের কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করবে। প্রশ্নটি এমন হবে, যা শুনেই শিশু সঠিক পথে চিন্তা করতে প্রবৃত্ত হবে। যেমন, খানিক বর্ণনা দিয়ে পরের অংশটুকু অনুমান করতে বলা, গল্পের খানিক বলে পরে কি হল জিজ্ঞেস করা। এভাবে প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের সত্য উদ্ঘাটনে আগ্রহ জাগানই শিক্ষামূলক প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য।

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ **সক্রেটিস** শুধু প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যেই নীতিমূলক শিক্ষা দান করতেন। প্রশ্ন করে করে ছেলেকে তার জ্ঞাত বিষয় হতে নূতন নূতন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করতেন। এ পদ্ধতিকে সক্রেটিস-পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতিতে **উত্তর-নির্দেশক প্রশ্নের** (Lading questions) সাহায্যে কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের সিদ্ধান্তে নিয়ে যাওয়া যায়, তার একটি নমুনা দেখানো গেল—

প্রশ্ন—এ বইখানা কার ?

উত্তর—আমার।

প্রশ্ন—তোমার কেমন করে হল ?

উত্তর—আমার বাবা আমায় কিনে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন—তোমাকে না বলে অপর কেহ বইখানা নিতে পারে কি ?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—যদি না বলে নিয়ে যায়, তা'হলে কাজটি কেমন হবে ?

উত্তর—অন্যায় হবে।

প্রশ্ন—না বলে অপরের জিনিস নেওয়াকে কি বলে?

উত্তর—চুরি করা বলে।

প্রশ্ন—তা'হলে চুরি করাকে কিরূপ কাজ বলবে?

উত্তর—অন্যায় কাজ বলব।

এ পদ্ধতিতে কেবল প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীর কাছ থেকেই প্রকৃত উত্তর আদায় করা সম্ভব হয়। উপরের দৃষ্টান্তে চুরি করা যে অন্যায় কাজ একথা শিক্ষক মহাশয়কে বলে দিতে হল না। শিক্ষার্থী নিজেই ঠিক উত্তরটি দিতে সক্ষম হল।

শিক্ষাদানের বিভিন্ন কৌশলগুলোর মধ্যে 'প্রশ্ন ও উত্তর' এই কৌশলটি অতিশয় কার্যকরী। কেবল প্রশ্নের সাহায্যেই ছাত্রছাত্রীদের কোন একটি বিষয় শেখার জন্য উন্মুখ করে তোলা যায়। এবং এই উন্মুখতা অর্থাৎ জানবার জন্য স্পৃহাকে কাজে লাগাতে পারলেই শিক্ষার কাজ অনেক সহজ হয়ে পড়ে। শেখার জন্য সবার আগে দরকার শিক্ষার্থীর শেখার জন্য আগ্রহ (Motive) সৃষ্টি করা এবং এই আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষার্থীকে নির্বাক শ্রোতার আসনে না বসিয়ে তাকে ভাববার সুযোগ দিতে হবে।

পরীক্ষামূলক প্রশ্ন—প্রশ্ন করে ছাত্রছাত্রীদের লব্ধজ্ঞান যেমন পরীক্ষা করা যায়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তারা পাঠে মনোযোগ দিচ্ছে কিনা তা'ও বুঝবার সুবিধা হয়। পাঠ শুরু করবার আগে কয়েকটি প্রশ্ন করে ছেলেদের মনটিকে প্রস্তুত করে নিতে হবে। তারপর পাঠদানের মাঝে মাঝে দু-একটি প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া দরকার ছেলেরা পাঠটি ঠিকমত অনুসরণ করছে কিনা। একতরফা বর্ণনা দিয়ে গেলে ছেলেরা কিছু বুঝছে কিনা তা পরীক্ষা করার সুবিধা হয় না। কাজেই মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে তার উত্তর থেকে বুঝে নেওয়া দরকার এভাবে পড়িয়ে গেলে ছেলেরা লাভবান হবে কিনা। এই পরীক্ষামূলক প্রশ্নগুলো বিশেষ ভেবেচিন্তে করতে হবে। কারণ, প্রশ্নগুলো অসংলগ্ন হলে হঠাৎ খট্‌কা লেগে ছেলেদের চিন্তাস্রোতে ছেদ পড়ে যেতে পারে। দু-একটি প্রশ্ন করে যদি বুঝা যায় বিষয়টি ছেলেরা ঠিকমত ধরে উঠ্‌তে পারছে না, তা'হলে পড়াবার পদ্ধতি প্রয়োজন মত বদলে নিতে হয়, যাতে ছেলেরা অনায়াসে পাঠ অনুসরণ করতে পারে। পাঠদান শেষ করে শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করার পূর্বে শিক্ষক মহাশয় কয়েকটি

প্রশ্নের সাহায্যে পরীক্ষা করে নেবেন পাঠদান কতটুকু কার্যকরী হয়েছে। তা'ছাড়া সমস্ত পাঠের সারমর্মটুকু প্রশ্নের সাহায্যে আলোচনা করে নিলে ছেলেদের সে অংশটুকু স্মরণ করে রাখতে বিশেষ সুবিধা হবে। পাঠের সারাংশটুকু প্রশ্ন করে করে ছেলেদের কাছ থেকে আদায় করে নেবার চেষ্টা করা হলেই শ্রেণীপঠন সার্থক হয়।

শাসনমূলক প্রশ্ন—পড়াতে পড়াতে যদি দেখা যায় কোন ছাত্র মোটেই মনোযোগ দিচ্ছে না, তখনই তাকে পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্নের উত্তর যথাযথ দিতে না পারলে সে নিজেই লজ্জিত হবে এবং ভবিষ্যতে আর অমনোযোগী হবে না। শ্রেণীর অপরাপর ছেলেরাও বুঝতে পারবে পাঠে অমনোযোগী হলে শিক্ষক মহাশয় এভাবে প্রশ্ন করলে সহপাঠীদের কাছে লজ্জা পেতে হবে। অর্থাৎ একজনকে প্রশ্ন করা হলে শ্রেণীর অপর সবার দৃষ্টিই সেদিকে আকৃষ্ট হবে এবং অমনোযোগী ছেলেটির অসহায় অবস্থা তাদেরও ভবিষ্যতের জন্য হুঁশিয়ার করে দেবে। মাঝে মাঝে দেখা যায়—দু-একটি ছেলে পড়ায় মন দিচ্ছে না, কারণ শিক্ষক মহাশয় যা বলে যাচ্ছেন এসব ত তাদের জানা জিনিস। এসব ক্ষেত্রে উক্ত ছেলেদের একটু কঠিনতর একটি প্রশ্ন করে বুঝতে দিতে হবে যে তার জ্ঞানের পরিধি খুব বিস্তৃত নয়, আরও অনেক-কিছু জানতে বাকী। এছাড়া, যখন দেখা যাবে শিক্ষক মহাশয় বোর্ডে লিখছেন এবং এ অবসরে শ্রেণীতে একটু গোলমাল শুরু হয়েছে, তখন সমস্ত শ্রেণীকে লক্ষ্য করে একটি প্রশ্ন করে বসলে সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হবে। এবং গোলমালও সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যাবে। এ ধরনের প্রশ্নকেই শৃঙ্খলামূলক প্রশ্ন বলা হয়।

প্রশ্ন করা যেমন একটি কৌশল, উত্তর আদায় করারও তেমনি কয়েকটি নিয়ম আছে। যথা—

(ক) সামান্য ত্রুটির জন্য কোন উত্তরকে একেবারে উপেক্ষা করতে নেই। উত্তর বলার সময় ছেলেটি ভাবাবেগে হয়ত নিজের কথ্য ভাষাই ব্যবহার করে যাচ্ছে। তখন তাকে বাধা দিতে নেই। তাকে নিরুৎসাহ করলে ভবিষ্যতে উত্তর দেবার জন্য সে আর কখনো দাঁড়াতে তেমন সাহস পাবে না। এভাবে সাহস হারিয়ে ক্রমশঃ পাঠে সে অমনোযোগী হতে থাকবে। প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করে যাকে উত্তর বলতে নির্দেশ করা হল সে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করলে তাকে উৎসাহ দিয়ে, দরকার-বোধে

একটু-আধটু সাহায্য করেও উত্তরটি তার কাছ থেকেই আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা করাই সঙ্গত।

(খ) পর পর কয়েকটি ছাত্রই যদি ভুল উত্তর দিতে থাকে, তা'হলে বুঝতে হবে পড়াবার মধ্যেই কোথাও ত্রুটি রয়ে গেছে অথবা ছেলেদের উপযুক্ত করে পাঠটি পরিবেশন করা হয় নি। এ অবস্থায় উত্তর আদায়ের জন্য কখনো জেদ করা সঙ্গত নয়। বরং পুনরায় পড়াটি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করাই উচিত। প্রশ্নটি করেই উত্তরদাতাকে একটু ভাববার সময় না দিয়ে পরমুহূর্তেই প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করা যুক্তিযুক্ত নয়। উত্তরের জন্য এভাবে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করা শিক্ষকের অনুচিত।

(গ) প্রশ্ন করেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা অযৌক্তিক। উত্তরদাতাকে নিজের উপর নির্ভর করার সুযোগ দিতে হবে। এজন্য, শ্রেণীকক্ষের অপর কোন ছেলে যদি উত্তরদানে কোন প্রকার সাহায্য করতে প্রয়াস পায়, তা'হলে অচিরে তা বন্ধ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ বক্তব্য বলবার সুযোগ পায় সেরূপ একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে। নচেৎ তাদের জ্ঞানের নির্ভুল পরিমাপ কোন কালেই সম্ভব হবে না। ছাত্রছাত্রীদের প্রদত্ত উত্তর সরাসরি অনুমোদন বা অগ্রাহ্য না করে বরং শিক্ষক নিজে শুদ্ধ উত্তরটি স্পষ্ট ভাবে আবৃত্তি করে শ্রেণীকক্ষের সবাইকে শুনিয়ে দিবেন। এমন কোন সুযোগ উপস্থিত হতে দিতে নেই, যাতে অশুদ্ধ উত্তর শুনে তাকে শুদ্ধ বলে কদাচ তাদের ভ্রম হয়। অশুদ্ধ উত্তর বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষক মহাশয় নিজেই শুদ্ধ উত্তরটি আবৃত্তি করে যাবেন।

(v) **পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা**—শিক্ষাদানের এ কৌশলটি ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিশক্তিকে যথেষ্ট সাহায্য করে। পাঠ্যাংশের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বিশেষ অংশগুলো বর্ণনা করবার সময়ই পুনরাবৃত্তি করা সঙ্গত। একটি বিষয় বার বার আবৃত্তি করে কিংবা অপরের আবৃত্তি শ্রবণ করেও অনেক সময় সে বিষয়টি স্মরণ রাখা যায়। কাজেই, পাঠদানকালে শিক্ষকের নিজের অথবা প্রশ্ন করে ছাত্রদের দিয়ে জটিল অংশটুকু পুনরাবৃত্তির ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

পুনরালোচনা বা চর্চাও স্মৃতিশক্তিকে বিশেষ সাহায্য করে। কথায় বলে—অনভ্যাসে বিদ্যাহ্রাস। কোন বিষয় শিক্ষা করার পর কিছুকাল যদি

সে বিষয়টির কোন চর্চা না করা হয়, তা'হলে ক্রমে সে বিষয়টি স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। এ-কারণেই লব্ধ জ্ঞানটিকে মাঝে মাঝে ঝালান দরকার। প্রতিদিন পাঠ শুরু করার পূর্বে, বিগত দিনের পাঠটুকু ছাত্রছাত্রীদের কতটুকু স্মরণ আছে তা পরীক্ষা করার নিমিত্ত কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা প্রয়োজন। এছাড়া, অর্জিত জ্ঞানটুকু প্রয়োগ করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিলেই পুনরালোচনার কাজটি সহজ ও বিশেষ ফলপ্রদ হয়। যে বিদ্যা শিশু অর্জন করে তা যদি সে জীবনের কোন প্রয়োজনে না লাগাতে পারে, তা'হলে সে বিদ্যার বোঝা অনর্থক সে আর কতকাল বহন করবে? কাজেই প্রয়োগের মারফত পুনরালোচনাই অনেক বেশী কার্যকরী। পাঠের বিষয়বস্তুর ব্যবহারিক দিকটির প্রতি ছেলেমেয়েদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হলেই প্রকারান্তরে পুনরালোচনার কাজটি বিশেষভাবে কার্যকরী হবে। যেমন, গণিতের আঁক কষার একটি নিয়ম শিখিয়ে তার সাহায্যে কত রকমারি প্রশ্নের সমাধান করা যায় সেদিকে ছেলেদের প্রলুব্ধ করতে পারলেই ছেলেরা নিজের চেষ্টায় আগ্রহের সাথে ঐ নিয়মটি প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রশ্ন সমাধান করে ঐ নিয়মটির সাথে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে যাবে এবং নিয়মটি অনেককাল তাদের স্মরণেও থাকবে। বিজ্ঞান পড়িয়ে কিভাবে বাড়ী গিয়ে তার ব্যবহার করবে সে হদিসটি দিয়ে দিলে, ছেলে নিজে থেকেই বিজ্ঞানের পঠিত বিষয়টি চর্চা করার সুবিধা পাবে। ভূগোল পড়িয়ে ইঙ্গিত দিয়ে দিতে হবে—কিভাবে ঘরে বসেও নানা দেশ-বিদেশের খবর সংগ্রহ করা যায়। এক কথায়, অর্জিত বিদ্যার প্রয়োগবিধি শিখিয়ে দেওয়াই পুনরালোচনার প্রকৃষ্ট পন্থা। এছাড়া, মাঝে মাঝে নানা ধরনের পরীক্ষার সাহায্যেও পুনরালোচনার কাজটি চালিয়ে যাওয়া যায়। মোট কথা, পাঠদান সাফল্য-মণ্ডিত করতে হলে, পাঠের শেষে পুনরালোচনার কোন-না-কোন ব্যবস্থা রাখতেই হবে। পুনরালোচনার ইঙ্গিত বা হদিস দেওয়া পাঠদানের একটি অঙ্গ।

(vi) **সারাংশ গঠন এবং সারমর্ম লিপিবদ্ধ করণ**—পাঠদানের এ কৌশলটির উদ্দেশ্যও মোটামুটি ছেলেমেয়েদের স্মৃতিশক্তিকে সহায়তা করা। পাঠের সারাংশ শিক্ষক নিজে আবৃত্তি না করে ছেলেদের সহায়তায়ই গঠন করে ব্ল্যাকবোর্ডে নির্ভুল ভাবে লিখে দেবেন, এবং ছেলেদেরও তা খাতায় লিখে নিতে নির্দেশ দেবেন। এভাবে সারাংশ

লিখে নেবার একটি অভ্যাস গঠিত হয়ে গেলে, ছেলেরা যা যা প্রয়োজনীয় বিষয় পড়বে বা শুনবে তা থেকে অনায়াসে সারাংশ গঠন করে আপন আপন খাতায় লিখে রাখতে পারবে। এভাবে তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার ক্রমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। পাঠ্য বিষয়ের সারাংশ খাতায় লেখা থাকলে পুনরালোচনারও অনেক সুবিধা হয়। কাজেই, কিভাবে অল্প কথায় বড় একটি বিষয়কে লিখে রাখা যায় এ কৌশলটি ছেলেদের অবশ্যই শিখিয়ে দিতে হবে, তারপর ছেলেরা কিভাবে সারাংশ আদায় করছে তা দেখে বুঝা যায় তারা ঠিকমত পাঠ অনুসরণ করেছে কিনা। তা'ছাড়া সারাংশ লিখে নেবার অভ্যাস হয়ে গেলে ছেলেরা অল্প সময়ে অধিক কাজ করে ফেলতে পারবে। অতএব, সারাংশ গঠন এবং সারমর্ম লিপিবদ্ধ করবার ক্ষমতাটি যাতে শিশুরা সহজে আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া কর্তব্য।

(vii) **পরীক্ষা**—পরীক্ষা অর্থ শুধু যাচাই করা নয়। পরীক্ষা শিক্ষা-দানের একটি কৌশলও বটে। প্রথমতঃ সাপ্তাহিক পরীক্ষা-ব্যবস্থা চালু রাখা হলে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে ছেলেমেয়েরা পূর্বে অধীত সমস্ত পাঠ পুনরালোচনা করার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষার ফলাফল দেখে পুরস্কার বা প্রশংসার ব্যবস্থা থাকলে, প্রশংসার লোভে ছেলেমেয়েদের শেখার আগ্রহ অনেক বেড়ে যায়। কারণ, প্রশংসায় কে না খুশী হয়! পরীক্ষায় ভাল ফল করলে সবাই ভালবাসবে, প্রশংসা করবে এই আগ্রহে পড়াশুনায় ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু, পরীক্ষা যেন ছেলেমেয়েদের মনে ভীতির সঞ্চার না করে সে বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতি বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। এ ব্যবস্থার গলদ ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিংশ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

॥ সতরো ॥

পাঠদান-পদ্ধতি (Teaching Methods)

পাঠদানের জন্য কোন একটি ধরাবাঁধা পদ্ধতি থাকতে পারে না। পাঠদান-পদ্ধতি মাত্রই স্থান, কাল, পাত্র (শিশু) এবং বিষয়বস্তুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তা'ছাড়া **শিক্ষার সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও শিশুর পূর্ণ সহযোগিতা লাভের কৌশল জানা না থাকলে শেখাবার কোন পদ্ধতিই সম্পূর্ণ কার্যকরী হতে পারে না।** শিশুর মনটিকে না জেনে পাঠ দিতে গেলে কোন পদ্ধতিই ফলপ্রসূ হবে না। এ-কারণে, শিশু-মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই শেখাবার বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। একই পদ্ধতি অবলম্বনে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করা সম্ভবপর হয় না। যেমন, বিজ্ঞান শেখাতে **আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি** (Heuristic Method) বিশেষ কার্যকরী। কিন্তু, গণিত শেখাতে হলে **আরোহী ও অবরোহী প্রণালী** (Inductive and Deductive Method) বেশী উপযোগী।

যে-কোন বিষয় শিক্ষা দিতে হলেই মোটামুটি **হারবার্টের পঞ্চ-সোপান পদ্ধতি** (Five-step Method of Herbart) এবং **ডিউইর সমস্যা-পদ্ধতি** (Project Method of Dewy) অনুসরণ করাই সুবিধাজনক।

I. হারবার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতি

শিশু-মনের কার্যধারার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই এ পদ্ধতিটি রচিত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে পাঠদানের কাজকে **পাঁচটি** ভাগে বা সোপানে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। যথা—**প্রস্তুতিকরণ** (Preparation), **পরিবেশন** (Presentation), **তুলনা** (Association,) **সিদ্ধান্ত** (Generalization) এবং **প্রয়োগ** (Application) ।

(i) **প্রস্তুতিকরণ**—বীজবপন করার পূর্বে যেমন জমি তৈরি করে নিতে হয়, পাঠদান শুরু করার পূর্বেও তেমনি শিক্ষার্থীদের **সমবেক্ষণ মণ্ডলটি** (Apperceptive mass) [সমবেক্ষণ (Apperception) কথাটি Herbartই সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন] জাগিয়ে তুলতে হবে। নূতন এবং পুরাতনের সাথে বোঝাপড়া করেই ছাত্রেরা শেখে। এভাবে পুরাতনের সাথে নূতনের সম্পর্ক স্থাপনকেই Herbart সমবেক্ষণ (Apperception) বলে অভিহিত করেছেন। অতএব কোন-কিছু শিখতে হলে অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার নিমিত্ত এমনভাবে কয়েকটি প্রশ্ন করতে হবে যে-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নূতন-কিছু জানবার জন্য তাদের আগ্রহ জন্মায়। শিক্ষার্থীদের পূর্বলব্ধ যে-কোন অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে গুটিকয়েক প্রশ্ন করে নূতন বিষয়টি জানবার জন্য তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করাই পাঠদানের প্রথম সোপান। যে পাঠ শেখার জন্য ছেলেদের মনটা প্রস্তুত হয়ে আছে সে পাঠটিই তারা অতি অল্প সময়ে আয়ত্ত করতে পারবে। অতএব, যে-কোন পাঠদান-পদ্ধতির বেলায়ই প্রস্তুতিকরণ ধাপটি অত্যাবশ্যক। শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষক মহাশয় হয়ত কোন ভূমিকা না করে নূতন বিষয়টির অবতারণা করলেন এবং বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা দিয়ে ও ব্যাখ্যা করে বিষয়টি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। ছাত্রদেরও হয়ত শুনতে ভালই লাগল। কিন্তু, ক'দিন পরে খোঁজ নিলে দেখা যাবে অধিকাংশ ছেলের কাছেই বিষয়টি সম্পূর্ণ নূতন বলে মনে হচ্ছে। পূর্বার্জিত জ্ঞানের সাথে নূতনের সম্বন্ধ স্থাপিত না হওয়াতেই এরূপ হয়ে থাকে। তাই যে-কোন শিক্ষাদান-পদ্ধতির গোড়ার কথাই হল **পূর্বলব্ধ জ্ঞানের সাথে মিলিয়ে নূতনকে তার সাথে ঢেলে দেওয়া।**

(ii) **পরিবেশন**—ছাত্রছাত্রীদের মনটি নূতন জ্ঞান গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হলে, নূতন পাঠের বিষয়বস্তুটি উজ্জ্বল ভাবে তাদের সম্মুখে স্থাপন করতে হবে। সমগ্র বিষয়বস্তুকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে এক একটি অংশ করে পর পর বর্ণনা সহ ব্যাখ্যা করে যাওয়াই সঙ্গত। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রদীপনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করার প্রয়োজন হতে পারে। সাহিত্যের মর্ম উপলব্ধি করান আর বিজ্ঞানের আবিষ্কারে সহায়তা করা একই নিয়মে সম্ভবপর নয়। প্রকৃত বস্তু বা মডেল, আদর্শ চিত্র বা ছবি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা—এই সব নানা বিষয়ের

সাহায্য এ-স্তরে অপরিহার্য। আসল কথা—শিক্ষার্থীদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এ-স্তরে সাফল্য লাভ করা যায় না। শিক্ষক মহাশয় বর্ণনা দিয়ে গেলেন, আর ছাত্র নির্বাক শ্রোতা সেজে বসে রইল—এভাবে পাঠদান কখনো ফলপ্রসূ হয় না। প্রশ্ন করে করে ছাত্রদের সকল সময় সজাগ রাখতে হবে এবং ছাত্রেরা যাতে নিজের চেষ্টায় বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে আগ্রহশীল হয় সেভাবে অগ্রসর হতে হবে। মোটের উপর, দ্বিতীয় সোপানের কাজ—শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তুটি যথাসম্ভব স্পষ্ট করে তুলে ধরা। তা'হলে তারা নিজেরাই সত্য আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হবে।

(iii) **তুলনা**—এ সোপানের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের স্মৃতি-শক্তিকে সাহায্য করা। পূর্বার্জিত জ্ঞানের সাথে প্রদত্ত জ্ঞানের সংযোগ স্থাপিত না হলে ছাত্রেরা বিষয়টি অধিককাল মনে রাখতে পারে না। ব্যাপারটি ঠিক খেয়ে হজম করার মত। খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হয়ে গেলে যেমন তার অংশসমূহ পরিবর্তিত আকারে দেহের বিভিন্ন অংশের সাথে মিশে যায়, ঠিক তেমনি, নবলব্ধ জ্ঞান পূর্ব অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে তাতে গিয়ে স্থান লাভ করে। একাজে নূতনের সাথে পুরাতনের তুলনা অতিশয় ফলপ্রদ। তুলনার পর সংযোগ সাধনের কাজটি আপনিই সংঘটিত হয়। শিক্ষক মহাশয় বিশ্লেষণের কাজটিতে ছেলেদের সাহায্য করবেন। তারপর তারা নিজেরাই তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারের অনুকূলে যা যা পাবে তাই খুঁজে নিয়ে জমা করবে।

(iv) **সিদ্ধান্ত**—এ-স্তরের উদ্দেশ্য প্রদত্ত পাঠটিকে বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্তে বা মীমাংসায় উপনীত হওয়া। এক কথায়—যা শেখান হল তার চুম্বকটুকু আদায় করার চেষ্টা করা। প্রশ্ন করে করে উত্তর আদায়ের মারফত ছাত্রদের একটা সূত্র গঠন করতে সাহায্য করাই এ-স্তরে শিক্ষকের কাজ। লব্ধ জ্ঞানটুকু যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকে। সবটুকুকে একসূত্রে গেঁথে দেওয়াই এ সোপানের মূল লক্ষ্য। সবাই মিলে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান গেল সেটা সরল ভাষায় পরিষ্কার করে বোর্ডে লিখে দেওয়া সঙ্গত। ছেলেরা যেন নিজেদের মনের সাথে বোর্ডের লেখা মিলিয়ে নিতে পারে। তা'হলে অনেককাল তারা এ জ্ঞানটুকু মনে রাখতে পারবে।

(v) **প্রয়োগ**—প্রয়োগ ভিন্ন কোন জ্ঞানই নিজস্ব হতে পারে না। নব-আবিষ্কৃত সূত্রটি ছাত্র সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে কিনা তা বুঝতে পারা

যাবে তখন, যখন দেখা যাবে—ঐ সূত্রটি প্রয়োগ করে সে নূতন নূতন সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হচ্ছে। কাজেই, নূতন পাঠ থেকে যে সমস্ত জিনিস শেখান হল তার প্রয়োগের ব্যবস্থা এ-স্তরে রাখতেই হবে। যেমন, বীজ-গণিতের যে নিয়মটি শিখেছে তার সাহায্যে নূতন নূতন আঁক কষতে দেওয়া, যে-সব ইংরেজী শব্দ শিখেছে সেগুলো বাক্যে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা, বিজ্ঞানের যে সূত্রটি শিখেছে তার সাহায্যে অনুরূপ ঘটনার ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি পাঠদান-পদ্ধতির অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ বলে ধরে নিতে হবে। প্রদত্ত জ্ঞানের অনুশীলনের ব্যবস্থা না করে দিলে পাঠদানটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পাঠদান (Lesson) সমাপ্ত করার পূর্বে ছেলেরা যাতে নবলব্ধ জ্ঞান সময়ান্তরে প্রয়োগ করতে পারে তার উপাদান যোগান দিয়ে দিতে হবে। এছাড়া, প্রয়োগ ভিন্ন জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধ হয় না। এবং প্রয়োজনীয়তা-বোধ জাগ্রত না হলে লব্ধ জ্ঞানটুকু স্মৃতির পটে অনেককাল ধরে রাখারও কোন অভিপ্রায় থাকে না। এ সর্বশেষ স্তরটি অনেক সময় উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। কিন্তু, শিশুকে জ্ঞানের বোঝা বহন করতে বাধ্য না করে, জ্ঞানটুকু নিজস্ব করে নিতে তাকে সাহায্য করতে গেলে পাঠদানের এ সর্বশেষ স্তরটি অপরিহার্য।

হারবার্টের এই পঞ্চসোপান পদ্ধতি হুবহু অনুকরণ করে সমস্ত বিষয়ের পাঠদান সম্ভবপর না হলেও, এই পাঁচটি অংশ মোটামুটি সমস্ত পদ্ধতিতেই থাকা বাঞ্ছনীয়। নূতন কিছু শেখাতে হলে প্রস্তুতিকরণ এবং প্রয়োগ এ-দুটি স্তর অপরিহার্য। তা'ছাড়া পরিবেশন, তুলনা এবং সিদ্ধান্ত, এই তিনটি অংশের ক্রম সকল সময় ঠিক না রাখা গেলেও কোন অসুবিধা হয় না। কিংবা এ তিনটি অংশকে একত্র করে বা ভেঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও পদ্ধতিতে স্থান করে দেওয়াও যেতে পারে। হারবার্টের দেওয়া ক্রম ঠিক রাখতে হলে অনেক সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বাধীনতাও অনেকখানি খর্ব করতে হয়। কিন্তু, এই পাঁচটি স্তর সম্মুখে রেখে যে-কোন বিষয়ের পাঠদানের নমুনা (Lesson Plan) তৈরি করাই সহজ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান যদিচ হারবার্টের পাঁচটি ধাপকে আমল দিতে চায় না, তথাপি এর ব্যবহারিক দিকটির মূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই। এ পদ্ধতির মূলে যে তত্ত্ব রয়েছে, মনোবিজ্ঞানের বিচারে সে তত্ত্ব এখন অচল। হারবার্ট শিশু-মনটিকে ফাঁকা বা শূন্য রেখেই তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

কিন্তু, শিশু-মন কখনো ফাঁকা থাকতে পারে না। জন্মের দ্বারাই শিশু কতকগুলো মানসিক শক্তির অধিকারী হয়। এবং শিক্ষার সাহায্যে সে শক্তির বিকাশলাভ সম্ভব। অতএব, পাঠদানের কাঠামোটির জন্য পঞ্চসোপান পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হলেও তত্ত্বের দিক থেকে একে গ্রহণ করা চলতে পারে না। বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী অনেক স্থলে সোপানগুলির ক্রম এবং সংখ্যাও পরিবর্তন করে নেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রয়োজন মত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে এ পদ্ধতিটি এখনো সর্বত্রই বেশ চালু আছে।

II. ডিউইর সমস্যা-পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতেও পাঁচটি ধাপ রয়েছে। যথা—**সমস্যার সৃষ্টি, সমস্যার বিশ্লেষণ, সমাধান, সূত্রগঠন** এবং **প্রয়োগ**।

সমস্যার সৃষ্টি—প্রথম ধাপে পাঠের বিষয়টিকে একটি সমস্যার মত করে ছেলেদের কাছে ধরতে হবে। বাস্তব জীবনের সাথে সমস্যাটির মিল রাখার চেষ্টা করা দরকার। ছেলেরা যখন বুঝবে—জীবনে চলার পথে এ ধরনের বহু সমস্যা উপস্থিত হতে পারে, তখন থেকেই সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেরাই আগ্রহান্বিত হবে। নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরেই তখন সবাই মিলে চেষ্টা করবে কিভাবে সমস্যাটির সমাধান করা যায়। শিক্ষা দিতে হলে, শেখার জন্য উন্মুখ করে তোলাই শিক্ষকের প্রথম কাজ। অতএব, এ পদ্ধতির প্রথম ধাপে পাঠের অংশটুকুকে একটি বাস্তব সমস্যায় পরিণত করে নিতে পারলে আর কোন ভাবনা নেই। সমস্যার জটিলতা উপলব্ধি করে সমস্যাটি সমাধানের জন্য ছেলেরা অগ্রসর হলেই এ-স্তরের কাজটি সম্পন্ন হল মনে করতে হবে।

সমস্যার বিশ্লেষণ—সমস্যাটিকে সামগ্রিক ভাবে না দেখে ভাগ ভাগ করে প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যাকে পরীক্ষা করে দেখবার ব্যবস্থা করাই এ-স্তরের কাজ। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে ছেলেদের জ্ঞান থাকা দরকার। আবার, বিভিন্ন অংশগুলোর সাথে সমগ্রের কি সম্পর্ক তা'ও তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। মোট কথা, মূল সমস্যার প্রকৃতি বা স্বরূপ উপলব্ধি করার দিকে ছেলেদের পরিচালিত করাই এ-স্তরের উদ্দেশ্য।

সমস্যার সমাধান—এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে, বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বা যুক্তি নির্ণয়

করাকেই সমাধান বলা যেতে পারে। শিক্ষক মহাশয় পরিচালক হিসাবে—এ-স্তরে শিক্ষার্থীদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। সত্যিকারের কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালিত করার ভারটি শিক্ষককেই নিতে হবে। তারপর, তারা আপন চেষ্টায় একটি মীমাংসায় উপনীত হলেই এ ধাপের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল।

সূত্রগঠন—এবার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যার যে-সব সমাধান নির্ণীত হয়েছে সেগুলো গুছিয়ে একটি সূত্রের আকারে দাঁড় করাতে হবে। অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন অংশের সমাধানসমূহ একটি সূত্রে গেঁথে দিতে হবে। সূত্রটি গঠিত হলেই এ ধাপের কাজ শেষ হল।

প্রয়োগ—পূর্বে বলা হয়েছে প্রয়োগ ভিন্ন কোন জ্ঞানই শিশুদের নিজস্ব হতে পারে না। তাই এ ধাপটি পদ্ধতির একটি বিশেষ অঙ্গ। পূর্বের ধাপে যে সূত্রটি গঠিত হয়েছে তার প্রয়োজনের ব্যবস্থা করে দেওয়াই এ ধাপের শিক্ষকের আসল কাজ। তা'ছাড়া সূত্রটি ঠিকমত নির্ণীত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করে দেখা দরকার।

একটু ভেবে দেখলেই বুঝা যাবে **পঞ্চসোপান পদ্ধতি** এবং **সমস্যা-পদ্ধতি** এ-দুটিতে যথেষ্ট মিল রয়েছে। হারবার্টের পদ্ধতিতে প্রস্তুতি-করণের ধাপে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞানের একটি পরিচয় নিয়ে নেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সমস্যা-পদ্ধতিতে বিষয়টি সমস্যার আকারে ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থিত করা হলে তারা নিজের গরজেই সমস্যাটির সমাধানের জন্য চেষ্টিত হয়। সমস্যা-পদ্ধতিতে ছাত্রদের উপরই বেশী দায়িত্ব চাপান হয়, ফলে তাদের সহযোগিতা এবং মানসিক প্রচেষ্টাও বেশী করে আদায় করে নেবার সুবিধা হয়। যাদের মনের যথেষ্ট পরিণতি হয়নি, তাদের জন্য সমস্যা-পদ্ধতি মোটেই প্রয়োজ্য নয়। সমস্যা-পদ্ধতিতে অনেক সময় বস্তুবিরহিত শুদ্ধ চিন্তার (Abstract thinking) এবং যুক্তিপূর্ণ চিন্তার (Logical thinking) দরকার হয়। কাজেই সমস্যা-পদ্ধতি নিম্ন শ্রেণীতে অচল। কতকগুলো বিষয় শেখাতে সমস্যা-পদ্ধতি পঞ্চসোপান পদ্ধতির চেয়ে বিশেষ কার্যকরী বলেই মনে হয়। মোটের উপর, এ-দুটি পদ্ধতির যে-কোন একটি অবলম্বন করে পাঠদান কাজে অগ্রসর হলে অল্প সময়ে অধিক শেখান সম্ভবপর হয়। তবে, যে পদ্ধতিই অবলম্বন করা হউক না কেন, শিক্ষকের বিনা প্রস্তুতিতে পাঠদান কখনো সাফল্যমণ্ডিত হয় না।

॥ আঠারো ॥

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি

১৯৩৭ সালে, গান্ধীজী 'হরিজন' পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধের মারফত দেশ ও কালোপযোগী শিক্ষার একটি নূতন পরিকল্পনা বিদ্বজ্জন সমক্ষে উপস্থিত করেন।

তাঁর মতে, শুধু আক্ষরিক জ্ঞান তো শিক্ষার চরম কথা নয়ই, এমনকি তার গোড়ার কথাও নয়। মানুষের শিক্ষা শুরু হয় কর্মের মধ্য দিয়ে। কাজ করতে করতে আপন প্রয়োজনে শিশু আপনিই শিক্ষা করে নেবে নানা বিষয়ের জ্ঞান। গান্ধীজী বলতেন, জ্ঞানের একটা ব্যবহারিক মূল্য থাকতেই হবে। জ্ঞান শুধু অর্জন করে বসে থাকলেই চলে না। বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে যে জ্ঞান সহায়তা করে না, তাকে তিনি বলতেন পুঁথিগত বিদ্যা। প্রচলিত শিক্ষার সাথে জীবনের কোন যোগ নেই, এবং এ যোগসূত্র ছিন্ন হওয়াতেই আজ আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি লক্ষ্যহীনের মতো। তাই আজ আমরা চক্ষু থাকতেও অন্ধ।

গান্ধীজীর মূল পরিকল্পনাটি নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর প্রচলিত বুনিয়াদী শিক্ষায় রূপ পেয়েছে। অবশ্য, এ-রূপটিও স্থায়ী নয়। আজও দেশে বহু পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চলছে একে অবলম্বন করে, এবং সাথে সাথে চলেছে পদ্ধতিটির সংস্কারের কাজ। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রকৃতি বদলাতে না পারলে, এর ভিত্তি ভেঙে-চুরে আবার নূতন করে গাঁথুনি তুলতে না পারলে আমাদের জাতীয় জীবনের গতানুগতিক প্রবাহকে নূতন খাতে প্রবাহিত করার অন্য কোন পন্থা নেই—এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েই মহাত্মা গান্ধী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আমদানি করেছিলেন। গান্ধীজীর এ নূতন পরিকল্পনার মূলে যে দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান ইত্যাদি রয়েছে তাকে কোন মতেই উপেক্ষা করা চলে না।

প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় হিংসা-দ্বেষ ও হানাহানিকেই যেন মানুষের মুখ্য প্রেরণা বলে প্রতিভাত হয়। ডারুইনের 'Survival of the fittest'

এই মতবাদটিকেই যেন অজ্ঞাতসারে জীবনের ধর্ম বলে আমরা সবাই স্বীকার করে নিয়েছি। ইতর প্রাণীর মতই যেন সবাই আমরা আত্মসুখের সাধনায় লিপ্ত রয়েছি। এ ভ্রান্তনীতিকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠছে সভ্যতার গগনচুম্বী সৌধ। যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, হানাহানি, এ সবই এখন আমাদের নিত্য সহচর। তাই তো মহাত্মাজী স্পষ্ট করেই বললেন, শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ার কথাই হবে **জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নীতির পরিবর্তে সহযোগিতা নীতির প্রবর্তন**। শুধু ভোগ ও সংগ্রামই জীবনের উদ্দেশ্য নয়। **ত্যাগ ও সহযোগিতাও চলবে তার পাশাপাশি**। মানুষই মানুষকে বধ করেছে ; আবার মানুষই মানুষকে করেছে ক্ষমা, উৎসর্গ করেছে নিজের জীবন অপরের কল্যাণে। আত্মত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের দৃষ্টান্ত আজও দেশে দেশে বিরল নয়। মানুষ হিংসা করছে মানুষকে, আবার মানুষই ভালবাসছে মানুষকে। প্রেম ও প্রীতির বন্ধনেই রচিত হচ্ছে ধরায় স্বর্গ।

এই জীবন-আদর্শকেই গান্ধীজী রূপায়িত করতে চেয়েছেন আমাদের শিশুদের জীবনে। কিন্তু সে কাজ একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই সাধিত হওয়া সম্ভব। সেবা ও প্রেমের মন্ত্রে যারা দীক্ষিত, ন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে যেয়ে যারা অপরকে বিনাশ করতে উদ্যত না হয়ে প্রস্তুত হবে নিজেকে আত্মবলি দিতে, অর্থাৎ যারা বাইরের সর্বপ্রকার চাপকে অগ্রাহ্য করে অন্তরের নির্দেশে চলবার ক্ষমতায় ক্ষমতাসম্পন্ন, তাদেরই বলা হয় প্রকৃত স্বাবলম্বী। **এই স্বাবলম্বনই বুনিয়াদী শিক্ষার কষ্টিপাথর**। আত্মিক স্বাবলম্বনকে ভুলে গিয়ে আর্থিক স্বাবলম্বনকেই যেন বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য বলে কেউ মনে না করেন।

চিন্তা ও কর্ম এই উভয় ক্ষেত্রেই মানুষে মানুষে আদান-প্রদান সম্ভব। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের যে স্তরে শিক্ষা অপরিহার্য সে স্তরে বা সে বয়সের ছেলেমেয়েদের শুধু কর্মের ক্ষেত্রেই মিলন হয় সহজ ও প্রশস্ত। এ-কারণ গান্ধীজী বললেন, বিদ্যালয়সমূহে সৃষ্টি করতে হবে এমন পরিবেশ যেখানে ছেলেমেয়েরা সবাই একত্র মিলে কাজ করার জন্য উৎসাহিত হয়। এক কথায়, বিদ্যালয়সমূহকে রূপান্তরিত করতে হবে শিশুদের এক একটি কর্মক্ষেত্ররূপে। পাঠ্য পুঁথিকে কেন্দ্র না করে বিশেষ বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে শিক্ষার বুনিয়াদ এক অভিনব ধারায়। অর্থাৎ শিক্ষা পুস্তক-কেন্দ্রিক না হয়ে হবে কর্ম-কেন্দ্রিক। মানুষের সহজাত বৃত্তিনিচয় সদাই সৃষ্টি

ও স্থিতি, অর্থাৎ সৃজন ও সংরক্ষণ কার্যকেই সহায়তা করছে। ক্ষুদ্র শিশু থেকে আরম্ভ করেঁ, কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সবাই সৃষ্টির মধ্য দিয়েই খুঁজে বেড়াচ্ছে আত্মবিকাশ বা বিস্তারের পথ। এ প্রয়াসই জীবন। এই বিকাশের সাধনাই মানুষের জীবধর্ম। এ বিকাশের সুযোগ পেলেই জীবন আনন্দে ভরে ওঠে, আর বাধা পেলেই জীবন হয়ে ওঠে বিষময়। সে বিষ ক্রমে সমাজ-দেহে সংক্রামিত হয়ে সমাজকে টেনে নিয়ে যায় ধ্বংসের পথে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, মনের সাথে ইন্দ্রিয়ের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। অতি শৈশবে শিক্ষাকার্যটি শুরু হয় ইন্দ্রিয়ের মারফত। অতএব, শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে নানা প্রকার কর্মের ভিতর দিয়ে শিশুর ইন্দ্রিয়সমূহের পরিচালনার সুযোগ করে দেওয়াই বিজ্ঞানসম্মত। শিশু কাজ চায়, কাজ ছাড়া সে এক মুহূর্তও জেগে থাকতে রাজী নয়। যে কাজ তার ভাল লাগে সেই কাজে তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে সে কখনো কার্পণ্য করে না। কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কোন কাজ করতে বললে, অতি সহজেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং এ ক্লান্তি শিক্ষার পক্ষে বিঘ্নকর।

কাজ করতে করতে শিশু যাতে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে, যাতে কাজের প্রতি তার বিতৃষ্ণা না জন্মায় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যে কাজে কোন বৈচিত্র্য নেই সে কাজেও বেশী সময় সে লেগে থাকতে চায় না। এ-কারণ, শিশুদের কর্মের ভিতর নানা প্রকার বৈচিত্র্যের সমাবেশ থাকা অত্যাবশ্যক। উপাদানের বৈচিত্র্য, বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং ব্যবহারের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োজন, এমন সব কাজই শিশুর চিত্ত অধিক আকর্ষণ করে।

ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ছেলেমেয়েদের জন্য উপাদানের বিভিন্নতার কথাও ভুললে চলবে না। যেমন, পুতুল তৈরির কাজে ৬।৭ বছরের শিশুদের জন্য দরকার কাদা, বালু ইত্যাদি। ৮।৯ বছরের বালক-বালিকাদের জন্য দিতে হবে বাঁশ, বেত, কার্ড-বোর্ড ইত্যাদি। তৃতীয় স্তরের ছেলেমেয়েদের জন্য কাঠ, পাথর ও নানাবিধ ধাতু বা পদার্থের ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে। স্তরভেদে শিল্পের ধারা বদল না করে শুধু উপাদানের হেরফের করলেই অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা। মনে রাখা প্রয়োজন, যে কাজে যত বেশী ইন্দ্রিয় একই সঙ্গে নিয়োগ করার সুবিধা আছে সে কাজই শিক্ষার পক্ষে তত উৎকৃষ্ট। এতে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির সর্বতোমুখী স্ফুরণে সাহায্য করবে, সন্দেহ

নেই। একঘেয়েমি দোষে দুষ্ট কাজ সর্বথা পরিত্যাজ্য। অন্যথায় শিশুর ঔৎসুক্য, আগ্রহ ও সাথে সাথে আনন্দ ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য—শিশুকে আপন চেষ্টায়, আপন চাহিদায়, আপন প্রয়োজনীয় যা-কিছু তা সবই আপনাআপনি শিক্ষা করার সুযোগ দান করা। কারণ, বাইরে থেকে জোর করে শিশুর ঘাড়ে কিছু চাপাতে গেলে, তার মনোজগতে বিপ্লব দানা বেঁধে উঠতে পারে। শিশুর মনের ভারসাম্য একবার নষ্ট হয়ে গেলে সহজে তাকে আর বাগে আনা সম্ভবপর হয় না। চরকা, তাঁত, কৃষিকার্য ইত্যাদি যে-কোন একটি বৃত্তিকে কেন্দ্র করে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, একে একে মাতৃভাষা, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি তাদের কাছে পরিবেশন করতে হবে।

সঙ্গীত, নৃত্য, চারুকলা ইত্যাদি কৃষ্টিগত বিষয়সমূহও যেন কার্যসূচী হতে বাদ না যায়, সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। এত অল্প বয়সে ছেলে-মেয়েদের এভাবে একটা বৃত্তির দিকে ঝোঁক দেওয়া সঙ্গত কিনা এ বিষয় নিয়েও আলাপ-আলোচনার অন্ত নেই। কিন্তু এই শিক্ষার উদ্দেশ্য সত্যি কি ছেলেমেয়েদের একটা-না-একটা বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য করা? যদি তাই হয় তা'হলে তত্ত্বের দিক থেকে এর কোন সদুত্তর দেওয়া যায় কিনা জানি না। তবে সমাজ-গঠনের দৃষ্টি নিয়ে তাকালে বিষয়টি একেবারে উপেক্ষণীয় নয় এ কথাও ঠিক। শ্রমবিমুখতা আজ আমাদের জাতিকে পঙ্গু করে রেখেছে। যে-কোন বৃত্তিঘটিত শ্রমকেই আমরা আজ অত্যন্ত হেয় বলে মনে করি।

মুখে আমরা যত বড়াই-ই করি না কেন, কেবলমাত্র পুঁথির কৌলীন্যের বিচারেই আজও আমাদের সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। এ বিভেদ দূর না হলে সমাজের অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এভাবে কিছু কিছু কায়িক শ্রমের মারফত সবার শিক্ষা শুরু হলে, বড় হয়ে এ-ধরনের কাজের প্রতি তাদের অবজ্ঞার ভাব থাকবে না। এমনি করে শিশু বয়স থেকেই সমাজের সমস্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে শ্রমের প্রতি একটা মর্যাদা-বোধ জাগবে। শ্রমের প্রতি বিমুখ হয়েই আজ আমরা বাবু বনে গেছি। সমাজের এ কল্পিত শ্রেণী-বিভাগ দূর করতে হলে, সর্বাগ্রে **সমস্ত বিদ্যালয়কে রূপান্তরিত করতে হবে শিশুদের কর্মক্ষেত্রে।**

ছেলেমেয়েরা একত্রে কাজ করতে করতে বিদ্যালয় থেকেই তারা

শ্রমের মর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে উঠবে। হাতের কাজকে কেন্দ্র করে সামাজিক ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর সাথে খাপ খাইয়ে, সৃষ্টির আনন্দের মধ্য দিয়ে, এক সর্বাঙ্গ-সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলাই বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ পথ ধরেই গান্ধীজী উদ্যোগী হয়েছিলেন জীবন ও শিক্ষার সাথে একটি যোগসূত্র রচনা করতে। কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা শুরু হলে, কায়িক শ্রমের প্রতি ছেলেমেয়েদের অশ্রদ্ধা ক্রমে লোপ পাবে। হাতের কাজে ছেলেমেয়েদের দেহ ও মনের অসাড়তা কেটে গিয়ে তাদের মধ্যে জেগে উঠবে সৃষ্টির এক অভূতপূর্ব আনন্দ এবং সাথে সাথে আসবে আত্মশক্তিতে তাদের দৃঢ় প্রত্যয়। এসব কাজের মধ্যে তাদের মানসিক বৃত্তিসমূহেরও সম্যক পরিস্ফুরণ আশা করা যায়। অতএব, বৃত্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কিন্তু দেশে কারিগর বা মিস্ত্রীর সংখ্যা স্ফীত করা নয়। বৃত্তিশিক্ষার ভিতর দিয়েই শিশুরা নিজ নিজ প্রয়োজনের তাগিদে আহরণ করবে নানা বিষয়ে জ্ঞান, বৃদ্ধি পাবে তাদের কর্মকুশলতা ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস।

অর্থনীতির বিচারেও এ পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি গান্ধীজী ইঙ্গিত করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন, ছেলেমেয়েদের হাতের কাজগুলো বিক্রি করে যদি কিছু অর্থ আমদানী হয়, তা'হলে সে অর্থে বিদ্যালয়ের নানবিধ উন্নতিবিধান সম্ভবপর হবে এবং তার জন্য আর পরমুখাপেক্ষী হতে হবে না।

এ যুক্তির সারবত্তা নিয়ে আজ পর্যন্ত বহু আলোচনা হয়েছে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে অনেক স্থলেই শেষ পর্যন্ত অর্থের পরিমাণই উৎকর্ষের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দীনতা হতে শিক্ষাকে বাঁচাতে হবে। অতএব, ছেলেমেয়েদের হাতের তৈরী শিল্প-সামগ্রী বিক্রয় করে কি পরিমাণ অর্থ এল সেটাই যেন শেষ পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে না দাঁড়ায়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। অর্থের সাথে শিক্ষার এ বিনিময় কুশিক্ষারই নামান্তর। বৃত্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছেলেমেয়েদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, শ্রমের প্রতি তাদের মর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন করা, বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মকুশলতা অনুশীলনে সহায়তা করা, সর্বোপরি ইন্দ্রিয়সমূহের যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া। অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এ পদ্ধতির বিচারে না বসাই শ্রেয়ঃ।

জ্ঞান সঞ্চয় করে রাখার নিমিত্ত শিশুর জ্ঞানভাণ্ডারে এমন কতকগুলো

ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ নেই তাতে সে তার আহৃত অভিজ্ঞতাসমূহকে আলাদা আলাদা করে লেবেল দিয়ে চিহ্নিত করে সাজিয়ে রাখতে পারে। মানুষের জ্ঞান সজীব পদার্থের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞানভাণ্ডারে রাশীকৃত জ্ঞান স্তূপীকৃত হলেই জ্ঞানের বৃদ্ধি হলো একথা বলা চলে না। বরং স্তূপীকৃত জ্ঞানরাশি জ্ঞান-মুকুলটির বৃদ্ধির পথে অন্তরায়ই হয়ে দাঁড়াবে। আহৃত প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার সাথে একই সূত্রে গেঁথে দিতে হবে, কোথাও যেন ফাঁক থেকে না যায়। কাজেই, এটা অঙ্ক, এটা সাহিত্য, এটা বিজ্ঞান—এভাবে আলাদা করে শিশুদের শেখাতে গেলে তাদের চিন্তার ধারার মধ্যে ফাঁক থেকে যেতে পারে। ফলে, মূল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা অকালে শুকিয়ে যাবে। বৃদ্ধির গতি হবে বিরামহীন। অভিজ্ঞতাসমূহকে একই সূত্রে গেঁথে দিতে না পারলে, জ্ঞান শুধু স্তূপীকৃতই হবে, জ্ঞানের বৃদ্ধি আশা করা যায় না। তাই শিশু-শিক্ষায় **অনুবন্ধ প্রণালীর** (Correlation) উপর এত বেশী জোর দেওয়া হয়।

যে-কোন একটি বৃত্তিকে কেন্দ্র করে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহকে আলাদা না করে একই সূত্রে গেঁথে পরিবেশন করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির এ কাজটিই সবচেয়ে দুরূহ। এই অনুবন্ধ কার্যটি স্বাভাবিক হলে যেমন শিক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হয়, আবার জোর করে গাঁথতে গেলে (Forced Correlation) তা হয়ে পড়ে ততোধিক প্রতিকূল। বিশেষ দক্ষ শিক্ষকের সহায়তায় পূর্বাহ্ণে পাঠ্য বিষয়বস্তুসমূহকে একটি বৃত্তির মারফত স্বাভাবিকভাবে কিরূপে পরিবেশন করা যায় সে কৌশলটি আয়ত্ত করে নেওয়া প্রয়োজন। এও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ সমস্ত তথ্য তাদের পরিবেশন করা যায়, নচেৎ বৃত্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষায় বৃত্তিই শুধু শেখান হবে, অপরাপর বিষয়ে শিশু থেকে যাবে একেবারে অজ্ঞ। প্রত্যেকটি কাজের প্রসঙ্গ এমনিভাবে উত্থাপিত করতে হবে যাতে বিভিন্ন জ্ঞানের প্রয়োজন তারা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারে। এভাবে বিষয় হতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করতে তাদের যেন কোন বেগ পেতে না হয়। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মন ছুটে চলবে নিত্য নূতন জ্ঞানের সন্ধানে। এমনি করেই অনুবন্ধের কাজটি সহজ হয়ে উঠবে।

কাজ করতে করতে যখন যে-কোন বিষয় শিশু জানতে আগ্রহ

প্রকাশ করবে তখনই তাকে সে বিষয়ে সাহায্য করা প্রয়োজন। এ সুযোগটি যাতে সম্যগ্‌রূপে সদ্ব্যবহার করা যায় তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অর্থাৎ এ সুযোগে তাদের চাহিদা এমনভাবে পূরণ করতে হবে, যাতে নূতন নূতন বিষয়ের দিকে তাদের মন আপনিই ধাবিত হয়। মোট কথা, যে-কোন পদ্ধতিই অবলম্বন করা হউক না কেন, উপযুক্ত চালকের হাতে চালিত না হলে সমস্ত শ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। বুনিয়াদী শিক্ষার পদ্ধতি যিনি রচনা করেছেন তাঁর আশা ফলবতী করতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের। কর্মের মাধ্যমে পাঠ্যতালিকার বিষয়বস্তুসমূহ একই সূত্রে গেঁথে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিবেশন করতে হলে শুধু শিক্ষার তত্ত্ব জানলেই শিক্ষকের চলবে না। তার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা এবং সাথে সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতা।

দেশে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা স্ফীত করতে যেয়ে, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের কথা বিশেষ করে আমল দেওয়া হয়নি বলেই আজও বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহ সর্বসাধারণের সমাদর লাভ করতে পারেনি। ছেলেমেয়েদের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পাঠাতে হলে অভিভাবকগণ আজ দশ বছর পরেও যেন ভাবনায় পড়ে যান। অচিরে দেশে উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী না হলে, এ পদ্ধতিকে ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে বলে মনে হয় না।

ধর্ম শিক্ষার একটি অঙ্গ। বুনিয়াদী শিক্ষায় ধর্মকে পাঠ্য তালিকায় স্থান দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু ধর্ম ও সেবা দুই-ই গান্ধীজী-পরিকল্পিত ‘নঈতালিমের’ ভিত্তি। বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহে দিনের কাজ শুরু হয় উপাসনার মধ্য দিয়ে এবং সমাপ্তিও হয় উপাসনান্তে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজকর্ম চলবে সমবায় ও যৌথ প্রণালীতে। সেবাকার্যটি শুধু বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ রাখার কোন যুক্তি নেই। বিদ্যালয়ের পরিবেশ অর্থাৎ আশেপাশের গ্রামসমূহের দুঃস্থ ব্যাধিগ্রস্তদের সেবার ভার নিতে হবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ও ছাত্র-ছাত্রীদের। যে সেবাধর্মের আদর্শ ভারতকে একদা বিশ্বের দরবারে বিশিষ্ট আসনে স্থাপিত করেছিল, বিদেশীর শাসনগুণে আমরা সে সেবাধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছি, আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য। আমরা সবাই হয়ে পড়েছি অতিমাত্রায় স্বার্থপর। সমাজের অপরাপর দশজনের কি গতি হল সেদিকে তাকাবার

ফুরসত বা ইচ্ছা দুয়েরই অভাব। নিতান্ত ব্যথিত হয়েই জাতীয় আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার আকুল আগ্রহে মহাত্মা গান্ধী শিক্ষার এই অভিনব ধারাটি রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার রূপ যেভাবে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তাতে আশঙ্কা হয় যে এর খোল নলচে দুটি-ই না শেষ পর্যন্ত বদলে যায়।

॥ উনিশ ॥

শৃঙ্খলা রক্ষায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা আর বিদ্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করা এক কথা নয়। প্রথমটিকে বলা যেতে পারে শাসন (To maintain law and order) আর দ্বিতীয়টিকে আমরা বলব সুশাসন (Discipline)। একটির সাথে রয়েছে প্রাণের যোগ, আর অপরটি হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রাণহীন শাস্তি। যে বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা শুধু শাস্তির ভয়ে চুপচাপ বসে থাকে, সে বিদ্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা ভাবা ভুল। প্রকৃত শৃঙ্খলা স্বতঃস্ফূর্ত, এবং মূল ইচ্ছাশক্তির সাথে রয়েছে তার গাঁটছড়া বাঁধা। শৃঙ্খলা মানাবার জিনিস নয়, শৃঙ্খলা মানবের নিজস্ব বিধান। আপন প্রয়োজনের তাগিদেই ছেলেমেয়েরা আপনা হতেই শৃঙ্খলার অধীনতা স্বীকার করে নেয়। এর জন্য ভয়-ভীতি বা প্রলোভন দেখাবার কোন প্রয়োজন হয় না। ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুনের বশ্যতা স্বীকার করে নেবে স্বেচ্ছায়, আপন প্রয়োজনে। মনের কোন একটি কোণ থেকে যদিবা প্রতিবাদ উত্থিত হয়, তথাপি আপনা হতেই তারা এ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে যায়। এ সংযম শিশুরা মেনে চলে আত্মবিকাশের তাগিদেই। এই দুনিয়ায় সবাই অল্প-বিস্তর স্বার্থপর, যে কাজে স্বার্থোদ্ধার হয় সে কাজ কাকেও বলে-কয়ে করাতে হয় না। এ শৃঙ্খলাও ছেলে-মেয়েরা স্বার্থোদ্ধারের বাসনায়ই নিজেরা রক্ষা করে চলে।

প্রফেসর নান্ শৃঙ্খলার কয়েকটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে—প্রথমে জাগে ইচ্ছা, তারপর আসে অক্ষমতার উপলব্ধি, উপলব্ধির পর আসে মনোযোগ, ক্রমে জাগে পুনরাবৃত্তির বাসনা এবং পরিশেষে লাভ হয় সফলতা।

এভাবে ধাপে ধাপে প্রকৃত শৃঙ্খলা আপনা হতেই শিশুর মনে স্থায়ী বাসস্থান করে নেয়। ভাল হবার ইচ্ছা যার হয়েছে, ব্যর্থতার অনুভূতি তার থাকবেই। এই ব্যর্থতার অনুভূতিই তাকে প্ররোচিত করবে মনো-

যোগী হতে। এই মনোযোগের সহায়তায় সে উদ্যোগী হবে বার বার সেই কাজটি করতে। অবশেষে একদিন সফলতা লাভ করে সার্থক হবে তার আত্মানুভূতি। সংক্ষেপে, ব্যর্থতার অনুভূতি (Negative self-feeling) হতেই জন্ম হয় সার্থক আত্মানুভূতির (Positive self-feeling)। নান্ সাহেবের মতে, শৃঙ্খলা আনয়নের প্রথম ধাপই হলো নিজেদের অক্ষমতার প্রতি ছেলেমেয়েদের মনোযোগ আকর্ষণ করা। ভাল হবার যখন ইচ্ছা জাগবে, তখন আপন ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি ইঙ্গিত করার সাথে সাথেই তারা সেগুলি সংশোধন করতে কৃতসংকল্প হবে।

শিশু যদি নিজের ক্ষতি নিজে না বুঝতে পারে, তা'হলে ভাল হবার ইচ্ছা তার জাগবে কেন ? ভয় দেখিয়ে বা যুক্তিতর্ক বিস্তার করে তাকে কোন ভাল কাজে প্রলুব্ধ করা গেলেও তার ফল স্থায়ী হয় না। এ শৃঙ্খলা আজ্ঞানুবর্তিতা বা নিষেধাত্মক নয়। ছেলেমেয়েরা যখন বুঝতে পারবে এ নিয়মটি মেনে না চললে তাদের নিজেদের ক্ষতিই অধিক, তখনই শুধু স্বেচ্ছায় তৎপরতার সাথে তারা শিক্ষকের আদেশ হাসিমুখে পালন করবে। নিজের আচরণ অপরের পক্ষে এবং সাথে সাথে নিজের স্বার্থের পক্ষেও প্রতিকূল এ জ্ঞান হলে আপন চেষ্টায়ই সে সংযত হবে। যখন ছেলেমেয়েরা নিজে ভাল হব এই আকাঙ্ক্ষায় আগ্রহ সহকারে বিদ্যালয়ের সমস্ত নিয়ম-ব্যবস্থা নিজেরা তো মেনে চলবেই, এমনকি অপরকেও মেনে চলতে প্ররোচিত করবে, তখনই শুধু বলা চলে—এ বিদ্যালয়টিতে সুশাসন (Discipline) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ যে অবস্থার বা আবহাওয়ার সৃষ্টি হলে ছাত্রছাত্রীরা স্বেচ্ছায় বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন মেনে চলে, তাকেই বিদ্যালয়ের সুশাসন বলা চলে।

শৃঙ্খলা ভিন্ন জগতে কোন মহৎ কাজই সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ যেখানে নানা রকমের ছেলেমেয়ে একত্রিত হয় একই উদ্দেশ্য নিয়ে, সেখানে সুশাসন বজায় না থাকলে কোন প্রকারের শিক্ষাদান কার্যই সম্ভবপর নয়। সুশাসন বজায় না থাকলে কোন বিদ্যালয়ের কাছ থেকেই সুশিক্ষা আশা করা যায় না। যে বিদ্যালয়ে সুশাসনের অভাব সেখানকার ছেলেমেয়েরা সমাজে প্রবেশ করেও সবার সাথে মিলে মিশে সুশৃঙ্খলভাবে কোন কাজই করতে পারে না। বিদ্যালয়ে সুশাসন চালু রাখাই প্রধান এবং জটিল সমস্যা। সুশাসন-ব্যবস্থার সাথে শিক্ষাদান-পদ্ধতির অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য যেখানে, 'যেন তেন প্রকারেণ' নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রীর মস্তিষ্ক প্রয়োজনীয় নানা তথ্যে ভারাক্রান্ত করে দেওয়া, সেখানে শাস্তির ভয় দেখিয়ে বা প্রলোভনে ভুলিয়ে তাদের কিছুকাল বশে রাখতে পারলেই চলে যায়। পরিণাম ভেবে দেখার অবকাশ বা ইচ্ছা এ দুয়েরই সেখানে অভাব। এসব ক্ষেত্রে দমন নীতিই সবচেয়ে বেশী কার্যকরী। অতএব এ নীতির পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা আজও দেশে বিরল নয়। "Spare the rod and spoil the child"—এ নীতি-বাক্যের প্রতি আকর্ষণ আজও আমাদের অনেকেরই আছে। বর্তমানে লেখাপড়ায় ছেলেমেয়েদের অমনোযোগিতার কারণ যে, স্থানে স্থানে বেতমারার প্রথার বিলুপ্তি, এতে অনেকেরই সন্দেহ নেই। উপদেশ-ছলে অনেক অভিভাবকের কাছ থেকে শুনতে হয়েছে—মশাই শাসন করুন, শাসন করুন, লাই দিয়ে যে ছেলেমেয়েদের মাথা খাচ্ছেন। অনেকেই বিজ্ঞের মত প্রচার করে বেড়ান—বেত তুলে দিয়ে লেখাপড়ার দফা রফা করা হয়েছে। শাসন ছাড়া কি শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়? কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন,—শৃঙ্খলা রক্ষা করার জিনিস নয়, শৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে ছেলেমেয়েরা নিজে।

বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী পেস্টালৎসি (Pestalozzi) বললেন, শিশুকে ভালবেসে তার মন জয় করে তাকে নিয়মানুগ করাই বিজ্ঞানসম্মত উপায় ("Discipline must be based on and controlled by love")। শাস্তির ভয় দেখিয়ে ইতর প্রাণীকে ক্রমশঃ বশে আনা খুব শক্ত নয়। কারণ তাদের মন বা বুদ্ধি বলে কোন-কিছুর অস্তিত্ব থাকলেও মানুষের মত অত পরিণত তো নিশ্চয়ই নয়। শুধু শাসনের দ্বারা মানবশিশুর মন জয় করা তো সম্ভব নয়ই বরং শাসকের উপর ক্রমে তার মনে বিতৃষ্ণা জন্মাতেই সাহায্য করে অধিক। তা বলে শাসনের ভয় একটু থাকার প্রয়োজন আছে বৈ কি। রবীন্দ্রনাথ গুছিয়ে বললেন—"শাসন করা তারই সাজে সোহাগ জানে যে গো।"

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা আনয়ন করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব। শিক্ষকগণের, বিশেষ করে প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব (Personality) না থাকলে, সে বিদ্যালয়ে সুশাসনের আশা সুদূর-পরাহত। অপরকে নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবান করতে হলে পূর্বাহ্নে নিজেকে কঠোরতার সাথে নিয়ম মেনে

চলতে হয়। উপদেশের চেয়ে উদাহরণ অধিকতর কার্যকরী। শিক্ষকগণের চরিত্র ছাত্রছাত্রীদের নিকট এক একটি জীবন্ত উদাহরণ। শিক্ষকের চরিত্র আদর্শ চরিত্র হওয়া চাই। তবেই তো তার প্রভাবে আপনাআপনি ছেলেরা চরিত্রবান হয়ে উঠবে। ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের ব্যবহার এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে ছাত্রের মনে যুগপৎ ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার উদ্রেক হয়। মোট কথা, বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়মানুগ করতে হলে বাইরের চাপে কোন স্থায়ী ফল আশা করা যায় না। ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ছেলেমেয়েদের মনে নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা আপনা হতেই জাগ্রত হয় এবং তার ফলও হয় স্থায়ী।

আর একটি কথা—"An idle brain is the devil's workshop." এ প্রবচনটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকলে, বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় রাখার কার্যটি অত্যন্ত সহজ ও সরল হয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েরা কাজ চায়। কাজ ছাড়া তারা এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। অতএব হাতে কোন কাজ না থাকলে, প্রায়ই দেখা যায় তারা কোন অনর্থ ঘটিয়ে বসেছে। যখনই বুঝবে এখন আর কিছু করার নেই, তখনই তারা এলোমেলো ভাবে চলতে শুরু করবে। এমনভাবে সুচিন্তিত কার্যসূচী পূর্বাহ্নে তাদের জন্য তৈরি করে রাখতে হবে যাতে, কাজ শেষ হয়ে গেছে, আর কিছু এখন করবার নেই, একথা তারা ভাববার সুযোগ না পায়। এর জন্যই "Leisure time activities of the children" সমস্যাটির দিকে বর্তমানে শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে।

অবসর সময় অতিবাহিত করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের জন্য কতকগুলো ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা শৃঙ্খলা-রক্ষায় অপরিহার্য। অবসর সময় যদি তারা যার যার মনোমত কাজ করার সুযোগ পায়, তাহলে শৃঙ্খলা-ভঙ্গের দিকে তাদের ঝোঁক কমে যাবে। কি গৃহে, কি বিদ্যালয়ে, ছেলেমেয়েদের সকল সময় কাজে আবদ্ধ রাখার চেষ্টাই শৃঙ্খলা আনয়নের প্রকৃষ্ট পন্থা। সমস্ত দিন তাদের কাজে ব্যাপৃত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে নানা প্রকার খেলাধুলা, সুসজ্জিত পাঠাগার, উপযুক্ত ব্যায়ামাগার, শিক্ষণীয় ছায়াচিত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা অতীব প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের এই সব ক্রিয়াকলাপসমূহ এমন আকর্ষণীয় করে রাখতে হবে, যাতে ছাত্রছাত্রীদের মন সকল সময় বিদ্যালয়েই পড়ে থাকে। স্কুল ছুটির পর গৃহে ফিরে গেলেও ভাবনা থাকবে কতক্ষণে আবার স্কুলে ফিরে আসবে। তা'হলে গৃহে ফিরে গিয়েও তারা শৃঙ্খলার

পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত হবার অবকাশ পাবে না। এ কাজে শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দের মিলিত চেষ্টাই সুফল আনয়নে সক্ষম। অতএব, অগৌণে ছেলেমেয়েদের অবসর বিনোদনের সুচিন্তিত কর্মপন্থা গ্রহণ করা হলে বিদ্যালয়ে সুশাসন আপনা হতেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা আনয়নের মূলনীতি হলো, ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্বের যথাযথ সম্মান দান। **মানুষের ব্যক্তিত্বকে অবহেলা করে তার মনের উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করা সম্ভবপর নয়।** ছেলেমেয়েদের সাথে এমন ব্যবহার করতে হবে যাতে তাদের ব্যক্তিত্ব কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয়ে বরং তাদের আত্মসম্মান-বোধ ক্রমশঃ জেগে ওঠে। একবার তাদের দায়িত্ব-বোধ জাগাতে পারলে আর কোন ভাবনা নেই, বাকী কাজ তারা নিজেরাই সামলে নেবে। ছাত্রছাত্রীদের সাথে সর্ববিষয়ে সহযোগিতা, বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, মনিটর, প্রিফেক্ট, নায়ক, স্কোয়াড লিডার ইত্যাদি নির্বাচনের মধ্যমেই এ কার্যে অগ্রসর হওয়া সুবিধাজনক। একবার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপাতে পারলে তবে তো তাদের দায়িত্বজ্ঞান জন্মাবে। তারপর নানা প্রকার সমাজসেবামূলক কার্য স্বাধীনভাবে সংগঠন করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত করতে হবে। এইভাবে স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই ক্রমে তারা নিয়মানুগ হয়ে উঠবে। অবশ্য, এ স্বাধীনতার অর্থ যেন উচ্ছৃঙ্খলতা বলে ভুল না করি।

স্বাধীনভাবে আনন্দের সঙ্গে সংগঠনমূলক কর্মের মাধ্যমে ক্রমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একতাবোধ জাগ্রত হবে, একে অপরের জন্য ভাবতে শিখবে, বিদ্যালয়-সমাজের এক একজন সভ্য বলে নিজেরা গর্ব অনুভব করবে এবং বিদ্যালয়ের গৌরবে নিজেরা গৌরবান্বিত বলে মনে করবে। বিদ্যালয়ের সর্বপ্রকার সুনাম রক্ষার ভার যখন ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের কাঁধে তুলে নেবে, তখন বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বেত্রহস্তে শিক্ষক মহাশয়দের আর ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে না। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রকৃত সুশাসন বজায় রাখতে হলে এ পথই সহজ ও প্রশস্ত। বিদ্যালয়ে এমন সব আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে ছেলেমেয়েরা আপনা হতেই বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে, বিদ্যালয় তাদের নিজেদের এবং এখানকার সবকিছু কাজই নিজের কাজ মনে করে করতে তারা অভ্যস্ত হবে।

এস্থলে, একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন—বিদ্যালয়ের সমাজ ও গৃহের সমাজ এ দুটির আদর্শ যেন দুমুখী না হয়। এ দুটির আদর্শ যদি পরস্পর বিপরীতমুখী হয়, তা'হলে এত অল্প বয়সেই দোটানায় পড়ে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠবে। বিদ্যালয় হতে গৃহে ফিরে যদি আবার নূতন করে তাদের খাপ খাইয়ে চলতে শিখতে হয়, তা'হলে শিশুমনের ভারসাম্য অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে। একটি আবেষ্টনীর প্রভাব যদি অপর অবেষ্টনীর প্রভাবে ক্রমাগত নষ্ট হয়ে যায়, তা'হলে লাভের ঘরে শুধু শূন্যই পড়ে থাকবে। গৃহ পরিবেশের নানা দল উপদল একবার শিশুমনের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম হলে, বিদ্যালয় পরিবেশের রেশটুকু ক্রমে স্তব্ধ হয়ে যাবে। **অতএব শিশু-শিক্ষায় শিক্ষক ও অভিভাবকের পূর্ণ সহযোগিতা থাকা চাই।**

অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সামান্য একটু বিশৃঙ্খলা দেখলেই আমরা একেবারে হতাশ হয়ে পড়ি। কিন্তু মাঝে মাঝে এরূপ রেচকের (catharsis) প্রয়োজন আছে বৈকি! অতিরিক্ত জমাট বাষ্প বেরিয়ে যাবার জন্য সেফ্‌টিভাল্‌ভ-এর ব্যবস্থা না থাকলে যেমন বাষ্পের চাপ থেকে বয়লারটিকে রক্ষা করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি ছেলেমেয়েদের জীবনীশক্তির মাঝে মাঝে বহিঃপ্রকাশের জন্য এমনিধারা কতকগুলি উপায় না থাকলেও তাদের মনের ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব যাঁদের হাতে ন্যস্ত তাঁদের সদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শিশু শিশুই, শিশুর কাছ থেকে বয়স্কের আচরণ প্রত্যাশা করলে তার উপর অবিচারই করা হবে। এদের মাঝে মাঝে একটু-আধটু উচ্ছৃঙ্খল হতে দেখলেও হাল ছেড়ে দেবার কোন কারণ নেই।

বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় রাখতে হলে সর্বাগ্রে ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনতা দিতে হবে। তাদের সাথে মিলে মিশে তাদের মনের গোপন খবর জেনে নিতে হবে। তাদের মনের গোপন খবর না জেনে, তাদের আচরণের অন্তর্নিহিত কারণ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল না হয়ে, তাদের বিচার করা অবিচারেরই নামান্তর। মাঝে মাঝে দেখা যায় কোন কোন ছাত্রছাত্রী কিছুতেই যেন শৃঙ্খলা মেনে চলতে চায় না। শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেই যেন তারা অধিক আনন্দ পায়। এরা এক একটি Problem-child। এসব Problem-childদের সংশোধনের ভার মনোবিজ্ঞানীদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়। মনোবিজ্ঞানীরা

আজকাল দৃঢ়ভাবে এ-মত পোষণ করেন যে, শিশু-জীবনের কোন অবরুদ্ধ আবেগই পরবর্তী জীবনের বহু অসঙ্গতির (mal-adjustment) কারণ।

মনঃসমীক্ষণের (Psycho-analysis) সাহায্যে শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্বের সংবাদ অবগত হয়ে অনুরূপ ভাবে তার সাথে আচরণ করে, তাকে আবার সহজভাবে মানিয়ে চলতে বিশেষ সাহায্য করা যায়। দেখা গেল, একটি ছেলে প্রায়ই স্কুল থেকে পালিয়ে যায়। তাকে অনর্থক শাস্তি দিলে কি হবে! নিশ্চয়ই স্কুলে তার মন বসে না। বাইরের কিসের আকর্ষণে রোজ সে পালিয়ে যায়, সেটা আবিষ্কার করাই হবে শিক্ষকের সর্বপ্রথম কাজ। বাইরের আকর্ষণের চাইতে বিদ্যালয়ের আকর্ষণ বাড়াতে না পারলে, শুধু শাসন করে কি তাকে বশে আনা যাবে? শিশুর অফুরন্ত প্রাণশক্তি যেথায় বিকাশ লাভ করার পূর্ণ সুযোগ পায়, সেদিকেই শিশু ধাবিত হয়। এতে শিশুর অপরাধ কোথায়? তার প্রাণশক্তি বিকাশের পূর্ণ সুযোগ করে দেবার চেষ্টা না করে জোর করে তাকে আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা পণ্ডশ্রমেই পর্যবসিত হবে সন্দেহ নেই। এসব কাজে চাই শিক্ষক ও অভিভাবকের মিলিত চেষ্টা আর চাই ছাত্র ও শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক। যে শিক্ষক বা শিক্ষিকা প্রেম-প্রীতি দিয়ে ছাত্রছাত্রীর মন জয় করতে অক্ষম তাঁদের হাতে শিশুদের সংশোধনের ভার ছেড়ে না দেওয়াই সঙ্গত। সস্তা রাজনীতিতে স্কুলের কচি কচি ছেলেমেয়েদের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করার একটা রেওয়াজ বর্তমানে এদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত। কোমলমতি বালক-বালিকা যারা রাজনীতির অর্থ বোঝে না, হবু নেতাদের পাল্লায় পড়ে দিন কয়েক তারা অবাধে চলাফেরা করার সুযোগ পায়। তারপর বিদ্যালয়ে এসে, সহজে সে-পরিবেশে নিজেদের আর খাপ খাওয়াতে তারা পারে না। কিছুদিন উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করে এসে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা তখন তাদের মনে পীড়া দেয় এবং এ বিষক্রিয়া ক্রমে বিদ্যালয়ের অপরাপর ছেলেমেয়েদের মধ্যে সংক্রামিত হতে শুরু করে। রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা, আর রাজনীতির জ্ঞান থাকা এক কথা নয়। রাজনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন বলে, স্কুলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তাকে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার উপদেশ বোধ হয় কেউ দিবেন না। এ সস্তা রাজনীতি দেশে যে কি অমঙ্গল ডেকে আনছে তা উপলব্ধি করার সময় হয়েছে বলে মনে হয়। এভাবে সকলের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন বিদ্যালয়ে সত্যিকারের সুশাসনের আশা দুরাশা মাত্র।

বর্তমানে ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। প্রতিকারের চেষ্টায় দেশের মনীষিবৃন্দ উদ্বিগ্ন। এ-ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা যেন সংক্রামক ব্যাধির মত প্রত্যেকটি দেশেই আজ আত্মপ্রকাশ করছে। এর মূল কারণ অনুসন্ধান করলে দেখব—বিভ্রান্তিই এর মূলে। দেশের ছাত্রসমাজ আজ অনুসরণীয় কোন আদর্শ তাদের সম্মুখে পাচ্ছে না। এ আদর্শচ্যুতিই তাদের করে তুলছে আজ উচ্ছৃঙ্খল। সবার মনেই আজ এ জিজ্ঞাসা—কোথায় এলাম? চলেছি কোথায়? পুরাতন বিশ্বাসকে সবাই ধুয়ে মুছে ফেলেছে, অথচ নূতন কোন বিশ্বাসকেও মনেপ্রাণে আঁকড়ে ধরতে পারছে না। মজ্জমান ব্যক্তির মত বাঁচার আশায় সবাই যেন এলোমেলো হাত-পা ছুড়ছে। এ কঠিন ব্যাধি হতে ছাত্রসমাজকে রক্ষা করতে হলে জাতির এ চলার পথে একটু দম নিয়ে, লক্ষ্য স্থির করে আবার চলা শুরু করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

॥ কুড়ি ॥

প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির ব্যর্থতা ও তার প্রতিকার

শিক্ষার কাঠামো হতে প্রচলিত পরীক্ষারূপ বিভীষিকা অগৌণে দূর করতে না পারলে দেশের মনীষার অপচয় রোধ করা সম্ভবপর হবে বলে মনে হয় না—এ-ধরনের একটি উক্তি আজকাল অনেকের মুখেই শোনা যায়। পুস্তকে লিখিত কতকগুলো অভিজ্ঞতা মুখস্থ করে যে পরীক্ষার খাতায় লিখে আসতে পারল না তার অশেষ দুর্গতি। তার কপালে আর পাসের মার্ক জুটবে না কিছুতেই। এ যেন অনেকটা কপাল-ঠোকা লটারি খেলার মত। বৎসরান্তে একশত ছেলেমেয়ের মধ্যে হয়ত পঞ্চাশজনের এই মার্ক লাভের সৌভাগ্য হলো। বাকী পঞ্চাশজন মার্ক হতে বঞ্চিত হয়ে ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ল। এভাবে এদেশের কত ছেলে-মেয়ে যে জীবনে হতাশ হয়ে নিজের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকতে যেয়ে অকাল-মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করছে, সমাজে অনাদৃত অবহেলিত হয়ে শেষ পর্যন্ত অপরাধীর তালিকায় নাম লেখাচ্ছে তার নিদর্শন খবরের কাগজে বিরল নয়। অথচ প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতি যে কত ত্রুটিপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে তা আজ আর কারো অজানা নেই। যে মাপকাঠি দিয়ে মেপে আমরা মার্ক দিচ্ছি তা মোটেই নির্ভরশীল নয়। এসব জেনেও আমরা এতই রক্ষণশীল যে আজ পর্যন্ত তার কোন পরিবর্তন বা সংস্কার করতেও যেন সাহস পাচ্ছি না! এর মূলে রয়েছে জাতির নির্জীবতা বা প্রাণহীনতা। ভাল জেনেও কিছু গ্রহণ করতে পারছি না আবার মন্দ জেনেও তা বর্জন করতে সাহস পাচ্ছি না। সমাজের এ স্থিতিশীলতা সমাজকে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথেই নিয়ে যাচ্ছে বৈকি!

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি শুধু পরীক্ষায় পাস করা? পরীক্ষা লক্ষ্যে উপনীত হবার একটি উপায় মাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা সেই উপায়কেই আজ একমাত্র লক্ষ্য বলে প্রায় মেনে নিয়ে বসে আছি। প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিকের ভাষায় ব্যক্তি-সাপেক্ষ (Subjective) পরীক্ষা বলা হয়। এ পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয় ছাত্রছাত্রীর গুণাগুণের উপর যতটা

নির্ভর করে, পরীক্ষকের মেজাজ, মর্জি ও জ্ঞানের পরিধির উপরও তার চেয়ে কম নির্ভর করে না। পরীক্ষক যতই ন্যায়পরায়ণ বা অভিজ্ঞই হউন না কেন, একই পরীক্ষক একই উত্তরপত্রে বিভিন্ন সময় হয়ত বিভিন্ন নম্বর দিয়ে বসেন। গবেষণার দ্বারা এ সত্যই আবিষ্কৃত হয়েছে।

ব্যালার্ড (Ballard), ভ্যালেনটাইন (Valentine), হার্টগ (Hartog) প্রভৃতি মনীষিগণ এ-ধরনের গবেষণা করে কয়েকটি মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। Toronto University-র ইংরেজী বিভাগে যে বছর একটি ছেলে একটি রচনা লিখে ৮০ নম্বর পেল, ঠিক তার পর বছরই ঐ রচনা হুবহু নকল করে লিখে অপর একটি ছেলের ভাগ্যে জুটল মাত্র ৩৯ নম্বর। তারপর এও দেখা যায় যে, হস্তাক্ষরের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নম্বর নেই অথচ একই উত্তর লিখে ভাল হস্তাক্ষরওয়ালা ছেলে পেল ৭০ নম্বর এবং মন্দ হস্তাক্ষরযুক্ত ছেলের ভাগ্যে জুটল মাত্র ৫০ নম্বর। ব্যালার্ড ৭টি রচনার প্রত্যেকটি ১৩ জন সুদক্ষ অভিজ্ঞ শিক্ষকের দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে দেখলেন, উৎকৃষ্টতার ক্রমানুসারে ঐগুলি সাজালে একই রচনা প্রথম স্থান হতে সপ্তম স্থান পর্যন্ত প্রত্যেকটিই অধিকার করেছে। একজন পরীক্ষকের নিকট যে রচনাটি সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছে, অপর পরীক্ষকের নিকট সেইটিই হয়ত অতি সাধারণ বলে গণ্য হয়েছে। অতএব চল্‌তি রচনামূলক পরীক্ষার ফলাফল অনেকটাই নির্ভর করছে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত রুচি, বিচার-বুদ্ধি, মেজাজ ও মর্জির উপর।

এসব দেখে শুনে Manchester University-র শিক্ষাদপ্তর বহু গবেষণার পর স্থির করলেন যে, একই উত্তরপত্র অন্তত চারিজন পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষান্তে প্রাপ্ত নম্বরের গড় করে নিলে কতকটা নির্ভরযোগ্য পরিমাপে পৌছান সম্ভব। এ ভিন্ন, রচনামূলক পরীক্ষা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থীর মুখস্থ শক্তির যাচাই করার প্রচেষ্টাতেই পর্যবসিত হয়। রুচিজ্ঞান, সাহিত্যের রসবোধ, স্বাধীন প্রকাশের ভঙ্গিমা ইত্যাদি বৃত্তিসমূহের পরিমাপ করার ব্যবস্থা প্রচলিত পদ্ধতিতে নিতান্ত অপ্রচুর।

পরীক্ষা একটি কৌশল মাত্র, যার সাহায্যে মানবের সহজাত বৃত্তি, আহৃত জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদির মোটামুটি পরিমাপ করার চেষ্টা করা যায়। তারপর ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাও জানতে ইচ্ছা করে কে কার চেয়ে বেশী

ভাল, শিক্ষকও উৎসুক হয়ে থাকেন তাঁর পাঠদান-পদ্ধতি কতটুকু কার্যকরী হচ্ছে, অভিভাবকও আগ্রহান্বিত হন ছেলেমেয়েদের উন্নতি বা অবনতি হচ্ছে তার খবর জানতে। এসব কারণে শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোন-না-কোনরূপ একটি পরিমাপের ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। শ্রেণী-প্রমোশনের জন্যও একটি মাপকাঠি থাকা প্রয়োজন বৈকি! মোট কথা, বিদ্যালয় পরিচালনায় যে-কোন একটি পরীক্ষার ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই, সর্বোপরি শিশুর পঠন বিষয়ে নির্দেশ দান করাই সবচেয়ে বড় কথা। পাঠদানের সাথে সাথে শিক্ষার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে একটা হদিস দিতে হলেও (Educational & vocational guidance) চাই বিজ্ঞানসম্মত একটি পরিমাপের ব্যবস্থা। অতএব যাতে এ বিষয়ে যতটা সম্ভব নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায় তার জন্য প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োজনানুরূপ সংস্কারসাধনে অযথা বিলম্বের কোন হেতু নেই। এ বিষয়ে গবেষণার দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছে যে একই সাথে তিন প্রকার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হলে কতকটা সঠিক পরিমাপ সম্ভবপর হয়।

প্রচলিত রচনামূলক (Essay type) পরীক্ষা, নূতন প্রণালী বা বস্তু-কেন্দ্রিক (New type or Objective type) পরীক্ষা এবং প্রয়োগসিদ্ধ আদর্শীকৃত পরীক্ষা (Standardized intelligence and scholastic test)—এই তিন প্রকার পরীক্ষার ব্যবস্থাই ক্রমে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে চালু হওয়া প্রয়োজন। রচনামূলক পরীক্ষায় পরীক্ষকের যে প্রভাব রয়েছে তা সম্যগ্‌রূপে নিরস্ত করবার জন্য আমদানি করতে হয়েছে নূতন প্রণালীর পরীক্ষা। এ প্রণালীতে অনুমান, অনিশ্চয়তা, অনুগ্রহ, নিগ্রহ, খেয়াল, খুশি ইত্যাদির স্থান নেই। পরীক্ষার্থীর ন্যায্য প্রাপ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয় না। একই উত্তরপত্র যে-কোন পরীক্ষকের হাতেই সমান নম্বর পাবে। যদিও objective type questions তৈরি করতে বিশেষ বিবেচনা ও অধ্যবসায় প্রয়োজন, তথাপি প্রশ্নপত্র একবার তৈরি করে নিতে পারলে বার বার সঙ্গোপনে প্রশ্নপত্র তৈরি করার প্রয়োজনও হয় না। অবশ্য এ পদ্ধতিতেও পরীক্ষার্থীর মৌলিকত্ব, ভাষার নৈপুণ্য, প্রকাশ-ভঙ্গিমা ইত্যাদি প্রদর্শনের কোন স্থান নেই। তথাপি পরিমাপ্য বিষয়টি প্রায় নির্ভুলভাবেই পরিমাপ করার সুবিধা এতে রয়েছে।

তারপর, প্রয়োগসিদ্ধ আদর্শীকৃত পরীক্ষার সাহায্যে বিদ্যার্থীর বুদ্ধি

ও তৎসহ অর্জিত জ্ঞানের একটা তুলনামূলক মান নির্ণয় করা সম্ভবপর। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক্, কোন পরীক্ষায় অঙ্কে পাসের নিম্নমান হলো ৩০ নম্বর। একটি ছাত্র এ পরীক্ষা-পদ্ধতিতে পেল মাত্র ৩৬ নম্বর। স্বভাবতঃই বলা যেতে পারে যে ছাত্রটি কোন প্রকারে উতরে গেছে। কিন্তু যদি পূর্বাহ্ণে জানা থাকে উক্ত পরীক্ষায় সে শ্রেণীর লব্ধ গড় সংখ্যামান মাত্র ২৫ নম্বর, তা'হলে যে ছেলে ৩৬ নম্বর পেয়েয়ে সে ছেলেকে ভাল ছেলের মধ্যে গণ্য করতে দোষ কি ?

এভাবে উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করে কাজে অগ্রসর হলে অনেকটা নির্ভুল পরিমাপ সম্ভবপর হতে পারে। তারপর, বছরে মাত্র দুইটি কি তিনটি পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থাও সমর্থনযোগ্য নয়। দৈবাৎ যদি কোন পরীক্ষার্থী অসুস্থতার দরুন কোন পরীক্ষা গ্রহণকালে উপস্থিত হতে না পারে তা'হলে তাকে আর আলাদা সুযোগ দেবার কোন ব্যবস্থা এতে নেই। প্রশ্নপত্রের ভুল ব্যাখ্যা, বিহ্বলতা, অপ্রস্তুত ভাব ইত্যাদির কোন কৈফিয়ৎ গ্রহণের সুযোগও এতে নেই। অনেক ক্ষেত্রেই জীবনের ব্যর্থতার উপলব্ধি, অবসাদ, দ্বন্দ্ব ও বিপর্যয় ইত্যাদির জন্য এ নিয়মের পরীক্ষা-ব্যবস্থাকেই দায়ী করা যেতে পারে।

তাই বলে বস্তু-কেন্দ্রিক পরীক্ষা-পদ্ধতিতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই একথা বলা চলে না। কিন্তু এ পরীক্ষায় যে-কোন পরীক্ষকের সাহায্যে পরীক্ষা করালেও প্রাপ্ত নম্বরের কোন হেরফের হবার উপায় নেই। রচনামূলক ও নূতন পদ্ধতি এ দু'য়ের সমন্বয় সাধন করে নিলে পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রতিভার পরিমাপ মোটামুটি সম্ভবপর। এতদ্ভিন্ন, প্রয়োগসিদ্ধ পরীক্ষার ফলাফল জানার পর এ তিনটি পরীক্ষার ফলাফল পাশাপাশি রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায় বৈকি! শ্রেণী-প্রমোশনের বেলায়ও শুধু মাত্র একটি বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত নয়। সাপ্তাহিক পরীক্ষার ফলাফল, শ্রেণীর নজির, শিক্ষক মহাশয়গণের ব্যক্তিগত মতামত—এসব মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিচার করা অধিক বিজ্ঞানসম্মত।

বর্তমানে কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রকার মনীষার ধারাবাহিক বিবরণ, তাদের স্বাস্থ্য, তাদের সামাজিক ব্যবহার ও রীতিনীতি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদিরও একটি বিশদ তালিকা (Cumulative Record) রাখার

ব্যবস্থা হয়েছে। ছেলেমেয়েদের বিচারের বেলায় এ বিবরণের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া সঙ্গত। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেই বিদ্যালয় ত্যাগের সময় বিদ্যালয় থেকে ঐরূপ একটি নিদর্শন পত্র দেওয়া প্রয়োজন। তারপর ঐ নিদর্শন পত্রের (School Record) উপর ভিত্তি করেই Public examination-এর ফলাফল নির্ণয় করা সঙ্গত। এই Cumulative Record রাখার পদ্ধতি প্রতিটি বিদ্যালয়ে অগোণে চালু হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইভাবে ক্রমে প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির ব্যর্থতার হাত হতে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বাঁচাতে হবে। একক কোন পরীক্ষাই নির্ভুল পরিমাপ করতে সাহায্য করে না, এ কথা ঠিক। আবার একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, পরীক্ষার উদ্দেশ্য শুধু যাচাই করে মার্কা দেওয়াই নয়।

শিশুর সহজাত বৃত্তি ও অর্জিত জ্ঞানের একটা হিসেব পেলে, তাকে পঠন বিষয়ে নির্দেশ দান এবং সাথে সাথে তার উপযুক্ততা অনুসারে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থারও একটা হদিস পাওয়া যেতে পারে। শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দিতে হলে, প্রথমেই জানতে হবে তার সামর্থ্যের সীমা এবং সাথে সাথে তার যোগ্যতা। যে ভাবে এবং যে পথে চালিত হলে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব, তার একটা সন্ধান পাবার উদ্দেশ্যেই নানাপ্রকার পরীক্ষার ব্যবস্থা। কিন্তু যেমন-তেমন করে একটা পরীক্ষা নিয়ে সাত তাড়াতাড়ি একটা মার্কা দিয়ে দিতে পারলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হলো বলে আমরা মনে করি। সেইজন্য ছেলেমেয়েরাও ঐ মার্কা পাবার লোভেই জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার কোন চেষ্টা না করে দিনরাত খেটে পরীক্ষা-পাসের কৌশলটিই শুধু আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ একমাত্র পরীক্ষাই শেষ পর্যন্ত শিক্ষার নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়।

পরীক্ষা শুধু অর্জিত বিদ্যার কয়েকটি দিকের পরিমাপক যন্ত্র-বিশেষ নয়, পরীক্ষা শিক্ষার নিয়ন্ত্রকও বটে। পরীক্ষা শুধু চাকরি লাভের উপযুক্ততার মার্কা দেবার চেষ্টা নয়, পরীক্ষা সত্যি সত্যি রোগের নিদান স্বরূপও বটে। শিশুর ভিতর কতটুকু শক্তি আছে তা জানতে হলে এবং তাকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দিতে হলে, কোন-না-কোনরূপ একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা শিক্ষার একটি অঙ্গ স্বরূপ। পরীক্ষা শিশুর যোগ্যতা জানতে সাহায্য করে এবং প্রতিকারের বিভিন্ন উপায়ের সন্ধানও দেয়। পরীক্ষা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষায়তন ও শিক্ষা-প্রণালীর গুণাগুণ ও মূল্য নির্ধারণে

সহায়তা করে, এবং সর্বশেষে শিক্ষার্থীর সাফল্য লাভ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করারও দাবি রাখে।

যে দেশের শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু চাকরি করার যোগ্যতা অর্জন করা, সে দেশে পরীক্ষা লওয়ার উদ্দেশ্যও শুধু যাচাই করে মার্কা দেওয়া। এ মার্কা না পেলে সমাজের সবার কাছেই যে অপদার্থ বলে আখ্যা লাভ করবে এ আতঙ্কেই দেশের ছেলেমেয়েরা প্রাণপণ পরিশ্রম করে শুধু পরীক্ষার গণ্ডিটি অতিক্রম করতে। জ্ঞানলাভের জন্য তাদের কোন স্পৃহা থাকতে পারে না। শিক্ষকমহাশয়গণও সে সুযোগ তাদের দেন না। কেননা শিক্ষকের উপযুক্ততার মাপকাঠিও সেই একই রকম—কোন্‌ বিদ্যালয়ে ক'টা ছেলে পাস করল, শুধু এটা জানলেই হলো, মানুষ হলো ক'টা সে খবর জানবার দরকার নেই।

যদি বিদ্যালয়ের পাসের হার নিতান্ত কম দেখা যায়, অমনি রায় বেরিয়ে যায় যে, সে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। অথচ প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থা যে কত ত্রুটিপূর্ণ তা কিন্তু সবাই আমরা জানি। তাই প্রচলিত পরীক্ষারূপ প্রহসনের হাত হতে শিক্ষাকে বাঁচাবার চেষ্টা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাধন করে এবং একমাত্র পরীক্ষার ফলাফলকেই ভিত্তি না করে যদি আমরা ছাত্রছাত্রীদের বিচারে প্রবৃত্ত হই, তা'হলে অচিরেই তাদের মন হতে পরীক্ষার বিভীষিকা অন্তর্হিত হবে। শিক্ষার রাজ্য হতে পরীক্ষা-ভীতি অপসারিত হলে ছেলেমেয়েরা মনের আনন্দে যার যে বিষয়ে দক্ষতা সেই বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করতে আগ্রহান্বিত হবে। সেইদিন থেকেই হবে দেশে প্রকৃত শিক্ষার সূত্রপাত।

॥ একুশ ॥

শিক্ষার সংস্কার

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একটি জাতিকে গড়ে তুলতে হলে—বিশ্বের দরবারে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে—সবার আগে শিক্ষার সংস্কারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ কোথায় তা খুঁজে বের করে সর্বপ্রযত্নে তার সংস্কার সাধনে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। এ বিষয়ে বিলম্ব কিংবা দ্বিধা করা জাতির পক্ষে মারাত্মক। শুধু প্রচলিত ব্যবস্থার গলদ খুঁজে বের করলেই কাজে অগ্রসর হওয়া গেল—একথা মনে করা ভুল। অনেক সময় গলদ আবিষ্কারের কাজেই আমাদের বেশীর ভাগ সামর্থ্য ব্যয়িত হয়ে যায়; সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করার শক্তি-সামর্থ্য ও উৎসাহ আর তেমন অবশিষ্ট থাকে না। জাতির মরা-বাঁচার এ সমস্যাটির বিশ্লেষণ সকল সময় সৃজনাত্মক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সবাই মিলে শুধু ত্রুটি আবিষ্কারের কাজেই ব্যস্ত থাকলে কাজটি পণ্ড হয়ে যেতে পারে। একযোগে কাজ করে শিক্ষাকে গলদমুক্ত করে, কিভাবে জাতিকে আমরা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি—লক্ষ্য থাকবে শুধু সেই দিকে। এক কথায়, শিক্ষার সংস্কার করতে গিয়ে শিক্ষার সৎকার করার ইচ্ছাই যেন আমাদের পেয়ে না বসে। অর্থাৎ ভাঙ্গার সাথে সাথেই যেন চলে গড়ার কাজ। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা রচিত হলেই আমরা এক ধাপ এগিয়েছি—একথা মনে করা ভুল। পরিকল্পনাসমূহ কতটুকু কার্যকরী হল সেটিই হবে বিচারের মাপকাঠি।

পরাধীনতার নাগপাশ হতে মুক্ত হবার সাথে সাথেই রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ শিক্ষা-সংস্কারের কাজটিকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন এটা আশার কথা সন্দেহ নেই। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করতে হলে দেশের শিক্ষার ধারা কিভাবে রচিত হওয়া সঙ্গত—প্রচলিত পদ্ধতির গলদ কোথায়—ইত্যাদি তথ্য উদ্‌ঘাটন মানসে দিকে দিকে কত না পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চলছে! কত নূতন নূতন পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে! আবার বিরুদ্ধ সমালোচনার চাপে তা

ভেঙ্গে নূতন রূপ নিয়ে আসরে এসে নামছে! কত Commission, Committee, Council, Conference, Seminar, Workshop ইত্যাদি গঠন করে ভুরি ভুরি দেশী বিদেশী পুঁথি ঘেঁটে কত না নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে! নূতন নূতন পাঠক্রম (Curriculum) নূতন নূতন পাঠ্যসূচী পুরাতনের স্থান দখল করছে! পাঠক্রম-বহির্ভূত বিষয়সমূহ (Extra-curricular) অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে (Co-curricular) পরিণত হচ্ছে! এতদিনকার পাঠশালা, মাইনর, হাইস্কুল ইত্যাদিকে ক্রমে ক্রমে নিম্নবুনিয়াদী, উচ্চবুনিয়াদী, মাধ্যমিক, সর্বার্থসাধক উচ্চতর মাধ্যমিক ইত্যাদি নূতন নূতন নাম দিয়ে রূপ বদলান হচ্ছে! দলে দলে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের নানা ধরনের ট্রেনিং-এর সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে! বহু অর্থ ব্যয় করে বিদ্যালয়সমূহের জন্য নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম খরিদ করা হচ্ছে! ইমারতের পর ইমারত গড়ে উঠছে! এভাবে একটু খোঁজ নিয়ে দেখলে দেখা যাবে—দিকে দিকে যেন একটা বিরাট পরিবর্তনের সাড়া পড়ে গেছে।

শিক্ষা-জগতের এ আলোড়নের ঢেউ কম-বেশী সমাজের সকল স্তরেই আজ প্রবেশ করেছে। কিন্তু এত আয়োজন ও এত প্রস্তুতি সত্ত্বেও লোকের মনে যেন কোন সোয়াস্তি নেই। জানিনা এর পরিণামের কথা ভেবে একদল লোক আতঙ্কে শিউরে উঠছেন কেন? অবশ্য, অতিরিক্ত আশাবাদীর সংখ্যাও দেশে নিতান্ত নগণ্য নয়। কেউ কেউ আবার প্রশ্ন করছেন—পরীক্ষা করে ফলাফল সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হয়ে এভাবে এতবড় একটা পরিবর্তনের ঝুঁকি নেওয়া সমীচীন হয়েছে কি? অতিমাত্রায় রক্ষণশীল যাঁরা তাঁরা ব্যথিত মনে ভাবছেন—পুরাতনকে আর বুঝি আঁকড়ে রাখা গেল না। প্রগতিপন্থীরা উপহাস-ছলে উক্তি করছেন—পুরাতনের মায়া বাড়িয়ে আর লাভ কি? নূতন নূতন নির্দেশসমূহ যাঁরা প্রচার করছেন তাঁরা অভয় দিয়ে বলছেন—আশুফল বিচার করে নিরুৎসাহ হবার কোন কারণ নেই, পরিণামে সাফল্য সুনিশ্চিত। আর নির্দেশসমূহ পালন করার ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত, ফলাফল নিয়ে ভাববার তাঁদের অবকাশ কই? তাঁদের কাজ সর্বপ্রকার সমালোচনা উপেক্ষা করে আশায় বুক বেঁধে কাজ করে যাওয়া। নূতনের মোহে যাঁরা আচ্ছন্ন, পরিবর্তনের এ শম্বুক গতি আবার তাঁরা মোটেই পছন্দ করছেন না। তাঁদের বক্তব্য—আসুন বিলম্ব না করে কাজ শুরু করে

দিই। পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে লেগে গেলে প্রয়োজন মত এখানে ওখানে পরিবর্তন পরিবর্ধন সেতো আমাদের হাতেই রইল। তা'ছাড়া, নূতনের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে যাঁরা দ্বিধা করছেন তাঁদেরও জানা উচিত—তাঁদের আর্তনাদে পরিবর্তনের এ দুর্বার গতি আজ আর রুদ্ধ হবার নয়। লেখক, প্রকাশক, পুস্তক-বিক্রেতা—এক কথায় যাঁরা শিক্ষা-সংস্কারের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে জড়িত, ফলাফলের বিচার যাঁদের নিকট গৌণ, তাঁদের সবার ভিতরেই আজ একটা অনিশ্চয়তার ভাব। এভাবে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সমাজের সকল স্তরেই আজ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এতসব দেখেশুনেও মনে প্রশ্ন জাগে—দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সত্যিই কি একটা আমূল পরিবর্তন আসন্ন? খট্‌কা একটা থেকেই যাচ্ছে। সত্যিকারের পরিবর্তনকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে আজ অনেকেই আগ্রহশীল, কিন্তু ফুটো নৌকায় শুধু রং লাগাতে তেমন উৎসাহ আর কারো রয়েছে বলে মনে হয় না।

গানের আসরে গিয়েছি গান শুনতে। ভিন দেশ থেকে নাকি একটি ভাল দল এসেছে—চমৎকার গান করে। চঞ্চলভাবে একবার হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি, পরক্ষণেই আবার সম্মুখে ঝুলান পর্দাখানার দিকে তাকাচ্ছি। উদ্যোক্তাগণ কিন্তু ঐকতানের পর ঐকতান বাজিয়েই চলেছেন। পালা শুরু হবার কোন লক্ষণই যে দেখছি না। চঞ্চলতা বেড়েই চলে। না! ঐযে পর্দাখানা সরে গেছে—এইবার নায়ক-নায়িকা-গণের পরিচয়ের পালা। কিন্তু একি! এযে আমাদের পাড়ার কেলে, ভূতো এরাই সব রং মেখে রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছে! অবশ্য সাজ-পোশাক এবং রঙের বাহার এ সবই নূতন আমদানি করা অতি আধুনিক সন্দেহ নেই। কাহিনীর অনবদ্যতায়, ঘটনার পারম্পর্যে নাটকটি সত্যি অতি অপূর্ব। পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, কিন্তু রূপায়ণের ত্রুটিতে সবই যে পণ্ড হয়ে গেল। আশাহত হয়ে ঘরে ফিরলুম। শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন বলতে যদি পুরাতনের উপর রং মাখানই বুঝায়, তা'হলে উৎসাহ উদ্যম যে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসবে এতে আর সন্দেহ কি!

শিক্ষার নূতন নূতন পরিকল্পনাসমূহ যাঁরা রচনা করছেন, ফলাফলের উপর তাঁদের হাত কতটুকু? সাফল্যলাভ অনেকাংশেই নির্ভর করছে

যাঁরা হাতে কলমে সে-সব চালু করছেন তাঁদেরই উপর। ফ্যাক্টরিতে ঢুকে যাঁরা কাঁচা মাল নিয়ে পরীক্ষা করছেন, উৎপন্ন সামগ্রীর উৎকর্ষ নির্ভর করছে তাঁদেরই যোগ্যতার উপর। কার্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যাঁরা পরিকল্পনাসমূহ রূপায়ণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের উপযুক্ততার সাথে সাথে তাঁদের সুযোগ-সুবিধার কথাও ভাবা দরকার নয় কি? তা'ছাড়া বিদেশ থেকে আমদানি করা প্রণালীসমূহ শুধু দেশী রং মাখিয়ে দেশে চালু করতে যাওয়ার বিপদও ত আছে! পরিকল্পনা-গুলো স্থান, কাল ও পাত্রের উপযোগী কিনা তাও পূর্বাহ্নে পরীক্ষা করে দেখা দরকার নয় কি? যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা, সৈনিকদের মনোবল, গোলাবারুদের পরিমাণ, সেনাপতিদের যোগ্যতা ইত্যাদি না জেনে যুদ্ধ-পরিচালনা বিষয়ে কোন নির্দেশ দিলে সবসময় আশানুরূপ ফললাভের কোন নিশ্চয়তা আছে কি? বাড়ীর কর্তা ভাল ভাল জিনিস রান্না করার ফরমাশ দিয়ে বেড়াতে বের হলেন, অথচ ঘরে চাউলেরই অভাব। শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে হঠাৎ করে কোন নূতন প্রণালী চালু করতে গেলে বিশৃঙ্খলা রোধ করা যাবে না। তা'ছাড়া নূতন প্রণালীসমূহ যাঁরা চালু করবেন, তাঁদের যোগ্যতার কথা আমল না দিয়ে তাঁদের ঘাড়ে এ ধরনের গুরুদায়িত্ব চাপাতে গেলে ফলাফলের কথা ভেবে আতঙ্কের ভাব মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাই আজ কেবলই মনে হচ্ছে—কোথায় যেন একটু গরমিল হয়ে গেছে। নবরচিত পরিকল্পনাসমূহের গুণাগুণ বিচারের জন্য যোগ্য ব্যক্তিগণই রয়েছেন। তথাপি যুদ্ধক্ষেত্রের একজন সেনাপতি হিসাবে এগুবার নির্দেশ দিতে গিয়ে যে-সব বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাতে, সাফল্য সম্বন্ধে ততটা যেন ভরসা করতে পারছি না। ভাবি, আর ভাত হই। জাতির বিরাট অপচয় কি এতে রোধ হবে? না, উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে? শিক্ষাক্ষেত্রের এ বিরাট পরিবর্তন আজও সমাজের অধিকাংশ স্তরেরই সমর্থন লাভে বঞ্চিত। বিরুদ্ধ সমালোচনা যাঁরা করছেন তাঁদের সমস্ত মতামতগুলোকেও যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে পারছি না। তা'ছাড়া যুদ্ধরত সৈনিকদের এক বিরাট অংশই আজ হতবুদ্ধি। যাঁদের সাহায্যে যুদ্ধ পরিচালনা করব তাঁরা অনেকেই এ পরিবর্তনের বিরূপ সমালোচনায় উৎসাহ বোধ করেন।

একথা ঠিক—কোন পরিকল্পনাই কোনকালে প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে না। তবে, পরিকল্পনাটি চালু করার পূর্বে এতে অধিকাংশ লোকের সমর্থন আছে কিনা জেনে নিয়ে কাজে অগ্রসর হওয়াই ভাল। নচেৎ কার্যক্ষেত্রে সহযোগিতার অভাবে অনেক অতিরিক্ত বাধা এসে উপস্থিত হবে। আর একটি বিষয়ও ভাববার আছে—কাজে অগ্রসর না হয়ে বসে বসে শুধু বিচার-বিতর্কে কালক্ষেপ করার সময়ও আর নেই। গলদ রয়েছে বলে বসে বসে বিরুদ্ধ সমালোচনা না করে গলদ খুঁজে বের করে সবাই মিলে অবিলম্বে তার প্রতিকারে যত্নবান হওয়াই কর্তব্য। শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক স্বীকৃত পরিকল্পনাসমূহ হাতে কলমে চালু করতে গিয়ে যে-সব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেগুলোকে উপেক্ষা করা মোটেই সমীচীন নয়। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীগণ যাঁরা শিক্ষা-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, দেশের বাস্তব অবস্থার প্রতি তাঁদের বিশেষ লক্ষ্য না থাকলে, কোথায় কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল না হলে, পরিণামে আশানুরূপ সাফল্যলাভ একরূপ অনিশ্চিত।

একটি প্রশ্নের আজও কোন সদুত্তর পাচ্ছি না—মানুষ গড়ে তুলতে এ পরিকল্পনা কতটুকু সাহায্য করবে? এ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আজও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি কই? কেবলই মনে হয়—ফুটো নৌকায় তালি লাগিয়ে তাকে সাড়ম্বরে জলে ভাসিয়েছি, কিন্তু সব কয়টি ছিদ্রপথ বন্ধ করা হল কিনা জানবার চেষ্টা করিনি। ভয় হয়, কি জানি কখন কোন্ ছিদ্রপথে জল প্রবেশ করে মাঝ দরিয়ায় আমাদের ভরাডুবি হবে। ভাঙ্গা নৌকার সংস্কার করতে হলে যেমন প্রথমে তাকে ডাঙ্গায় উঠিয়ে ভাল করে দেখে নিতে হয় এবং প্রয়োজন-বোধে তার খোলনলুচে বদলে তবে তাকে আবার জলে ভাসাতে হয়—শিক্ষা-সংস্কারের কাজটিও ঠিক তেমনি। আজ এখানে কাল ওখানে তালি না লাগিয়ে—সব কয়টি সমস্যাকে সাম্‌নে রেখে একযোগে সমস্যাগুলোর সমাধান বাঞ্ছনীয়। এবং প্রয়োজন-বোধে প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনেও কোন দ্বিধার কারণ থাকা সঙ্গত নয়। শিক্ষা-সংস্কারের কাজটি একটি চতুর্মুখী অভিযানের মত। **শিশু, বিষয়বস্তু, শিক্ষাদাতা** এবং **শিক্ষার উদ্দেশ্য** এ চারিটি সমস্যার সমাধান একযোগে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর একটিকে অপরটি হতে আলাদা করে দেখতে গেলে

চলে না। এ চারিটি সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে উপেক্ষা করে অপরটির সংস্কার করতে গেলে বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব নয়। অতএব শিক্ষা-সংস্কারের কাজে একই সঙ্গে উপরোক্ত সব কয়টি সমস্যার প্রতিই সমান সুবিচার আমরা দাবি করতে পারি।

(ক) শিশু

বিরাট মহীরুহ যেমনি ঘুমিয়ে আছে অতি ক্ষুদ্র বীজের ভিতর, বিরাট পুরুষও তেমনি ঘুমিয়ে আছেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবশিশুর ভিতরে। পরিমিত জল, বায়ু এবং উত্তাপ পেলেই যেমন বীজের ভিতর প্রাণের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে ঠিক তেমনি শিশুর ঘুমন্ত শক্তি জেগে ওঠে। শিশু-কোরকটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে যেমন আশপাশের আগাছা উপড়ে ফেলতে হয়, মানবশিশুর বিরাট সম্ভাবনাকে রূপ দিতে হলেও তাকে মুক্ত রাখতে হবে চারিদিকের বিষাক্ত আবহাওয়া বা পরিবেশ হতে। কেবল পর্যাপ্ত জল ও সার ছড়িয়ে দিলেই কি উদ্ভিদ্-শিশু সতেজ হয়ে উঠবে? সবকিছুই নির্ভর করছে তার গ্রহণ বা বর্জন করার মর্জির উপর। একই মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে কেউ বিতরণ করছে সুমিষ্ট ফল, আর কেউ বা যোগাচ্ছে তিক্ত ফল। প্রত্যেকটি উদ্ভিদেরই গ্রহণ এবং বর্জনের এক একটি নিজস্ব ধারা রয়েছে। মানবশিশুকে গড়ে তুলতে হলেও তাকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করতে হবে তার নিজস্ব ধারায়। তার গ্রহণ এবং বর্জনের মর্জিকে উপেক্ষা করা মোটেই সঙ্গত হবে না। অতএব শিক্ষাদান কার্যটি সাফল্যের সাথে পরিচালিত করতে হলে শিশুমনের গোপন খবর সবার আগে আমাদের সংগ্রহ করে নিতেই হবে।

যখনই কোন শিশু তার নিকটতম পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে অসুবিধা বোধ করে তখনই সে হয়ে ওঠে অতিমাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল ও অপরাধপ্রবণ—এ-ই আচরণবাদী পণ্ডিতগণের (Behaviourist) অভিমত। মানুষের আচরণ তার অন্তর্নিহিত ভাবসমূহের অভিব্যক্তি মাত্র। শিশুর অবচেতন মনে কি কি ভাবের দ্বন্দ্ব চলছে তার খবর জানতে পারলে তার আচরণের তাৎপর্য অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। ধরা যাক্—একটি শিশু সুযোগ পেলেই অপরের জিনিস না বলে নিয়ে

নেয়। কেন যে ঐরূপ করে এর কোন সদুত্তর তার কাছ থেকে আদায় করা কষ্টসাধ্য। অথচ রোগের কারণ না জেনেই আমরা ঔষধের ব্যবস্থা দিয়ে যাচ্ছি। শিশু না বলে অপরের জিনিস নেয়—কেন সে না বলে নেয়, চোরাই মাল কোথায় সে লুকিয়ে রাখে এবং কিভাবে সেগুলো ব্যবহার করে ইত্যাদি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলে আমাদের কাছে এ সত্যই প্রতিভাত হবে যে—শিশুর অবদমিত ইচ্ছাসমূহই বিকৃত আকারে তার আচরণে মূর্ত হয়ে উঠছে। মনস্তাত্ত্বিকগণ বলছেন—শিশুর জীবনের প্রথম কয়টি বছরের অভিজ্ঞতাই তার জীবনদর্শনের মূল ভিত্তি। তাই শিশু তার আপনজনের প্রতিচ্ছবিই সবার ভিতর দেখতে আশা করে। স্নেহ-মমতা, হিংসা-দ্বেষ, এর সবকিছুই শিশু আহরণ করে তার নিকটতম পরিবেশ হতে। অর্থাৎ শিশুর পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন, যাঁদের সহবাসে শিশুকে থাকতে হয় তাঁদের আচরণ হতেই সে সবকিছু গ্রহণ করার চেষ্টা করে। ক্রমে গড়ে ওঠে তার চরিত্র এবং পরিশেষে সেসব রূপায়িত হয় তার আচরণে। এ অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সে বর্তমানকে জানতে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ পূর্বার্জিত ভাব-সম্পদের বিনিময়েই (Transfer) শিশু লাভ করতে চায় নিত্য নূতন ভাবের সন্ধান।

ছেলেমেয়েদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপসমূহ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে অতিমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শিশুর কতগুকলো আচরণ শুধু তার নিজের পক্ষেই ক্ষতিকারক। কিন্তু যে-সব আচরণ শুধু তার নয়, সমগ্র সমাজের পক্ষেই ক্ষতিকারক, সেগুলো মোটেই উপেক্ষা করা সঙ্গত নয়। শিশুর অপরাধপ্রবণতা তার মানসিক অসাম্যেরই প্রতিক্রিয়া। অনেক সময় অপরাধের গুরুত্ব না জেনেই শিশু অপরাধ করে বসে। আবার অনেক ক্ষেত্রে অপরাধ জেনেও সে কাজ হতে বিরত হওয়ার মত শক্তি তার থাকে না। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন—পাপীকে পাপ কাজ হতে নিবৃত্ত করতে হলে সবার আগে তার মন জয় করে নিতে হবে। মনোবিজ্ঞানী থর্ণডাইকের (Thorndike) অভিমত—উদ্দেশ্যসাধনে শাস্তির চেয়ে স্নেহ অনেক বেশী শক্তিশালী। শাস্তি এবং পুরস্কার উভয়ই যদিও উদ্দেশ্যমূলক তথাপি কার্যকারিতার দিক থেকে শাস্তি যেখানে অক্ষম, পুরস্কার সেখানে দেয় তার ক্ষমতার অদ্ভুত পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো।" শিশুদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপের কারণ শিশুমনের চাহিদা-

গুলোর সম্যক পরিতৃপ্তিতে অহেতুক বাধাদান। জোর করে শিশুকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালিত করতে গিয়েই এ বিপদ আমরা ডেকে আনি। শিশু শিশুই। তার কাছ থেকে বয়স্কের আচরণ প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। শিশুকেও তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠার কোন কারণ থাকা সঙ্গত নয়। শিশুকে অভয় দিয়ে, স্নেহ-মমতা ঢেলে তাকে আপন করে নিতে হবে। তারপর তার মনের গোপন কন্দরে যে ভাবসমষ্টি তালগোল পাকিয়ে আছে তার খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে অপরাধপ্রবণ শিশুর অবদমিত ইচ্ছাসমূহের সন্ধান করে সুযোগ করে দিতে হবে তার ঐকান্তিক ইচ্ছা-সমূহ পূরণের বা পরিতৃপ্তির। অন্যায় আচরণ করতে করতে ক্রমে যেন তা অভ্যাসে পরিণত না হয়ে যায় প্রথম থেকেই সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিশুকে যদি একবার বুঝিয়ে দেওয়া যায়—"যে কাজ তুমি করছ এতে তোমারই'ত ক্ষতি", তা'হলে ক্রমে হয়তো ভাল হবার জন্য তার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগবে। কারণ, আপন মঙ্গল কে না চায়? এবং ভাল হবার এই ইচ্ছাটিই তাকে প্রতিনিবৃত্ত করবে অন্যায় অসঙ্গত আচরণ হতে। অনেক সময় আমাদের অবিমৃষ্যকারিতাই ছেলে-মেয়েদের দুষ্কৃতকারীর দলে যোগ দিতে বাধ্য করে। শিশু যখন দেখে যে তার কোন অপরাধ নেই, অথচ বার বার অন্যায় ভাবে তাকে শাসন করা হচ্ছে, তখন থেকেই তার মনে বিদ্রোহ দানা বাঁধতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সে যোগদান করে সমাজবিদ্রোহীদের দলে। শিশুদের অধিকাংশ বিশৃঙ্খল আচরণ ধীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব—আত্মতৃপ্তির আশায় যে পরিবেশের সাথে শিশু নিজেকে খাপ খাওয়াতে চেয়েছিল, প্রচণ্ড বাধা পেয়ে যে ইচ্ছা তার পূরণ হ'ল না সেই সব অবদমিত ইচ্ছাসমূহই মনের কোণে তালগোল পাকিয়ে তার জীবনে এনে দিয়েছে বিশৃঙ্খলা। দরদ দিয়ে শিশুমনের এ ধরনের ব্যাধিসমূহের কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হলেই প্রতিকারের সূত্রও আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে। রোগী মাত্রেরই চিকিৎসার জন্য সুচিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। শিশুমনের অস্বাস্থ্যের মূল কারণ এবং তার চিকিৎসা চিকিৎসক হিসাবে শিক্ষক সম্প্রদায়েরই অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু। রোগের সমস্ত উপসর্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসক রোগীর কাছ থেকেই জেনে নেবার চেষ্টা করেন। রোগমুক্ত হবার বাসনায় রোগীই চিকিৎসককে

দেয় রোগের উৎসের সন্ধান। রোগী-শিশু এবং চিকিৎসক-শিক্ষক উভয়েরই রোগের কারণ সম্পর্কে সচেতন থাকা আবশ্যক। তাইত, শিক্ষাবিদ্‌গণ শিশুমনের এসব ব্যাধির প্রতিকারকল্পে প্রতি বিদ্যালয়ে একটি করে গবেষণাগার বা শোধনাগার স্থাপনের পরামর্শ দিচ্ছেন।

আমাদের দেশের অনেক শিশুই, কি বাড়ীতে কি বিদ্যালয়ে, এমন একজন দরদী মানুষ পায় না যার কাছে তাদের মনের কথা খুলে বলে একটু শান্তি পেতে পারে। ধরুন, রমেন পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি! তার এ অপরাধের আর মাপ নেই। সবার কাছেই সে লাঞ্ছিত। তার কথা, তার অভাব-অভিযোগের কথা, তার সুবিধা-অসুবিধার কথা, এসব কেউ শুনতে চায় না। তাকে তার বক্তব্য বলার সুযোগই দেওয়া হ'ল না। অথচ তার বিরুদ্ধে রায় বেরিয়ে গেল। সে অপরাধীর মত ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকায়—কিছুতেই সে বুঝতে পারে না তার অপরাধ কোথায়। ধীরে ধীরে তার মন ভেঙ্গে যায়। এ দুনিয়ায় এমন কি কেউ নেই যে রমেনের মর্মবাণী শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করে? আশার বাণীতে সঞ্জীবিত করে তার দেহমনের সজীবতা ফিরিয়ে আনে? এ অসহায় অবস্থায় মানুষ আর কতদিন থাকতে পারে? ধীরে ধীরে সে আশ্রয় খোঁজে তাদের দলে যারা সমাজে তারই মত অবজ্ঞাত ও অবহেলিত। যোগ দেয় তাদের সাথে নানা সমাজবিরোধী কার্যকলাপে। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব, সবাইকে সে তখন শত্রু ব'লে ভাবতে থাকে। ক্রমে সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধেই তার মন বিষিয়ে ওঠে। এমনি করে রমেন সমাজের একটি দায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু, সময় থাকতে যদি কেউ তাকে আদর করে কাছে ডাকত, মন দিয়ে তার অভিযোগ শুনে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করত, তার দুঃখে সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে আপন করে নিত, তা'হলে আজ হয়ত সে সমাজের একটি সম্পদ হয়ে উঠত। প্রচলিত ব্যবস্থায় শিক্ষক সম্প্রদায়ের এসব ভাবনা ভাববার সময় কই? প্রচলিত বিদ্যালয়ে আজকাল শিশুর চেয়েও বিষয়বস্তু বেশী প্রাধান্য পেয়ে থাকে। যেভাবেই হউক সিলেবাস (Syllabus) ত শেষ করতে হবে! তা'ছাড়া রয়েছে হরেক রকমের ক্রিয়াকলাপ (activities)। শিশুকে ভাববার সুযোগ বা ইচ্ছা দুয়েরই অভাব! প্রতিটি বিদ্যালয়ে অন্ততঃ পক্ষে একজন শিক্ষকের উপরও এ ভার দেওয়া হউক যিনি

ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের পরিধির বাইরেও তাদের জীবনধারা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে পারেন। ছেলেমেয়েরা যেন বুঝতে পারে যে বিদ্যালয়ে অন্ততঃ একজন তাদের আপন জন আছেন, যাঁর কাছে মনের কথা বলে সান্ত্বনা লাভ করা যায়, যিনি তাদের অভাব-অভিযোগের কথা মন দিয়ে শুনে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে চেষ্টিত হন। এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করতে না পারলে এ সমস্যার সমাধান সুদূরপরাহত। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে অন্ততঃ একটি করে School-mother বা School-fatherএর পদ সৃষ্টি করে এ সমস্যাটির সমাধানে অবিলম্বে যত্ন নেওয়া সঙ্গত বলেই মনে হয়।

শিশুতে শিশুতে বিস্তর পার্থক্য স্বতঃই বিদ্যমান; বংশলোচন রামদুলালের ঘরে না জন্মে হার্টকসাহেবের ঘরে জন্মালে আপত্তি ছিল কি? নির্মলেন্দু, নির্মলা হয়ে জন্ম নিলেও আমাদের করবার কিছু থাকত না। দেখা যাচ্ছে শুরুতেই আমাদের কারবার খানিকটা সীমাবদ্ধ। একই ধরনের প্রতিভা নিয়ে সব শিশু এ ধরায় আসে না। শিশুতে শিশুতে বিস্তর পার্থক্য আছে, এবং তা থাকবেও চিরকাল। অতএব এসত্য স্বীকার করেই আমাদের সবকিছু প্ল্যান প্রোগ্রাম করতে হবে। এক ছাঁচে ঢেলে সব শিশুকে একই ধরনে গড়তে গেলে অপচয় যে কিছুটা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শিশুদের রুচির প্রতি লক্ষ্য না রেখে একই বিষয়বস্তু একই পদ্ধতিতে পরিবেশন করতে গেলে পণ্ডশ্রম ত খানিকটা হবেই, তা'ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুদের বদহজমজনিত বিশৃঙ্খলা বোধ করার সমস্যাটিও আবার নূতন করে উপস্থিত হবে। অতএব শিশুকে না জেনে তাকে শিক্ষা দেবার ভার গ্রহণ করলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। যার যে বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে তাকে সে বিষয়েই পারদর্শী হবার সুযোগ দিলে জাতীয় সম্পদের অপচয় অনেকাংশে নিবারিত হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের! শুধু ডিগ্রী লাভের যোগ্যতা ছাড়া অপর কোনরূপ যোগ্যতাকে আজও আমরা আমল দিতে শিখি নি। আমরা মুখে অনেক বড় বড় বক্তৃতা করি, নানা প্রকার উপদেশাবলীতে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরিই রক্ষণশীল। যে ছেলে চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী অথচ পরীক্ষা-পাসের কোন মার্কা নেই তাকে শিক্ষিতের দলে টানতে আমাদের নাসিকা যে কুঞ্চিত হয়ে ওঠে! খেলাধুলায় ভাল, অটুট স্বাস্থ্য, পরের বিপদে প্রাণ দিয়ে সাহায্য করে অথচ

ইংরেজীতে কিছুতেই পাসের নম্বর আদায় করতে পারে না এমন ছেলেকে অপদার্থের দলভুক্ত করা ছাড়া উপায় কি? অতুলের মাথায় অঙ্ক কিছুতেই ঢোকে না অথচ এ বয়সে ওর কবিপ্রতিভা দেখলে অবাক হতে হয়! পরীক্ষায় পাস না করা পর্যন্ত অতুলকেই বা আমরা কোন্ দলে ফেলবে তা নিয়ে আমাদের সমস্যার অন্ত নেই। তুই ইংরেজীতে বড্ড কম নম্বর পেয়েছিস্, তোর কিছু হবে না। অঙ্কে তুমি পাঁচ নম্বর কম পেয়েছ, তোমাকে এবার কিছুতেই এলাউড করা যেতে পারে না। কিন্তু, যে মাপকাঠি দিয়ে মেপে আমরা ছেলেমেয়েদের যোগ্যতার পরিমাপ করছি তা যে কত ভ্রান্ত আজ আর তা কারো অজানা নেই। ৩০ নম্বর পেলেই ব্যস্! তাকে উপযুক্ততার মার্কা দিতে আমরা মোটেই দ্বিধা করি না। কিন্তু যে ২৮ নম্বর পেয়ে ফেল করল তার মত অপদার্থ বুঝি ইহজগতে আর নেই! তাকে নিয়ে তার পিতামাতারই বা কত সমস্যা! সে বেচারীর দুর্ভোগের কথা আর নাই বা বললাম। যে-কোন চাকরির যোগ্যতার নিম্নতম মাপকাঠি স্কুলফাইনাল পরীক্ষায় পাস। স্কুলফাইনাল পরীক্ষার গণ্ডি যে অতিক্রম করতে পারল না তাকে নিয়ে আমাদের কত না ভাবনা!

জীবন্ত মানবশিশু নিয়েই শিক্ষার কারবার। এ কারবারে সুফল লাভ করতে হলে শিশুর রুচি, আগ্রহ, দক্ষতা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাপদ্ধতি রচিত হওয়া আবশ্যক। যে শিশুর চিত্রাঙ্কন বা গান-বাজনা খুব প্রিয়, তার ঘাড়ে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির বিরাট বোঝা চাপিয়ে দিলে তার উভয় কুল নষ্ট হবার সম্ভাবনাই অধিক। দশটি বছর বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করে যে অভাগা পাসের মার্কা পেল না সে রইল সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে। বর্তমানেও বিদ্যালয় বলতে আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান বুঝি যেখানে একই ছাঁচে সবাইকে ঢেলে তৈরি করার একটা অপচেষ্টা প্রচলিত। তারপর বৎসরান্তে শুরু হয় বাছুনি করার কাজ। মনগড়া চালুনির ফাঁকে যারা পড়ে গেল, হিসাব করে দেখা যায় তাদের সংখ্যাই অধিক। যারা টিকে রইল তাদেরও একটি বৃহৎ অংশ জীবনযুদ্ধে অপদার্থ সৈনিক বলেই পরিগণিত হচ্ছে। সকল ছেলেমেয়েরই বুদ্ধি ও যোগ্যতা সমান হবে এ আশা আমরা করতে পারি না। অতএব একই ধারায় সবাইকে শিক্ষা দিলে সবার উন্নতি সমান হবে এ আশা

করাও যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু, প্রচলিত ব্যবস্থায় এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কই? একমাত্র বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বিচার করে আমরা ছাত্রছাত্রীদের একটা বিরাট অংশকে অপদার্থের পর্যায়ে ফেলে সমাজের কত যে মূলধন নষ্ট করছি, তা হিসাব করবার সময় হয়েছে বলে মনে হয়।

বর্তমানে বিদ্যালয় থেকে কড়া শাসন তুলে দিয়ে, ছাত্রছাত্রীদের নানা ভাবে স্বাধীনতা দিয়ে তাদের উচ্ছৃঙ্খল করে তোলা হচ্ছে; পড়াশুনায় আজকাল তাদের মোটেই মনোযোগ নেই—এ ধরনের অভিযোগ আজকাল প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। প্রচলিত বিদ্যালয়সমূহ হতেই তখনকার দিনে অনেক মনীষী তৈরি করা সম্ভবপর হয়েছে। তার একটি কারণ, তখনকার দিনে শিক্ষকমহাশয়দের শাসন ছিল অত্যন্ত কড়া। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের মন থেকে ভয়ের সাথে সাথে শ্রদ্ধাও অন্তর্হিত হয়েছে। তখনকার দিনে স্কুলে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য; অথচ ছেলেমেয়েরা অধিক সংখ্যায় পাস করেছে। এখন স্কুলগুলিতে পড়াশুনার চেয়ে অপরাপর কার্যাবলীর দিকেই ঝোঁক বেশী। আজকাল যে পরীক্ষা-পাসের হার ক্রমেই কমে যাচ্ছে তার কারণ শিক্ষাপদ্ধতির ব্যর্থতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের অনুরাগের অভাব। মোট কথা, শিশুদের পড়াশুনায় মনোযোগের অভাবের একমাত্র কারণ বর্তমানে লেখাপড়ার জন্য আগের মত যত্ন নেওয়া হয় না—এ ধরনের সমালোচনা হামেশাই শুনতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ একবার অতিদুঃখে বলেছিলেন—"বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলির উপরে রাজচক্রের শনির দৃষ্টি-পড়িবামাত্র কত প্রবীণ ও নবীন শিক্ষক জীবিকালুব্ধ শিক্ষাবৃত্তির কলঙ্ক কালিমা নির্লজ্জভাবে সমস্ত দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কাহারো অগোচর নাই। তাঁহারা যদি গুরুর আসনে থাকিতেন, তবে পদগৌরবের খাতিরে এবং হৃদয়ের অভ্যাসবশতঃই ছোট ছোট ছেলেদের উপর কনেস্টবলি করিয়া নিজের ব্যবসায়কে এরূপ ঘৃণ্য করিয়া তুলিতে পারিতেন না।" কেবল শাসন করে ছেলেমেয়েদের কোন প্রকার কু-অভ্যাস গঠনে বাধা দেওয়া যায় কিনা জানি না, তবে কোন প্রকার সু-অভ্যাস গঠনে এর প্রভাব অতি সামান্যই। শাসনের ভয় দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়তে বসতে বাধ্য করা যায় স্বীকার করি, কিন্তু পড়ার সাথে মনের সংযোগসাধন এভাবে সম্ভবপর কিনা, তাই ভাববার

বিষয়। মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত—অযথা উৎপীড়ন করেই নাকি আমরা অনেক সময় ছেলেমেয়েদের অন্তরে সমাজবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করে থাকি। এছাড়া, শাস্তির ভয়ে দিনরাত আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলতে বাধ্য হয়ে ছাত্রছাত্রীরা স্বাস্থ্য খুইয়ে ক্রমে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। আবার শাস্তি এড়াবার জন্য অনেক সময় তারা নানাপ্রকার কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতেও বাধ্য হয়। এভাবে শাসনযন্ত্রের নিষ্পেষণে তাদের মনের সুস্থ অবস্থাও অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায়। কেবল কড়া শাসনেই ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষায় ফল ভাল করত কিনা জানি না, তবে তখনকার দিনের অবস্থা বর্তমানের পরিবেশ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তা'ছাড়া, পাকা গাঁথুনির ভিতর শিকড় চালিয়েও বটের বীজ যেমন বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়, তেমনি প্রতিভা নিয়ে যারা জন্মায় সামান্য প্রতিকূল পরিবেশ পারে না তাদের বিকশিত হবার পথে কোন বাধার সৃষ্টি করতে।

এমন একদিন ছিল, যখন সামান্য কুড়ি-পঁচিশ টাকার একটি চাকরির জন্য বি. এ., এম. এ. ডিগ্রীওয়ালাদেরও উমেদারি করতে হত দ্বারে দ্বারে। চাকরি ভিন্ন গ্রাসাচ্ছাদনের অপর কোন পথ খোলা থাকলেও তখনকার দিনে লোকে তার সন্ধান রাখত না। রাখলেও সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হবার ভয়ে সে রাস্তায় সহজে কেউ পা বাড়াত না। পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করে ডিগ্রী অর্জন করতে না পারলে জীবনযুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য! এ ভাবনায় ভাবিত হয়েই ছাত্রছাত্রীরা আপন আপন প্রয়োজনের তাগিদেই লেখা-পড়ায় মনোযোগ দিত। শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াও তখনকার দিনে অনেক ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাত। তাঁরা ত শাস্তির ভয়ে লেখা-পড়ায় মনোযোগী হন নি, তাঁরা লেখাপড়া করতেন প্রাণের তাগিদে। আত্মচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা অসাধ্য সাধনে সক্ষম হতেন। তখনকার দিনে সমাজের সকল স্তরের ছেলেমেয়েই আর পাঠশালায় ভরতি হবার জন্য ভিড় করত না। যাদের পেশা ছিল নোকরি, সাধারণতঃ কেবল তাদের ছেলেমেয়েরাই অভিভাবকদের বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে বিদ্যার্জন করতে অগ্রসর হত। পরীক্ষায় পাস করে মার্কা না পেলে চাকরি মিলবে না, আবার চাকরি ছাড়া অন্যকিছু করে খাবার সংস্থানের যোগ্যতাও নেই। অতএব অনন্যোপায় হয়ে প্রাণের দায়েই তারা লেখাপড়ায় মনোযোগ দিত। শিক্ষকের শিক্ষা দেবার গরজের চেয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যার্জনের গরজ ছিল বেশী।

দেশ আজ স্বাধীন। দেশের আপামর জনসাধারণকে অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন করার দায়িত্ব আজ জাতীয় সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে করতে হচ্ছে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। দলে দলে ছাত্রছাত্রী ভরতি হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে! বিদ্যালয়ে একবার প্রবেশ করলে, যেন তেন প্রকারেণ অন্ততঃ স্কুলফাইনাল পরীক্ষায় পাস করতে হবে এ-ই সবার পণ। কাজেই উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে যোগ্য অযোগ্য সবাই ছুটল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে। জাতীয় অপচয়ের এটা একটা মুখ্য কারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু পরীক্ষায় পাসের হার কমে গেলে সমস্ত দোষ শিক্ষক-শিক্ষিকার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েই আজ আমরা নিশ্চিন্ত। পরীক্ষার ফল ভাল হলে সবাই মিলে, এমনকি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষককে অভিনন্দন পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আর যদি ভাগ্যদোষে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হ'ল, তা'হলে তাঁর ভাগ্যে জুটল তিরস্কার। শিক্ষক সম্প্রদায়ও তাই পরীক্ষার ফল ভাল দেখাবার জন্যে যে-কোন পন্থা অবলম্বন করতে মোটেই দ্বিধা করেন না। অতএব, ছেলে মানুষ হচ্ছে কিনা সে ভাবনা ভাববার তাঁদের অবকাশ নেই!

শিক্ষাটা দেবার জিনিস নয়, নেবার জিনিস। ছেলেরা পড়ে, তাদের পড়ান যায় না। পড়াশুনায় মনোযোগ দেয় তারা স্বেচ্ছায়, আপন গরজে। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনায় আগ্রহ জন্মাতে হলে সর্বাগ্রে তাদের পরিবেশটি মার্জিত করতে হবে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা এ বিষয়ে তাদের কতটুকু সাহায্য করে সেটাই আজ ভাববার বিষয়। ছেলেমেয়েদের চিত্তবিক্ষেপ সৃষ্টি করার মত আয়োজন অনুষ্ঠানের কোন অভাব বর্তমানে এদেশে নেই—সস্তা রাজনীতি আছে, বিভিন্ন স্লোগান সহ শোভাযাত্রা আছে; ধর্মঘট আছে, প্রতিবাদ দিবস আছে, হরতাল আছে,—এছাড়াও রয়েছে রেডিও, সিনেমা, থিয়েটার, নাচগান, সম্মেলন, অনুষ্ঠান, আরও কত কি! একমাত্র অধ্যয়ন ছাড়া আর সকল বিষয়েই ছাত্রছাত্রীদের অফুরন্ত উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায়। এর জন্য দায়ী করব কাকে? শিক্ষকেরা পড়াতে জানেন না বা পড়াতে চান না, ছেলেমেয়েরা পড়তে চায় না, ইত্যাদি বলে লাভ কি? বাড়ীতে একটি বিরাট উৎসব লাগিয়ে বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকার আদেশ দেওয়া যেমন হাস্যকর, চিত্তবিক্ষেপ সৃষ্টির সমস্ত আয়োজন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে ছাত্রছাত্রীদের

পড়াশুনায় মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টাও ঠিক তদ্রূপ হাস্যকর! অতএব এর ওর ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে দেশের ছেলেমেয়েদের এ বিষাক্ত পরিবেশ হতে কি করে মুক্ত রাখা যায়, সর্বাগ্রে মিলিত ভাবে সে চেষ্টা করা কর্তব্য। একটু জ্ঞান হলে দেশের ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে কোন আশার আলো আজ দেখতে পায় না। চারিদিকে অভাব-অভিযোগ, বেকার জীবনের মর্মবাণী, এসব ত রয়েছেই, তদুপরি সর্বত্রই রয়েছে দলাদলি ও ক্ষমতার কাড়াকাড়ি। দুর্নীতি, জাল-জোচ্চুরি ভেজাল, কপটতা ইত্যাদি যেন আজিকার সমাজের ভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সততার একটি দৃষ্টান্তও বুঝি কেউ তাদের সামনে আজ তুলে ধরছে না। খাঁটি মানুষ সৃষ্টির পক্ষে যে আদর্শের প্রভাব অত্যাবশ্যক সে প্রভাব থেকে আজ দেশের ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। সমাজে আদর্শচ্যুত মানবেরই প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি তাদের তরুণ মনে ঘা দিয়ে তাদেরকে নীতিবোধের প্রতি উদাসীন করে তুলছে না কি? জাতীয় কৃষ্টির প্রতি ঔদাসীন্যও কচি কচি ছেলেমেয়েদের নীতির বাঁধন শিথিল করে দিচ্ছে। চোখের সামনে ওরা সততই দেখতে পাচ্ছে—পাস-টাস না করেও অমুকে শুধু ব্ল্যাক করেই কত রোজগার করছে। কোন মার্কা ছাড়াই অমুকের সমাজে কত মান, যশ ও প্রতিষ্ঠা। শুধু শিক্ষিত হলেই আজকাল সমাজে কোন মর্যাদা পাওয়া যায় না। মনুষ্যত্বের বিচারের মাপকাঠি এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ। তারা দেখছে কিছু রোজগার করতে পারলেই তাদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সবাই খুশী। কিভাবে টাকাটা এল, সে খবর কেউ নেবার প্রয়োজন বোধ করেন না। অনেক স্থলে জেনেও সমাজ তাতে পরোক্ষে প্রশ্রয়ই দান করে থাকে। তা'ছাড়া নানা সমাজবিরোধী কার্যকলাপে আজকাল বড়দের সাথে সাথে শিশুরাও যোগদান করে আনন্দ উপভোগ করে। হলে পরীক্ষা চলছে, সবাই ছুটে এসেছে কিভাবে অসাধু উপায়ে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করা যায়। অভিভাবকবৃন্দ দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা উপভোগ করছেন। পরীক্ষা যাঁরা পরিচালনা করছেন তাঁরা সবাই তখন আসামীর তালিকাভুক্ত। তাঁদের জব্দ করেই যেন সবাই আত্মপ্রসাদ লাভ করছে। এ অবস্থার প্রতিকার করতে একটি অঙ্গুলিও আজ উত্তোলিত হচ্ছে না। সমস্ত আইন-শৃঙ্খলা অমান্য করেই যেন আজ

আমরা বিজয়ীর মত বুক ফুলিয়ে চলতে চাই। এতে নিজের কিংবা সমাজের কি মঙ্গল হ'ল সে খোঁজ নেই। আইন অমান্য করার সুযোগ পেয়েই যেন সবাই খুশী। তারপর প্রচলিত সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠিও শিশুমনের উপর কম প্রভাব বিস্তার করছে না। এভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মনটিকে গুটিয়ে এনে পড়াশুনায় লাগান বিদ্যার্থীদের পক্ষে খুব সহজসাধ্য ব্যাপার কি? তাই অযথা কচি কচি ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ কি? চারিদিকের বিষাক্ত আবহাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রাদের মন আজ জর্জরিত। প্রতিকারের একমাত্র উপায় উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি করা। পরিবেশের প্রভাবেই বিদ্যার্থীদের প্রাণে জেগে উঠবে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা। একবার স্পৃহা জেগে উঠলে আর ভয় নেই। তখন কাজ, শুধু ছেলেমেয়েদের সামনে দেশের মনীষীদের জীবনদর্শনের পৃষ্ঠাগুলো খুলে ধরা। অবান্তর হলেও আর একটি সমস্যার কথাও আজ ভুললে চলবে না। যদিও সকল দেশের পক্ষেই এর গুরুত্ব সমান নয়, তথাপি এর বিষক্রিয়া হতে বুঝি কারো রেহাই নেই। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সাথে সাথেই মোটা অঙ্কের একটি দল সম্পূর্ণ রিক্তহস্তে এসে আমাদের সমাজের দ্বারে উপস্থিত হ'ল। মূল তাদের ছিন্ন, তাই মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার তাদের শক্তি নেই। দারিদ্র্যের কশাঘাতে দেহমন তাদের অবসন্ন। মাতাপিতার অসহায় অবস্থার চাপ শিশুমনগুলিকেও বিকল করে দিল। একটা গোটা জাতির মোটা একটা অংশ যখন এভাবে বিকল হয়ে যেতে বসে তখনই সমগ্র সমাজদেহে দেখা দেয় নানা প্রকার রোগের লক্ষণ। রোগের বিষ কখনও এক স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে না। ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে সমাজের সর্বত্র। তরুণ মন নানা ভাবে এ দুর্বিষহ অবস্থার প্রতিকার খোঁজে। অনেকেই শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় নানা সমাজবিরোধী কার্যকলাপের। উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়েই চলে। এ অবস্থায় হঠাৎ কোথাও যদি জ্ঞানের আলো ক্ষণিকের জন্যও জ্বলে ওঠে, বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তখনই তা আবার নিভে যায়। নবাগত শিশুর দল ঘরে বাইরে প্রতিনিয়ত যে-সব আদর্শের সম্মুখীন হচ্ছে, তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের মনের গতিও সেইভাবে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। শুধু শিক্ষককুলের উপদেশাবলীতে তাদের মনের গতির মোড় ফিরতে পারে না। তখনকার দিনে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সবাই উপযুক্ত ছিলেন

এবং শিক্ষাপদ্ধতিও ভাল ছিল এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে যদি সমস্ত দোষই বর্তমান শিক্ষক সম্প্রদায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে বসে থাকি, তা'হলে সমস্যা সমাধানের পথ অধিকতর কণ্টকাকীর্ণ হবে সন্দেহ নেই। প্রয়োজন শুধু, এমন অবস্থার সৃষ্টি করা, যে অবস্থায় পড়ে শিশুদের মনে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। আমি পড়ব, আমি বড় হব, আমি মানুষ হব—এ ইচ্ছা যখন জেগে উঠবে তখন আর ভাবনা নেই। আদেশ-নির্দেশেরও প্রয়োজন হবে না। প্রয়োজন তখন, শুধু তাদের আগ্রহের, ঔৎসুক্যের খোরাক যুগিয়ে যাওয়া। কথায় বলে—"গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক।" শিষ্য উপযুক্ত হলে, গুরু সে নিজেই তৈরি করে নিতে পারবে। শুধু বই-খাতা-কলম নিয়ে বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করলেই তাকে ছাত্র আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নয়। প্রকৃত ছাত্রই পারে শুধু প্রকৃত শিক্ষক তৈরি করে নিতে। ভাল শিক্ষকের গুণেই বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল ভাল হয় এ মতের সমর্থক আমি নই। পরীক্ষার ফল ভাল মন্দ অনেকাংশেই নির্ভর করে ছাত্রদের যোগ্যতা ও সমাজ-পরিবেশের উপর। শিক্ষকের যোগ্যতা এস্থলে গৌণ। নিরপেক্ষ ভাবে একটু চিন্তা করলেই দেখব—প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার গলদ দূর করতে হলে সবার আগে দেশের ছেলে-মেয়েদের মুক্ত করতে হবে সমাজের বিষাক্ত আবহাওয়া হতে। সমস্যাটির সমাধানের জন্য এভাবে অগ্রসর না হলে জাতি-গঠনের সর্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে সন্দেহ দেই।

দেশের সমস্ত শিশুকে সমাজ থেকে দূরে রেখে শিক্ষা দেওয়া কি সম্ভবপর? প্রচলিত বিদ্যালয়গুলো ভেঙ্গে স্থানে স্থানে আবাসিক বিদ্যালয় (Residential institution) স্থাপন করে এ সমস্যার আংশিক সমাধান যে অসম্ভব নয় তার প্রমাণ আমাদের দেশের রামকৃষ্ণমিশন-পরিচালিত বিদ্যার্থীদের আশ্রম-সমূহ। এক একটি এলাকায় অন্ততঃ দুই-একটি করে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপিত হলে, প্রতি বছর অন্ততঃ কিছু সংখ্যক ছাত্র প্রকৃত মানুষ হয়ে বের হতে পারে। এভাবে ক্রমে সমাজের মূলধন বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং ঐ সকল আদর্শ ছাত্রছাত্রীদের প্রভাবে দেশের ছাত্রসমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে তার ফলও নিশ্চয়ই অশুভ হবে না। রাতারাতি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করে দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীর স্থান সঙ্কুলান করা সম্ভবপয় নয়। কাজেই বাকী বিদ্যালয়সমূহে যদি এমন ব্যবস্থা করা যায়, যাতে ছেলেমেয়েরা

সকাল থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে থেকে লেখাপড়া, খেলাধুলা ইত্যাদি করে সময় কাটাতে পারে, তা'হলেও অনেক সুফল পাওয়া যাবে। বাইরের প্রভাব হতে এভাবে ছেলেমেয়েদের মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করাই শিক্ষাসংস্কারের প্রথম ধাপ। সারাক্ষণ বিদ্যালয়ের পরিবেশে থেকে, শিশুরা বিদ্যালয়েই তাদের নিজেদের সমাজ গঠিত করে নিতে পারবে। গণতন্ত্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবে। পাঠাগারে বসে বিভিন্ন পুস্তক পাঠের একটা অভ্যাসও অনেকের ভিতর গড়ে উঠবে। শিক্ষকেরাও সুযোগ পাবেন ছেলেমেয়েদের ভাল করে জানতে। কার, কোথায়, কি ক্রটি আছে জেনে তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও সহজসাধ্য হবে। এভাবে শিশুদের পরিবেশের উন্নতিবিধান না করে শিক্ষাসংস্কারের কাজে হাত দেওয়া পণ্ডশ্রমেরই নামান্তর।

শিক্ষাপদ্ধতি রচিত হয় শিশুর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানকল্পে। শিশুর উপযোগী করেই গড়ে তুলতে হবে শিক্ষাদানের পদ্ধতি। অপর দেশে যে রীতিনীতি প্রচলিত, আমাদের দেশে তারি সবই প্রয়োজ্য নাও ত হতে পারে? আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের চিন্তার ধারা ও সংস্কার অপর দেশের শিশুদের অনুরূপই হবে এ আশা করা যায় না। অতএব, ভিন্ন দেশের শিক্ষাপদ্ধতি হুবহু আমাদের দেশে চালু করতে যাওয়ার বিপদও ত আছে! শিশু যেভাবে গ্রহণ করতে পারে সেভাবেই তাকে জ্ঞানদানের চেষ্টা করা সঙ্গত। শিশুকে বাদ দিয়ে শিক্ষাসংস্কারের কথা ভাবার কোনও অর্থ হয় না। শিশুর জন্যই শিক্ষা, শিক্ষার জন্য শিশু নয়। যে বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে শিশু ধরায় এসেছে তাকে রূপায়িত করতে হলে শিক্ষক সম্প্রদায়কে এবং সাথে সাথে শিশুকেও অকর্মণ্য, অপদার্থ ইত্যাদি বলে গাল দিয়ে কোন লাভ হবে না। শিশুকে সর্বদা শোনাতে হবে আশার বাণী। তাকে জানতে দিতে হবে যে, সে চেষ্টা করলেই মানুষ হতে পারে। প্রত্যেকটি শিশুকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে। যার যেদিকে ঝোঁক সেদিকে অগ্রসর হবার সুয়োগ তাকে করে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, তার বৃদ্ধির পথে যেন কোন অন্তরায় উপস্থিত না হয়! শিশুর মনে যেন কখনও দীনতা-বোধ (Inferiority complex) না জাগে এভাবে তাকে সাহস ও উৎসাহ দিতে হবে। যার যে গুণ আছে সে গুণের সমাদর করে তাকে সবার সাথে এক করে নিতে হবে। তার অপরাপর সঙ্গীদের সাথে

চলতে সে যেন কখনও সঙ্কোচ বা লজ্জা বোধ করার সুযোগ না পায়। সেও যে সবার মতই একজন—এ ধারণা হতে সে যেন বঞ্চিত না হয়। আসল কথা, শিক্ষা দিতে গিয়ে শিশুর ভিতর যে বিরাট পুরুষ ঘুমিয়ে আছে সে কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

(খ) বিষয়বস্তু

যে কাজে আনন্দ নেই সে কাজে অধিক সময় ধরে কাউকে লেগে থাকতে দেখা যায় না। কাজে আনন্দ ফুরিয়ে গেলে মন অন্যত্র ধাবিত হয় আনন্দের খোঁজে। মানুষ আনন্দেরই কাঙ্গাল। যেখানে একটু আনন্দ পাবে সেইখানেই সে ধাবিত হবে এবং সমস্ত মনঃপ্রাণ ঢেলে চেষ্টা করবে আনন্দটুকু আস্বাদন করতে। কিন্তু, এ আনন্দ উপভোগ করার শক্তি, ইচ্ছা এবং পদ্ধতি সবার সমান নয়। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আনন্দের উৎস এবং আনন্দ উপভোগের ধরনও বিভিন্ন। যে দৃশ্য বা বস্তু দেখে অথবা যে কাহিনী শুনে শিশু আনন্দে আটখানা, বালকের মন হয়ত সেই দৃশ্যে ততটা সাড়া দেয় না। শিশুর চাহিদা বালকের চাহিদা হতে স্বতন্ত্র। আবার কিশোরের চাহিদার সাথে বালকের চাহিদার মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এম্নিভাবে মানবশিশুর বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তার চাহিদাও ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকে।

ছড়া আবৃত্তি করে, রংবেরঙের ছবি দেখে শিশুরা পায় প্রচুর আনন্দ। তাইত দেখতে পাই শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে ছবি ও ছড়ার ছড়াছড়ি। শিশুর পুস্তকে তত্ত্বের অনুসন্ধান করতে গেলে তার সব রস শুকিয়ে যাবে, যুক্তি খুঁজতে গেলেও হতাশ হতে হবে। অবাস্তব, অসংলগ্ন যে-কোন কাহিনী বলে যেতে পারেন, শিশুরা খুব মন দিয়ে তা শুনবে। গল্প বলতে বলতে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রাখতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতাও নেই। জীব-জন্তু, পশু-পাখী, সবাই কথা বলছে। কাল্পনিক কাহিনীসমূহের যে বাস্তবের সাথে কোন যোগাযোগ নেই একথা তাদের বললেও তারা বিশ্বাস করবে না। গল্প শুনবার তাদের আকুল আগ্রহ, আবার শুনতে শুনতেই হয়ত কখন তারা ঘুমিয়ে পড়বে। কেননা গল্প শুনে কিছু শিখতে হবে, কেউ কোন প্রশ্ন করলে তার উত্তর দিতে

হবে, এভাবের পরীক্ষা ভীতি তাদের নেই। **এ ভীতি জাগিয়ে দিলে তাদের সব আনন্দ নষ্ট হয়ে যাবে**। পুঁথির জগতে পদার্পণের আগে এভাবে শুনে শুনেই শিশুরা অনেক-কিছু শিক্ষা করে। ইচ্ছা হলে, যা শুনেছে অনর্গল তা বলে যাবে, আবার মনে না ধরলে শত চেষ্টায়ও একটি কথা তাদের মুখ থেকে বের করান যাবে না। ভাবতে হবে বা মস্তিষ্ক চালনা করতে হবে এমন কোন কাজে তাদের লাগাতে গেলেই ঠকতে হবে। একই ধরনের একঘেয়ে কাজে তাদের অধিক সময় আটকে রাখার চেষ্টা অনেক সময়ই কুফল বহন করে আনে। এতে তাদের বিরক্তি জন্মাতে পারে, কাজেই পরিণাম মোটেই শুভ নয়। শিশুরা স্বভাবতঃই চঞ্চল। একবার এটা একবার ওটা, এভাবে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তাদের মন ধাবিত হয়। ক্ষণে ক্ষণে নূতন কথা, নূতন বিষয়, নূতন জিনিস তাদের সামনে উপস্থিত করা দরকার। এক সাথেই যেন ওরা দুনিয়ার সবকিছু জানতে ও বুঝতে চায়। একটা জানা শেষ না হতেই আর একটা জানতে চায়। এ বয়সের শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের চাইতে মুখে মুখে অনেক বেশী শেখান যায়। অতএব, এ বয়সের শিশুদের যারা নিত্য-সহচর তারাই তাদের জীবন্ত পাঠ্যপুস্তক। সমস্যাটি আরও জটিল,—পাঠ্যপুস্তক ত ইচ্ছামত ঢেলে সাজান যায়, কিন্তু শিশুর জীবন্ত পরিবেশটির উপর আমাদের অধিকার কতটুকু? শিশুর যারা নিত্যসহচর, শিশুর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের কিছুটা জ্ঞান থাকা যে অপরিহার্য! শিশুর সব কয়টি 'কেন'র জবাব দেবার মত মোটামুটি জ্ঞান তাদের থাকতে হবে। শিশুর জানবার এ স্পৃহাটি যেন কোন কারণে দমিত না হয়। শিশুর জ্ঞানলাভ করার এ স্পৃহাটি জাগিয়ে রাখতে পারলেই শিক্ষাদান কার্যটি ভবিষ্যতে অত্যন্ত সহজ ও সরল হয়ে উঠবে। পিতামাতা, ভাইবোন, পাড়াপ্রতিবেশী—এরাই হল এ বয়সের শিশুদের জীবন্ত পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তুও এদের অফুরন্ত। এদের জন্য কোন পাঠক্রম (Curriculum) রচনা করে এদের গণ্ডিবদ্ধ করা সঙ্গত নয়। মোট কথা, এদের শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তু যত বেশী জীবন্ত ও বিচিত্র হয় ততই ভাল।

শৈশব পেরিয়ে বাল্যে উপনীত হলেই শিশুতে শিশুতে বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হতে থাকে। তাই তখনকার পাঠক্রমে যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকা সঙ্গত। কল্পনার সীমাহীন ক্ষেত্রের মাঝে ক্রমে ক্রমে যুক্তি-তর্ক

এসে স্থান দখল করে নেয়। এ বয়সের ছেলেমেয়েরাও অবাস্তব কাল্পনিক কাহিনী শুনতে ভালবাসে। তাইত নানারূপ কাহিনীর মারফত এদের জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুসমূহ পরিবেশনের একটা চেষ্টা এদের জন্য লিখিত পাঠ্যপুস্তকে দেখতে পাওয়া যায়। গল্পের নেশায়ই বালক-বালিকারা গল্প পড়বে, এবং তার মধ্য থেকেই তারা আহরণ করে নেবে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় নানা তথ্য। নানা প্রকার কাহিনীর মারফতই তারা সংগ্রহ করে নেবে ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়। আজকাল ছেলে-মেয়েদের কাঁধে নানাধরনের পুস্তকের বোঝা চাপিয়ে তাদের পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে, ছেলের ওজনের চেয়ে পুঁথির ওজন বেশী···ইত্যাদি ধরনের অভিযোগ অনেকেই করে থাকেন। অবশ্য, পুঁথিগত বিদ্যার্জনই যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়, অর্থাৎ, পুস্তকের পাঠ মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করাই যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়, তা'হলে এ অভিযোগের ভিত্তি নেই একথা বলা চলে না। কিন্তু শিক্ষার সাহায্যে যদি পরিপূর্ণ মানব তৈরি করতে হয় তা'হলে পাঠক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ থাকা বাঞ্ছনীয়। পাঠ্য-পুস্তক রচনাকালে বিভিন্ন বয়সের চাহিদার কথা স্মরণ রাখা দরকার। আর একটি কথাও ভুললে চলবে না—বিভিন্ন কালের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক-সমূহ যেন ক্রম অনুসারে সাজান থাকে। একটি স্তরের পুস্তক-পাঠ সমাধা করে যেন অপর স্তরের পুস্তক-পাঠে আগ্রহ জন্মায় এবং অনায়াসে অনুসরণ করতে পারে। শৈশব, বাল্য ও কৈশোর, এই তিনটি স্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তক-সমূহ যেন স্তর-উপযোগী হয় এবং দুইটি স্তরের মধ্যে যেন কোন ছেদ না থাকে। একটি শেষ করেই অপরটি পড়তে যেন কোন বেগ পেতে না হয়।

পাঠ্যপুস্তকে কেবল অতিরিক্ত সংবাদের বোঝা চাপিয়ে দিলেই পুস্তক-খানি উচ্চাঙ্গের হয় না। বরং অতিরিক্ত সংবাদের বোঝা চাপিয়ে শিশুদের অনেকাংশে পঙ্গু করে দেওয়া হয় এবং তারা বাধ্য হয়ে Sure Success-এর শরণাপন্ন হয়। পরীক্ষার চাপে পড়ে বালক-বালিকারা শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তুর মর্ম অনুধাবন করতে যতটা না আগ্রহশীল, তার চেয়ে বেশী ভাবনা কি করে পুস্তকে লিখিত সংবাদসমূহ মুখস্থ করে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিছু জানব, শুনব—এ উদ্দেশ্য নিয়ে খুব কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রীই রোজ বিদ্যালয়ে হাজিরা দেয়। অতএব, পাঠ্যপুস্তকের সংবাদসমূহ যেন ছেলে-মেয়েদের চিত্ত আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এমনি ভাবে সাজিয়ে রাখা

প্রয়োজন। ছেলেমেয়েদের পড়বার বইয়ের একটা সীমানা নির্দেশ করে না দিয়ে তাদের আগ্রহ অনুসারেই পাঠ্যপুস্তকের যোগান দিতে হবে। এরা যদি একবার টের পায় যে ঐ পুস্তকখানি হতেই পরীক্ষার প্রশ্ন আসবে, তা'হলে বাকী সমস্ত পুঁথি ফেলে সেখানা পাঠ করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। পাঠ্যপুস্তক-রচনা সার্থক হবে তখনই, যখন সেই পুস্তকখানা সমাপ্ত করার সাথে সাথেই পাঠাগারে রক্ষিত অপরাপর পুস্তকের মর্ম উদ্‌ঘাটনেও ছেলেমেয়েরা প্রলুব্ধ হয়। পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ছেলেমেয়েরা আনন্দের সঙ্গে সে-সব পাঠ গ্রহণ করতে পারে। পুস্তক-পাঠে মানুষ যে-সব অভিজ্ঞতা অর্জন করে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে সে অভিজ্ঞতাসমূহ যদি তার কোন কাজে না লাগে, তা'হলে সেগুলো আহরণ করতে তার কোন আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক। তা'ছাড়া, আহৃত জ্ঞান প্রয়োগ অভাবে ক্রমে স্মৃতিপথ হতে অন্তর্হিত হয়ে যায়। বই পড়ে এমন সব কথা ছেলেমেয়েদের শিখতে হয় যার কোন প্রয়োজন এ জীবনে আছে কিনা তা তারা ভাবতেই পারে না। অতএব পুস্তকে জ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটির আলোচনা স্থান পাওয়া সঙ্গত। যে পুস্তকে যত বেশী নজীরের উল্লেখ আছে সে পুস্তকই ছাত্রছাত্রীদের নিকট তত বেশী প্রিয়। কেননা ঐ পুস্তক মুখস্থ করে লিখেই পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়া যায়। তাইত দেখতে পাই নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে কে কত বেশী সংবাদ পরিবেশন করতে পারেন তার যেন একটা প্রতিযোগিতা চলছে। ব্যবহারিক জীবনের সাথে যে-সব বিষয়ের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না সে-সব বিষয় বার বার পড়ে কণ্ঠস্থ করা ভিন্ন উপায় থাকে না। কাজেই এসব বিষয় কোনকালেই ছেলেমেয়েদের ধাতস্থ হতে চায় না।

পঞ্চম মানের একটি ছেলে কি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে সে অকাতরে বলে দেবে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। কিন্তু, যদি বলা যায়—সকাল বেলা সূর্য পূবদিক দিয়ে উঠে মাথার উপর দিয়ে পশ্চিমদিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, তা'হলে সূর্য ঘুরছে না একথা কেমন করে বুঝলে? উত্তরে সে অবাক হয়ে মুখের পানে তাকিয়ে থাকবে। ভাববে, হয়ত মাস্টার মশাই ভুল করছেন বা জেনেও ঠাট্টা করছেন। ছাপার অক্ষরে লেখা আছে—পৃথিবী বৎসরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসে—এ কি কখনও মিথ্যা হতে পারে? কিন্তু তারা জানে না এই সংবাদ জগতের কাছে প্রথম যিনি পরিবেশন

করেছিলেন তাঁকে কত না নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের হাতে। না বুঝে, অপরের মতামত এভাবে গ্রহণ করার প্রবণতা চিন্তার দীনতারই পরিচায়ক। কোন প্রকার উপলব্ধি নেই, উপলব্ধি করার বাসনা পর্যন্ত নেই, অথচ তাদেরই মাথায় জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দিতে হবে—এর চেয়ে পণ্ডশ্রম আর কি হতে পারে? গাছ থেকে একটি আতা পেকে মাটিতে পড়ে গেল। সবাই ভাবল বোঁটা থেকে খসে যাওয়াতেই ওটা মাটিতে পড়ে গেল। আর মহামতি নিউটন ভেবেছিলেন, বোঁটা থেকে খসে গিয়ে মাটিতে কেন পড়ল? এপাশে, ওপাশে, উপরে, যেদিকে খুশি যেতে আপত্তি ছিল কি? ভেবে ভেবে তিনি কত নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান আমাদের দিয়ে গেলেন! এমনি ভাবে নিউটনের মত ভাববার স্পৃহা ও অবকাশ, এ দুটি হতেই আমাদের ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত। অপরের উপলব্ধি করা সত্যের বোঝা পুঁথির মারফত সংগ্রহ করে স্তূপীকৃত করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য—এরূপ একটি ধারণা ছেলেমেয়েরা পোষণ করে থাকে। স্তূপীকৃত তথ্যের বোঝা যে যত বেশী দিন এবং যত বেশী করে বহন করতে পারে, যে পরের কাছ থেকে ধার করা বুলি সময়ে অসময়ে যত বেশী করে আওড়াতে পারে তাকেই তত বেশী শিক্ষিত বলে ধরে নিতেই আমরা অভ্যস্ত। বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া কোনকিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হতে দেরি হয় না মোটেই। কাজেই আজ যে কথা বিশ্বাস করে, কাল তাকে মিথ্যা বলে দূরে নিক্ষেপ করতে ছেলেমেয়েরা দ্বিধা করে না মোটেই। এভাবে বিচার করে বুঝবার সুযোগ না পেয়ে, মুখস্থ করে তথ্য আহরণের চেষ্টা করতে করতে মস্তিষ্কের সাথে আহৃত জ্ঞানের কোন যোগাযোগ থাকে না। অতএব পাঠ্যপুস্তকের মারফত বিষয়বস্তুসমূহ এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সেগুলো নিজেদের মত করে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। পুস্তকে এমন সব তথ্য থাকা সঙ্গত নয়, যা তাদের আওতার বাইরে। মোট কথা, বই পড়ে বিদ্যার্থীদের চিন্তা-রাজ্যের দ্বার রুদ্ধ না হয়ে যেন অর্গলমুক্ত হয়। অনেকে হয়ত বলবেন—এ বই পড়েই ত আমাদের দেশে কত বিদ্বান তৈরী হয়েছে। উত্তরে একটি কথা বললেই যথেষ্ট—অপচয়ের হিসেবটিও সঙ্গে সঙ্গে নেওয়া হয়েছে কি?

শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই পাঠক্রম (Curriculum) রচিত হওয়া সঙ্গত। ভারতের সমস্ত বালক-বালিকাকে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এ সিদ্ধান্ত আমাদের সংবিধানে বিঘোষিত। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য সবাইকে শুধু অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করান নয়। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য তাদের উন্নততর জীবন যাপনে সহায়তা করা। এ শিক্ষা লাভ করে ঘরে ফিরে গিয়েও যেন তারা দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানা ভাবে দেশ-বিদেশের খবর সংগ্রহ করতে আগ্রহান্বিত হয়। নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে যেন তারা সকল সময় সচেতন থাকে। অতএব তাদের পাঠক্রমে কিছু কিছু ভূগোল, বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি যেন স্থান পায়। সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন এ-স্তরের পাঠক্রমে নানা ধরনের ক্রিয়া-কলাপের ব্যবস্থা রাখা—ঐ সব কাজের মাধ্যমে যাতে ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠিত হয়। কাজের মধ্য দিয়ে উন্নততর জীবন যাপনের স্পৃহা একবার জাগিয়ে দিতে পারলে পাঠশালা ছেড়ে গেলেও তাদের সে আগ্রহের নিবৃত্তি হয় না। এক কথায়, এ-স্তরের পাঠক্রমটি (Curriculum) যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ (Self-sufficient) হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরি করতে হবে।

এর পরের স্তরের সমস্যা অনেক বেশী। এ-স্তরের অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপন করে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করে নানা প্রকার গবেষণায় নিযুক্ত হবে তাদের সংখ্যা খুব বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নিছক ডিগ্রীর মোহে, বিনা বিচারে সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হলে দেশের মনীষার অপচয় রোধ করা যাবে না। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারল না তারা কি করবে? এ সমস্যার সমাধানকল্পেই এ-স্তরের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। বিষয়বস্তু এমন ভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন রুচির খোরাক এতে থাকে। ছেলেমেয়েদের সর্বপ্রকার দক্ষতার, পরিপুষ্টির সম্যক ব্যবস্থা এ-স্তরের পাঠক্রমে থাকা চাই। যার যেদিকে ঝোঁক, যার যে বিষয়ে দক্ষতা সেদিকে যেন তাকে পরিচালিত করা যায় এমন ভাবে এ-স্তরের পাঠক্রম তৈরি করতে হবে। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক, চিত্রকর, যেই হউক না কেন, সর্বপ্রথম তিনি একজন শিক্ষিত সুনাগরিক। কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রেও ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য এবং কলা বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞানদান দরকার। জীবনের সুন্দর ও সুকুমার বৃত্তিনিচয়ের পরিপুষ্টি ভিন্ন পরিপূর্ণ মানব আখ্যালাভ করা যায় না। মানবসভ্যতার অবদানের বিষয়, দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বিষয় অবগত না হলে মানুষ তৈরির কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অতএব মাধ্যমিক শিক্ষার

পাঠ্যক্রম রচনাকালে লক্ষ্য রাখতে হবে পাঠক্রমটি যেন সীমাবদ্ধ না হয়। জীবনের চাহিদাগুলোর পরিপুষ্টির মোটামুটি ব্যবস্থা যেন এতে থাকে। এভাবে বিভিন্ন স্তরের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ছেলেমেয়েদের সামগ্রিক উন্নতির একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

অতএব সর্বাগ্রে লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে তারপর শিক্ষার সব কয়টি স্তর যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় সেভাবে সুচিন্তিত পাঠক্রম নির্ধারণ করে নিতে হবে। একটি স্তর অতিক্রম করে অপর স্তরে প্রবেশেও যেন কোন বাধা না থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। বিষয়বস্তুর তালিকা নির্দিষ্ট হয়ে গেলে মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের চাহিদার রকম জেনে পাঠ্যপুস্তকে ঐ-সব বিষয়বস্তু বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সাজাতে হবে। পুস্তকলব্ধ জ্ঞানরাশি যাতে ছেলেমেয়েরা তাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাতে পারে সে-সব ইঙ্গিত পাঠ্যপুস্তকে থাকা বাঞ্ছনীয়। জীবনে চলার পথে পুঁথিগত বিদ্যার যদি কোন মিল খুঁজে পাওয়া না যায় তা'হলে ছেলেমেয়েদের সে বিদ্যা অর্জনে কোন আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের ব্যবহারিক দিকটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরতে হবে। এ কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্বও কম নয়। পড়াশুনার উদ্দেশ্য শুধু পাঠ্যবিষয়সমূহ কণ্ঠস্থ করে পরীক্ষার কাগজে লেখাই নয়, জীবনের বহু সমস্যার সমাধানও এতে করে সম্ভব। পাঠ্যবিষয়সমূহকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে যেয়েই আজ আমরা বহু নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। পাঠ্যপুস্তক রচনাকালে তাই চেষ্টা করতে হবে যাতে অধিতব্য বিষয়সমূহের সাথে জীবনের একটা যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। ছেলে-মেয়েরা যখন উপলব্ধি করবে, এইসব পুঁথিগত বিদ্যার অভাবে জীবনে চলার পথে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তখন থেকেই শুরু হবে সত্যিকারের শিক্ষা এবং সার্থক হবে পাঠক্রম-রচনা। আপন আপন প্রয়োজনে যখন শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনে আগ্রহশীল হবে, তখন পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধ গণ্ডি ছাড়িয়ে পাঠাগারে রক্ষিত অপরাপর গ্রন্থাবলীর সাহায্য গ্রহণ করতে তারা নিজেরাই অগ্রসর হবে। এভাবে বিদ্যার্থীরা যখন উপলব্ধি করবে যে, ভাল ভাবে বাঁচতে হলে জ্ঞান অর্জন করা ভিন্ন উপায় নেই, তখন বিষয়বস্তুকে সীমাবদ্ধ করার জন্য আমাদের ব্যতিব্যস্ত হতে হবে না। আত্মস্বার্থের খাতিরেই যখন তারা আত্মচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হবে,

মহত্তর জীবন যাপনের জন্য যখন তাদের স্পৃহা জাগরিত হবে তখন বিষয়-বস্তু নির্বাচনের ভার তারা নিজেরাই গ্রহণ করবে।

শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশ সাধনই যদি শিক্ষার আসল লক্ষ্য বলে আমরা ধরে নিই, তা'হলে শিশুর শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মার বিকাশ সাধনের ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনে মনো-যোগী হতে হবে। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর পাঠক্রমে (Curriculum) নানাবিধ ক্রিয়া-কলাপের ব্যবস্থা রাখাও অপরিহার্য। শুধু বই পড়ে শিশুর সুকোমল বৃত্তিসমূহ কখনো সম্যক পুষ্টিলাভ করতে পারে না। শিশুর চরিত্রগঠনে পুস্তকের চেয়ে জীবন্ত আদর্শের প্রভাব অনেক বেশী। পাঠক্রমে এমন ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবৃত্তি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি মার্জিত হবার সুবিধা হয়। মনের সুকোমল বৃত্তিসমূহের পুষ্টি ভিন্ন মনের সরসতা আসবে কেমন করে? প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেই দুইটি দিক আছে—একটি জাগতিক এবং অপরটি আধ্যাত্মিক। একটিকে বলা যায় জৈব ক্ষুধা এবং অপরটিকে আত্মিক ক্ষুধা নামে অভিহিত করা যায়। আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা ইত্যাদি জৈব প্রেরণার অন্তর্গত। মানুষের অন্তরাত্মার ক্ষুধা জাগতিক সুখভোগে কখনো তৃপ্ত হতে পারে না। তাইত শিক্ষার বুনিয়াদ যদি নীতি ও আধ্যাত্মিকতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে না তুলতে পারা যায়, তা'হলে তাসের ঘরের মত একদিন সে ইমারত ভেঙ্গে পড়বেই। মানুষের হৃদয় ও আত্মাকে উপবাসী রেখে তার পরিপূর্ণ বিকাশ কখনো সম্ভব কি? দেহের ক্ষুধা মেটাবার ব্যবস্থা প্রাণী মাত্রই একভাবে-না-একভাবে করে থাকে। মনের ও আত্মার ক্ষুধা মেটাবার প্রেরণাই আজ মানুষকে ইতর প্রাণীর থেকে অনেক দূরে নিয়ে এসেছে। এজন্যই শিক্ষার বিষয়বস্তুতে মানুষের মন ও আত্মার বিকাশসাধন-উপযোগী সরঞ্জামের অভাব যেন কখনো না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়—চরিত্রগঠনই ছিল তখনকার দিনের শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষাচার্যগণ ভাবতেন বিদ্যার সার্থকতাই চরিত্রগঠনে। বিদ্যার্জন করতে হলে—প্রথমে আলস্য, অহঙ্কার, লোভ, মোহ, চপলতা, ঔদ্ধত্য, অভিমান ইত্যাদি বিদ্যার্থীকে পরিত্যাগ করতে হবে। মোট কথা, কঠোর সংযমের মধ্য

দিয়ে বিদ্যার্থীকে তার মনটিকে গুরুর উপদেশ গ্রহণের উপযোগী করে তুলতে হত; তপস্যার প্রভাবে শিষ্যের শরীর ও মন প্রস্তুত না হলে, আচার্যগণ তাকে কোন উপদেশই প্রদান করতেন না। সে-যুগে প্রতিটি বিদ্যার্থীকে সবার আগে ব্রহ্মচর্য-ব্রত অবলম্বন করতে হত। ব্রহ্মচর্য কথাটি শুনেই আজকাল আমরা অনেকেই আঁৎকে উঠি। কিন্তু, এ ব্রত অবলম্বনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল শরীর ও মনকে সমস্ত রকম অপচয়ের হাত হতে রক্ষা করার যোগ্যতা অর্জন। এ ব্রত-গ্রহণকারীকে সর্বদা মনেপ্রাণে উচ্চভাব পোষণ করিতে হত। সমস্ত প্রকার ক্ষুদ্রতা পরিহার করে মহান আদর্শকে সম্মুখে রেখে অগ্রসর হতে হত। এ ব্রত পালনের মধ্য দিয়েই বিদ্যার্থীর মন ও আত্মা ক্রমশঃ বিকাশলাভ করত। ভারতের প্রাচীন আদর্শসমূহ আজ আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে কাল্পনিক আখ্যায়িকায় পরিণত হয়েছে। বৃক্ষের মূল ছিন্ন করে আজ আমরা শুধু গোড়ায় জল ঢেলে তাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টায় মেতে আছি বলে মনে হয়। শিক্ষার প্রবাহ আজ জাতীয় খাত ছেড়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরে ছুটে চলেছে। তাই স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-সংস্কারের ধারা লক্ষ্য করে আজ আশায় বুক বাঁধতে পারছি কই? উপমন্যুর গুরুভক্তি, একলব্যের গুরুদক্ষিণা—এ সবই আমাদের শিশুদের কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্যই রয়ে গেল! জানিনা এর পরিণাম কি! শিক্ষার বিষয়বস্তু আজ শিক্ষা-সংস্কারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; কিন্তু, বিষয়বস্তু পরিবেশনের মূল উদ্দেশ্য—শুধু শিশুর কাছে সংবাদের ফিরিস্তি উপস্থাপিত করা নয়, শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশসাধনের উদ্দেশ্যেই শিশুর পাঠক্রম (Curriculum) রচিত হওয়া সঙ্গত।

(গ) শিক্ষক

শিশু স্বভাবতঃই অনুকরণপ্রিয়। সে চায় তার পরিবেশের সবকিছু অনুকরণ করতে এবং এ কাজটি অনেক সময় তার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ব্যতীতও সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাইত নিকটতম পরিবেশের ছাপটি শিশুতে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়। কোন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা না করেও শুধু কেবল ভাল ভাল আদর্শ এ সময় তাদের কাছে ধরে রাখতে পারলেই তাদের জীবনের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে গড়ে উঠবে সন্দেহ নেই। অতএব বলা যেতে পারে, শিশুশিক্ষার প্রধান উপকরণ আদর্শ পিতামাতা এবং উচ্চ আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা।

তুমি যদি আমায় ভালবাস, শ্রদ্ধা কর, তা'হলে তোমার ছেলেমেয়েরাও আমায় ভালবাসবে ও শ্রদ্ধা করবে। শিশুরা যখন দেখবে—সমাজে শিক্ষকের স্থান কত উঁচুতে, সবাই তাঁদের দেখে কেমন শ্রদ্ধায় মাথা নত করে, তখন অজ্ঞাতসারেই তাদের মনে শিক্ষকের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠবে না কি? অতএব, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্", এ বাক্যটির মর্যাদা রক্ষার ভার প্রকৃতপক্ষে সমাজকেই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় প্রহসন হল,—যাঁদের উপর জাতিগঠনের ভার ন্যস্ত তাঁরাই বুঝি আজ সমাজে সকলের চেয়ে বেশী উপেক্ষিত। যাঁদের হাতে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ভার দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত, তাঁরাই আজ সমাজের বিচারে সবচেয়ে অমানুষ। এহেন দুর্ভাগ্য কোন কালে কোন দেশের হয়েছে কিনা তার নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। জেনেশুনেই যেন কতিপয় অজ্ঞলোকের হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে আছি মানুষ তৈরি করার কারখানার দায়িত্ব। সুদক্ষ কারিগর জোটাতে পারছি না অথচ কারখানাগুলো একে একে বন্ধ না করে বরং বাড়িয়েই চলেছি। জাতির পক্ষে এটা একটা বিরাট অপচয় নয় কি? অতি অল্প সংখ্যক কারিগর যাঁরা স্বেচ্ছায় জাতিগঠনের এ গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, দলের সাথে বিচার করে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদাও আমরা তাঁদের দিতে পারছি না। এ ছাড়া, শিক্ষক ভাল কি মন্দ সে বিচারের বর্তমান মাপকাঠি হল বিদ্যালয়ের পাসের সংখ্যা। বিদ্যালয় থেকে কয়টি ছেলে মানুষ হয়ে বের হল সে বিচার করবার প্রবৃত্তিও যেন আমাদের নেই। আমরা এতই নির্জীব হয়ে পড়েছি।

সমাজের বিচারের মাপকাঠি যেমন ভ্রান্ত, শিক্ষক সম্প্রদায়ের কর্তব্যে অবহেলা, তাও তেমনি সুস্পষ্ট। আমি যদি বুঝি তোমাদ্বারা আমার উপকার হচ্ছে, তা'হলে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধাও আপনা হতেই উদয় হবে না কি? প্রতিটি পিতা তাঁর পুত্রের মঙ্গলকামনাই করেন, এবং যাঁরা তাঁর পুত্রের শুভ কামনা করেন তাঁরাও তাঁর কাছে নিশ্চয়ই প্রিয়। অতএব, শিশু-দরদী শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্বভাবতঃই সমাজে আদৃত হবেন এতে আর সন্দেহ কি? যাঁদের দ্বারা উপকৃত হচ্ছি তাঁদের একটু খাতির করব না? সমাজ যখন উপলব্ধি করবে তার ভাবী বংশধরেরা এঁদের চেষ্টায়ই এক একটি সুনাগরিক তৈরী হচ্ছে, তখন আপনা হতেই

শ্রদ্ধায় তার মাথা নত হয়ে আসবে না কি? তা'হলে বর্তমান শিক্ষক সম্প্রদায়ের এ হীন অবস্থার জন্য দায়ী কে?

জীবনসংগ্রামে যাঁরা পরাজিত, গ্রাসাচ্ছাদনের অপর কোন ব্যবস্থা করতে যাঁরা অক্ষম, সর্বপ্রকার ঝঞ্ঝাট এড়াতে যাঁরা ব্যস্ত, তাঁরাই শেষ পর্যন্ত অগতির গতি শিক্ষকতা পেশাটিকে গ্রহণ করে অযথা হাঙ্গামার হাত হতে রেহাই পাবার চেষ্টা করেন এবং আজীবন অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে বৈরাগ্য ধর্মের মহিমা কীর্তনে শান্তি পাবার একটা অপচেষ্টা করেন। মানুষের প্রবৃত্তি যে, কোন সময় ভাল হতে পারে সে বিষয়ে তাঁরা হয়ে পড়েন অতিমাত্রায় অবিশ্বাসী ও উপহাসপরায়ণ। শিক্ষক-সমাজে এ দলের লোকের সংখ্যা বর্তমানে নিতান্ত নগণ্য নয়। যে পেশাটি গ্রহণ করেছি তাতে একটুও খুশী নই, গজগজানি লেগেই আছে অথচ ছাড়তেও পারছিনে। এ যেন অদৃষ্টের এক নিষ্ঠুর পরিহাস। প্রাণের টানে নয়, প্রাণের দায়েই অধিকাংশ ব্যক্তি এ পেশাটিকে জীবনের সম্বলরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তাইত এ পেশাটির প্রতি সুবিচার করতেও কারো মন চায় না। এ পেশায় কারো পেট ত ভরেই না, মনের খোরাকের সন্ধান করবারও অবকাশ নেই। দেশের কৃতী সন্তানগণ কেউ এ পথে আসতে চান না কেন? তাঁদের আকর্ষণ করার কোন ব্যবস্থাই এ পেশায় নেই। গ্রাসাচ্ছাদনের মোটামুটি ব্যবস্থা করাও এ বৃত্তিটির সাহায্যে আজকাল একরূপ অসম্ভব। শিক্ষার ক্ষেত্রে আজও আমাদের দেশে উপযুক্ত লোকের নিতান্ত অভাব এটা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। কচি প্রাণ নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁদের মধ্যেই যে প্রাণের কোন সাড়া খুঁজে পাওয়া যায় না! সেবা হিসাবে এ পেশাটিকে অনেকেই গ্রহণ করতে পারেননি বলেই অধিকাংশ শিক্ষক কাজ করে যাচ্ছেন গতানুগতিক ভাবে। জীবন্ত মানবশিশু নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁদের পক্ষে এ ধরনের জড়তা, উৎসাহহীনতা ইত্যাদি শুধু অন্যায় নয় অপরাধও বটে। কোন প্রকার লক্ষ্য নেই, মন নেই, জানবার বা জানাবার ইচ্ছা নেই, শুধু চাকরির খাতিরে সময় মত হাজিরা দিতে পারলেই হল। কি হল, কি পেলাম —সে-সব হিসেবের বালাই নেই, শুধু মাসকাবারে বেতনটি পেলেই হল। দেশগঠনের সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব যাঁদের হাতে ন্যস্ত তাঁদের এ প্রাণহীনতা জাতির পক্ষে মারাত্মক, সন্দেহ নেই। সমগ্র শিক্ষক-সমাজ আজ সমাজের

বিচারে অতিশয় হেয়। এ সম্প্রদায়ের নানা কুৎসা রটনায় আজ সবাই মুখর। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিদ্রূপ সমালোচনায় অনেকে স্থান, কাল এবং পাত্রের বিচারেও উদাসীন। শিষ্যের নিকট গুরুনিন্দার যে কি বিষময় ফল ফলতে পারে সে কথা বিচার করার সদিচ্ছারও অভাব। কিন্তু এ ব্যবস্থায় উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত। সেবা হিসাবে এ পেশাটিকে গ্রহণ করা যায় তখনই যখন নিজের জন্য, নিজের পরিবারবর্গের জন্য ভেবে ভেবে সারা হতে হয় না। মোটামুটি খেয়ে পরে থাকার একটা সংস্থান হলেও কিছু সংখ্যক সেবাপরায়ণ, কর্মনিষ্ঠ, আদর্শ ব্যক্তিকে এ পথে আকৃষ্ট করা যেত।

এককালে নাকি আমাদের দেশে শিক্ষাগুরুগণই ছিলেন সমাজের কর্ণধার। আর আজ তাঁরাই রয়েছেন সমাজের নিম্নতম স্তরে। সমাজে মান-সম্ভ্রম, এ সবই আজকাল টাকার অঙ্কের দ্বারাই পরিমাপ করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভবিষ্যৎ কি? যাঁদের নিজেদের কোন ভবিষ্যৎ নেই, তাঁরা যে কেমন করে জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবেন তা বুঝে উঠা কষ্টকর। একটি সত্যিকারের কাহিনী এস্থলে উল্লেখ করতে চাই। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ একদিন সামান্য কারণে বিরক্ত হয়ে তাঁর নাতিকে যৎকিঞ্চিৎ প্রহার করেছিলেন। শিশু তাঁকে তখনই শুনিয়ে দিয়েছিল—মাস্টার মশাইর কাছে নালিশ করে এর শাস্তি তোমায় দেব। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বিচার করবেন একজন কুড়ি টাকা মাইনের গৃহশিক্ষক! কিন্তু দাদুর শাস্তি বিধান করতে তার মাস্টার মশাই যে উপযুক্ত এতে শিশুর কিছুমাত্র অবিশ্বাস ছিল না। কারণ টাকায় মাপা মানের হিসাব তখনও বালকের মনে স্থান পায় নি। জাস্টিস্ ভাবতে লাগলেন—তাইত, মাস্টার মশাই তাঁর নাতির অভিযোগ শুনে যদি বিচার করতে সাহস না পান তা'হলেও শিশুর অমঙ্গল হবে! ভেবে ভেবে তিনি পরের দিন সকালে মাস্টার মশাই বাড়ী আসবার পূর্বেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, আপনি যদি আপনার ছাত্রের নালিশ শুনে আমার বিচার করতে সাহস না পান তা'হলে ত আপনার প্রতি আমার নাতির শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি নালিশ শুনে আমাকে আপনার সমক্ষে হাজির করিয়ে আমার জরিমানা করবেন এবং জরিমানার টাকা হাত পেতে নিয়ে পকেটে রাখবেন। যথারীতি বিচার

হল। বিচারে জাস্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষের জরিমানা হল পাঁচ টাকা। তৎক্ষণাৎ জরিমানার টাকা এনে তিনি তাঁর নাতির মাস্টার মশাইকে দিলেন। শিশুর মুখমণ্ডলে আনন্দের আভাষ ফুটে উঠল এবং জাস্টিস্‌ও তাঁর বংশ-ধরের ভবিষ্যৎ ভেবে মনে মনে উৎফুল্ল হলেন। সে শিশুটি আর কেউ নয়, সার্ এ. কে. রায়। আমরা আজ কোথায় চলেছি! তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি আমার বংশের দুলালকে মানুষ করতে; কিন্তু তোমার কথা ভাবতেই যে আমার নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে! অপরাধ কার? প্রচলিত সমাজের নৈতিক মান এমন একটি স্তরে এসে পৌঁছেছে যাতে সমাজের সর্বক্ষেত্রেই দুর্নীতি অবাধে তার বিজয় নিশান উড়িয়ে চলেছে। অনেকেই এ অভিযোগ করেন—শিক্ষক-শিক্ষিকারা আজকাল টিউশান করেই সময় পান না, স্কুলে ভাল করে পড়াবেন কখন? সংসারে থাকতে হলে, ছেলেমেয়েদের মুখে দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান করার চেষ্টা করা বোধ হয় অপরাধ নয়। পরিবারটিকে বাঁচাতে হলে গৃহশিক্ষকতা ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অপর এমন কোন সুযোগ নেই যাতে তাঁদের আয়ের স্বল্পতাটুকু পূরণ করা যায়। গৃহশিক্ষক যাঁরা রাখেন তাঁদের অনেকেই শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধার কথাও আমল দিতেই চান না। ভাবেন পয়সা দিয়ে যখন গৃহশিক্ষক রেখেছি তখন নিশ্চয়ই আমার ছেলে এবার পরীক্ষায় পাস করবে। তারপর পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে ফলাফল দেখে অমনি শিক্ষকের গুণাগুণের বিচার হয়ে গেল: ছেলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে রায় বেরিয়ে গেল—শিক্ষকটি অকর্মণ্য; আর কৃতকার্য হলে বুঝতে হবে—সত্যি শিক্ষকটি পড়াতে জানেন। যে গৃহশিক্ষকের হাতে বেশী ছেলে পাস করে, বাজারে তাঁর চাহিদাও বেড়ে যায়। তাঁকে নিযুক্ত করতে পারলেই যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। একদল, যাঁদের ভাগ্যে ভাল টিউশনি যোগাড় হল না, তাঁরা ভাবেন অমুকের হাতে এত ছেলেমেয়ে পাস করে কেমন করে? অনেক সময় দেখা গেছে যাঁদের হাতযশ বেশী তাঁদের পড়াবার কৌশল হয়ত ন্যায়নীতির বিচারে টিকছে না। অথচ অভিভাবকগণ জেনেশুনেও তাতে প্রশ্রয় দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। কারণ, তাঁদের লক্ষ্যই যে, শুধু ছেলেকে পরীক্ষায় পাস করান! শিক্ষার জগতে এমনি ভাবে দুর্নীতি এসে ক্রমে ক্রমে আসর জাঁকিয়ে বসছে। দোষ দেব কাকে? গরজ বড় বালাই। আমার প্রয়োজন

সিদ্ধ হলেই হল, অপরের কি হল না হল সে বিচারে আমার প্রয়োজন? বাঁচার তাগিদে আমি যে পথ ধরে চলেছি এই আমার কাছে ন্যায়ের পথ। তোমার ছেলেকে মানুষ করতে হবে বলে আমার কাছে দাবি জানাচ্ছ, কিন্তু আমার ছেলের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার নিতে ত কই তোমরা কেউ ছুটে আসছ না! তোমার ছেলের জন্য প্রাণপাত করব, অথচ আমার ছেলেমেয়ে খেতে না পেয়ে প্রাণ হারাবে—এ দাবি নিতান্ত একতরফা নয় কি? একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাব এ ক্ষেত্রেও দেনা-পাওনার সম্বন্ধই ক্রিয়া করছে। আমার দাবি তুমি পরিশোধ কর, তা'হলে তোমার দাবি আমিও মেনে চলব। কিন্তু শিক্ষা-সংস্কারের নামে আমরা শুধু নূতন নূতন পদ্ধতি আমদানি করতেই ব্যস্ত, নূতন নূতন বিষয়-বস্তুর সমাবেশ করেই আমরা শিক্ষার উন্নতি বিধানে একধাপ এগিয়েছি মনে করে সান্ত্বনা লাভ করছি। কিন্তু যাঁদের উপর সবকিছু চালু করার দায়িত্ব, তাঁদের কথা ভাববার আমাদের অবকাশ কই? ঢাল-তলোয়ার আছে কিন্তু প্রকৃত সৈনিক কোথায়? ভারী ভারী যন্ত্রপাতি আছে কিন্তু চালক যে নির্জীব। এমনি ভাবে আমাদের সমস্ত শ্রমই পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হতে চলেছে যে। তাজমহল গড়ে তুলতে চাই,—ইট-পাথর ইত্যাদি যাবতীয় সরঞ্জাম প্রস্তুত—অথচ উপযুক্ত কারিগর দেশে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

"Are teachers born or made?" সুশিক্ষকের যে-সব গুণাবলী থাকা দরকার তার সবই কি আয়ত্ত করে নেওয়া চলে? শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই জেগে ওঠে শিশুর ঘুমন্ত শক্তি। ব্যক্তিত্বের সোনার কাঠির স্পর্শে শিশুর চৈতন্য জেগে উঠলে অজ্ঞানতারূপ রাক্ষসী সভয়ে দূরে পালিয়ে যায়। শিক্ষকের ইচ্ছাশক্তির তেজ শিশুতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েই শিশুকে শক্তিমান করে তোলে। সুশিক্ষকের কাজ কেবল শিশুর বুদ্ধিকে মার্জনা করা নয়, তার ইচ্ছাকে কল্যাণ-উন্মুখী করাই শিক্ষকের আসল কাজ। এই ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্ব সবটাই অনুশীলন-সাপেক্ষ কি? ব্যক্তিত্বের উন্মেষ সকল মানুষে সমান হবে এ আশা করা যায় না। আর, যে বাতি নিজেই জ্বলছে না সে কেমন করে অপর বাতির শিখাসমূহ প্রজ্বলিত করবে? আদর্শ শিক্ষক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"A teacher can never truly teach unless he is still learning

himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. The teacher who has come to end of his subject, who has no living traffic with his knowledge, but merely repeats his lessons to his students can only load their minds, he cannot inspire them. Truth not only must inform but also inspire. If the inspiration dies out, and the information only accumulates then truth loses its infinity. The greater part of our learning in the schools has been wasted because for most of our teachers their subjects are like dead specimens of once living things, with which they have a learned acquaintance, but no communication of life and love."

শুধু বিদ্যালয়ের উচ্চডিগ্রী-সম্পন্ন হলেই সুশিক্ষক হওয়া যায় না। শিক্ষক শুধু একটি খবরের উৎস নয়। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীর নিকট জীবন্ত আদর্শ। শিক্ষক শিশুর বন্ধু, উপদেষ্টা এবং পরিচালক। শিক্ষক-শিক্ষিকার উন্নত চরিত্রের প্রভাবেই শিশুর চরিত্রের ভিত্তি গঠিত হয়। শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব অজ্ঞাতসারে শিশুর সম্যক আচরণকে প্রভাবিত করে।

শিক্ষাদান কার্যে যাঁর আন্তরিক আগ্রহ আছে এমন ব্যক্তিকেই শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা সঙ্গত। এ কাজটিকে যিনি দেশের তথা মানব-গোষ্ঠীর সেবা হিসাবে গ্রহণ করতে জানেন, ছাত্রছাত্রীর সামগ্রিক উন্নতিতে যিনি স্বর্গীয় আনন্দ উপলব্ধি করেন তিনিই প্রকৃত শিক্ষক পদবাচ্য। শিক্ষাদান কার্যটি একটি কৌশলপূর্ণ (Technical) কার্য। এ কৌশলটি আয়ত্ত না করে শিক্ষাকার্যে ব্রতী হওয়া আর শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা একই কথা। প্রকৃত শিক্ষক হতে হলে যে-সব গুণাবলী অপরিহার্য তার সবগুলোই চেষ্টা করে আয়ত্ত করা যায় না। আত্মপ্রত্যয়, মৌলিকতা, কর্মচাতুর্য, মেজাজ, মর্জি, ধৈর্য, প্রফুল্লচিত্ততা, সরলতা, রসজ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইত্যাদি গুণ প্রায়ই অর্জন করার অপেক্ষা রাখে না, স্বাভাবিক ভাবেই ব্যক্তিতে উপজাত হয়। কিন্তু, উচ্চশিক্ষা, শিশু-মনোবিজ্ঞানের রহস্য, বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির মর্ম, সুশাসনের নিয়ম,

অধ্যয়নের অভ্যাস ইত্যাদি ধরনের গুণাবলী অবশ্য অর্জন করেই নিতে হয়। চেষ্টা করলে যে-কেউ অল্প সময়ে এইসব গুণের অধিকারী হতে পারেন। অতএব একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে—A teacher is born and then made. অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষক হতে হলে শুধু স্বাভাবিক গুণাবলীর অধিকারী হলেই যেমন চলে না, তেমনি কেবলমাত্র শিক্ষার সাহায্যেই প্রকৃত শিক্ষক গড়ে তোলাও যায় না। অতএব কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কা দেখেই শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করা হলে শিক্ষকতা পেশাটির মর্যাদা নাও রক্ষিত হতে পারে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যাঁরা দলে দলে চাকরির চেষ্টায় ইতস্ততঃ ঘুরতে থাকেন, তাঁদের মধ্য থেকে এ পেশার উপযুক্ত ছেলেমেয়ে বাছাই করে শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করলে অচিরে দেশে উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রতিভাবানকে আকর্ষণ করার মত কোন ব্যবস্থা এ পেশাটিতে নেই। অতএব, পূর্বাহ্ণে এ পেশাটিকে এমন আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করতে হবে যাতে দেশের কৃতী সন্তানগণ স্বেচ্ছায় এ পেশাটি গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। আজ আমাদের দেশের শিক্ষক সম্প্রদায় এমন একটি শোচনীয় অবস্থায় নিপীড়িত হচ্ছেন যে, তাঁদের দেখে স্বেচ্ছায় কোনও গুণী এ পথ মাড়াতে চান না।

শিক্ষকতা কার্যটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে, অপরাপর যে-কোন পেশার সুবিধাসমূহের কথাও সবার সমক্ষে উপস্থিত করতে হবে। সদ্ভাবে, শান্তিতে জীবন যাপন করতে হলে শিক্ষকতার তুল্য পেশা আর নেই। অপরাপর প্রায় সর্বক্ষেত্রেই মানুষের অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার পড়ে থাকে বস্তাবন্দী হয়ে। জীবনের সাথে তার কোনও যোগাযোগ থাকে না। কিন্তু শিক্ষকের পক্ষে আহৃত জ্ঞানের প্রয়োগ ও তার বৃদ্ধি সাধনের অফুরন্ত সুযোগ-সুবিধা বর্তমান। এ পেশায় আজীবন সত্যকে আশ্রয় করে চলতে হয় বলে মানুষ বিনা আয়াসেই সত্যাশ্রয়ী হবার সুযোগ পায়। এ পেশার মাধ্যমে মানুষ উপভোগ করার সুযোগ পায় সৃষ্টির যে কী অপূর্ব আনন্দ। ক্ষুদ্র একটি চারাগাছকে যত্ন করে যখন তাকে সতেজ করে তোলা হয়, পত্রে পুষ্পে যখন উদ্ভিদ্-শিশুটি শোভিত হয়, তখন বাগানের মালীর অন্তর অফুরন্ত আনন্দে ভরে ওঠে। শিক্ষকের অক্লান্ত পরিশ্রমেও যখন কচি কচি শিশুর দল শরীরে ও মনে পুষ্ট হতে থাকে তখন সফলতার আনন্দে শিক্ষকের

মনও ভরপুর হয়ে ওঠে না কি? ক্ষুদ্র বৃক্ষশিশু যখন কালক্রমে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়, তার সুমিষ্ট ফলে যখন মানবের রসনার তৃপ্তিবিধান করে, তার শাখা-প্রশাখায় যখন সে বিহঙ্গকুলকে আশ্রয় প্রদান করে, তখন সে দৃশ্য দেখে, সবচেয়ে তৃপ্তিলাভ করেন তিনি যিনি সর্বপ্রযত্নে বৃক্ষশিশুটির সর্বাঙ্গীণ পুষ্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। যে শিক্ষকের চেষ্টায় ও যত্নে মানবশিশুর স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ সম্যক পুষ্টিলাভ ক'রে তাকে একটি খাঁটি মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে তাঁর মত ভাগ্যবান আর কে আছে? গুরুর আনন্দ শিষ্যের সাফল্যলাভে। গুরুর গৌরব বাড়ে শিষ্যের গৌরববৃদ্ধিতে। শিষ্যের যশোলাভেই গুরু যশস্বী। শিক্ষক-জীবনে গর্ব করার মত আর কি আছে? তাঁর না আছে বিত্ত, না আছে প্রতিপত্তি। তাঁর সম্বলের মধ্যে আছে শুধু তাঁর নিজহাতে গড়া কয়েকটি মানুষ। তিনি নিঃসন্তান হলেও পুত্রহীন নন্। এ পৃথিবীতে জ্ঞানে গরিমায় যাঁরা মানবসমাজের শীর্ষস্থানে আরোহণ করেছেন তাঁরা সবাই যে একদিন এই গরীব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছেই প্রথম পাঠ শুরু করেছিলেন। দেশের গরীব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কারবারের মূলধন এই সব কচি কচি শিশুর দল। কিন্তু এরাই হয়ত একদিন জগতের শীর্ষস্থানে আরোহণ করে তাদের কৃতকৃতার্থ করবে। এভাবে ভেবে দেখলে, শিক্ষকতা পেশাটির প্রতি অনুরাগ বর্ধিত হবে। এ অতি দীন বৃত্তিটি অবলম্বন করেও যে জীবনে পরমানন্দ লাভ করা যায়—কথাটি দেশের কৃতী সন্তানগণকে আর একবার ভেবে দেখতে হবে।

প্রাচীন ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে—শিক্ষাগুরুরাই ছিলেন তখন সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চালক। শিক্ষাগুরুর আসনে উপবিষ্ট হয়েই তাঁরা সমাজের রীতিনীতির সবকিছুর নির্দেশ দিতেন। তাঁদের হাতে গড়া মানুষের দ্বারাই গঠিত হত সমাজের আদর্শ। গুরুর পদতলে উপবিষ্ট হয়েই শিষ্যগণ একান্ত মনে পাঠ গ্রহণ করত। গুরুর বাক্য পালন করতে তারা প্রাণপাত করতেও কুণ্ঠিত হত না। গুরুর কৃপা ভিন্ন কোন অভীষ্টই লাভ হতে পারে না এই ছিল তাদের বদ্ধমূল ধারণা। সমাজের সবাই নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের গুরুর আশ্রমে পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতেন। জাতিগঠনের সমস্ত ভারই ন্যস্ত ছিল শিক্ষাগুরুদের হাতে। মানবশিশুর ভিতর যে দেবতা ঘুমিয়ে আছেন, তাঁকে জাগিয়ে তোলাই ছিল শিক্ষা-

গুরুদের লক্ষ্য। সমাজের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধানে শিক্ষাগুরুদের অবদান ছিল অসামান্য। বিনিময়ে সমাজের কাছ থেকেও পেতেন তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা। গুরুই ছিলেন শিষ্যের জীবন্ত আদর্শ। গুরুর জীবনধারা, গুরুর আদর্শ চরিত্র, আত্মত্যাগ, দায়িত্বজ্ঞান, এ সবই শিষ্যের অনুকরণীয় ছিল। শিক্ষাগুরুগণ শিক্ষাদানের বিনিময়ে অর্থোপার্জনের কথা তখন ভাবতেই পারতেন না। তাঁরা জানতেন—যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে। বিদ্যাদান করাই ছিল তাঁদের ধর্ম। অবশ্য তখনকার দিনে আর্থিক সমস্যায় এখনকার মত তাঁদেরকে এত বিব্রতও হতে হত না। তখনকার পরিবেশ এখন আমাদের কল্পনার বিষয়বস্তু। এসব সত্ত্বেও প্রকৃত শিক্ষক হতে হলে যে-সব গুণ থাকা একান্ত দরকার তা সবই তখনকার দিনের আচার্যগণের কাছ থেকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কা থাকলেই শিক্ষক হওয়া যায়—এ ধারণা আমাদের পাল্টাতে হবে। আদর্শভ্রষ্ট সমাজে আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজনই সমধিক। শিক্ষা-সংস্কারের কাজে হাত দেবার সাথে সাথেই আমাদের বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে হবে কি করে দেশে উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বাড়ান যায়। উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হলে সর্বাগ্রে দেশের আদর্শ চরিত্রের লোকদের এপথে টেনে আনার চেষ্টা করতে হবে। কেবল আদর্শ শিক্ষকই পারে আদর্শ সমাজ গঠনে সাহায্য করতে। আদর্শ শিক্ষক তৈরির কাজটিকে মুলতবি রেখে নূতন নূতন পাঠক্রম, নূতন নূতন পাঠদান-পদ্ধতি আবিষ্কার করে গেলেই শিক্ষার মান উন্নত হবে এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক।

কেন, কিসের অভাবে আজ দেশের সুসন্তানগণ শিক্ষাগুরুর আসন অলঙ্কৃত করতে এগিয়ে আসছেন না? দেশের জন্য তাঁদের কি কোন দরদ নেই? জাতির উন্নতিবিধানকল্পে সামান্যতম ত্যাগস্বীকারেও আজ আমাদের এ কুণ্ঠা কেন? জাতীয়তাবোধের এ দুর্ভিক্ষ কবে কেমন করে এ দেশের জনগণের মধ্যে দেখা দিল? শিক্ষাসংস্কারকদের এসব সমস্যা সমাধানের ভার নিতে হবে না কি? সমাজের সর্বক্ষেত্রেই আজ যে অসহযোগিতা, সহানুভূতিহীনতা বিরাজ করছে, তার প্রতিকারের পন্থাও তাঁদেরই ভেবে স্থির করতে হবে। শিক্ষার সংস্কার করতে গিয়ে যেমন সমাজের গলদের প্রতি উদাসীন থাকা চলে না, তেমনি সমাজকে ব্যাধি-

মুক্ত করতে হলেও শিক্ষার মারফতই অগ্রসর হতে হবে। অতএব, এ উভয় সমস্যাকে এক করে দেখা প্রয়োজন। সমাজের প্রয়োজন যেমন শিক্ষক মেটাবেন, শিক্ষকের প্রয়োজন মেটাবার ভারও তেমনি সমাজকেই গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষকের যদি লক্ষ্য থাকে উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করে সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, তা'হলে সমাজেরও লক্ষ্য থাকবে শিক্ষাগুরুদের সর্বপ্রযত্নে সাহায্য করা। এবং এ সহযোগিতার ভিত্তিতেই অভীষ্টলাভ সম্ভবপর। আদর্শ জাতিগঠন করার উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষা-সংস্কারের কাজে অগ্রসর হলে একযোগে উভয় সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। কচি কচি ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরূপ সমালোচনা করে কর্তব্য শেষ করলে চলবে কি ?

শিশু, সমাজ ও শিক্ষক, এ তিনটি ধারাকে যেদিন এক করে ভাবা যাবে, যেদিন এ তিনটি ধারা এক সাথে মিলিত হবে—সেদিনই হবে ত্রিবেণী তীর্থের উৎপত্তি। সে তীর্থের পুণ্যসলিলে অবগাহন করে জাতি হবে পুণ্যময় ও শান্তিময়।

(ঘ) শিক্ষার উদ্দেশ্য

কোন নূতন কাজে হাত দেবার পূর্বে এ প্রশ্নটি স্বভাবতঃই মানুষের মনে জাগে—কেন আমি এ কাজটি করতে যাচ্ছি ? এ কাজের উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য স্থির হয়ে গেলে লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায়ের জন্য ভাবতে হয় না। যে-কোন পথ ধরেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছান যায়। দুদিন আগে অথবা দুদিন পরে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষার উদ্দেশ্য একবার নির্ধারিত হয়ে গেলে উপায় আপনা হতেই আবিষ্কৃত হবে।

মানবশিশুর অভিজ্ঞতা অর্জনের কাজটিকেই মোটামুটি শিক্ষা বলা যায়। জীবনেরই কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, অথচ শিক্ষা আছে কথাটি কেমন খাপছাড়া। আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তুত করাকেই যদি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য বলে আমরা ধরে নিই, তা'হলে শুধু খেয়ে বেঁচে থাকাই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। শুধু খেয়ে পরে থাকলেই কি মানুষের চলে ? সে চায় উন্নততর, আরও মহত্তর জীবন যাপন করতে। তা'হলে একাজে তাকে সাহায্য করাই শিক্ষার আসল

উদ্দেশ্য হওয়া সঙ্গত। শিক্ষার আর আর যে-সব লক্ষ্যের কথা আমরা শুনতে পাই যেমন,—**মানুষকে স্বাবলম্বী করা, মানুষের জ্ঞানের স্পৃহা বৃদ্ধি করা, তার চরিত্রগঠনে সহায়তা করা, তাকে আদর্শ নাগরিক করে গড়ে তোলা** ইত্যাদি ইত্যাদি, সমস্তই আনুষঙ্গিক হিসাবে এসে যাবে, যদি শিক্ষার মূল লক্ষ্যটি হতে আমরা বিচ্যুত না হই। যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, সে অমৃতের সন্তান, তার শক্তি অসীম, তার সম্ভাবনা অনন্ত, তখন তার কাছে অসাধ্য বলে কিছু থাকে না। অতএব শিক্ষার সাহায্যে যেদিন মানুষ আত্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভে সমর্থ হবে সেদিনই হবে শিক্ষার সার্থকতা। **অতএব, শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য শিশুকে তার আত্মপরিচয় জানিয়ে তাকে কৃতার্থ করা।**

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার এই মূল উদ্দেশ্যটিকে আমল না দিয়ে আশু-লক্ষ্যসমূহের প্রতিই আমরা অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। শিক্ষার গৌণলক্ষ্যসমূহ এক একটি এক এক কালে বেশী প্রাধান্য লাভ করে থাকে, এবং তাকে মেনে নিয়েই রচিত হয় সে-যুগের শিক্ষার ধারা। কিন্তু শিক্ষার আসল লক্ষ্যটি স্থান, কাল এবং পাত্রের দ্বারা কখনো প্রভাবান্বিত হয় না। তথাপি আসল ফেলে রেখে অধিকাংশ সময় খোসাটি নিয়েই চলে আমাদের যতসব গবেষণা এবং যতসব পরিকল্পনা। এ দুনিয়ায় সকল মানুষেরই লক্ষ্য একটি। সবাই চায় বাঁচতে। ভালভাবে, আরো ভালভাবে। এবং ভালভাবে বাঁচার জন্য যা-কিছু প্রয়োজন সমস্তই আমাদের সংগ্রহ করে নিতে হবে শিক্ষার সাহায্যে। এই বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য আনন্দ আস্বাদন করা। মানুষ মাত্রই এই আনন্দের কাঙ্গাল। এই আনন্দের অন্বেষণেই একদিন শুরু হয়েছিল মানুষের চলা। এভাবে মানুষের সত্যিকারের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হওয়া সঙ্গত নয় কি?

"লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সেই" এই প্রচলিত বাক্যটি শিশুদের সামনে তুলে ধরে আমরা অনেক সময়ই তাদের লেখাপড়ায় উৎসাহ জাগাতে চেষ্টা করি। কিন্তু শিশুদের মনে যদি এ ধারণা একবার বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, পড়াশুনার উদ্দেশ্য শুধু দু-একটা পাস-টাস করে বড় বড় চাকরি করা, প্রচুর অর্থ উপার্জন করা এবং গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে আরাম করা, তা'হলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটিকে শুরুতেই ব্যঙ্গ করা হল

না কি? খেয়ে পরে ভালভাবে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যার্থীরা বিদ্যার্জন করতে আগ্রহান্বিত হলে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যটি ক্রমেই দূরে সরে সরে যেতে থাকবে না কি? 'রুটি-মাখন লক্ষ্য' (Bread & butter aim) শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও, একে আসল লক্ষ্য বলে কোন দেশই কোনকালে গ্রহণ করেনি। কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে এ লক্ষ্যটিই যেন আজ আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছে বলে মনে হয়। খাওয়ার জন্য বাঁচা এবং ভোগের জন্য পুঁজি সংগ্রহই এক্ষণে যেন মানব-জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদর পূরণের সমস্যাই বর্তমানে মানুষের নিকট বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু অভাব পূরণ করতে যেয়ে মানুষ যে দিন দিন অভাব বৃদ্ধিই করে চলেছে! সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়ে অভাব রাক্ষসীর ক্ষুধানলে ইন্ধন যুগিয়ে মানুষ দিন দিন যেন সে অনলকে বাড়িয়েই চলেছে! এভাবে শুধু অভাবের তাড়নায়ই মানুষ ধীরে ধীরে হয়ে পড়েছে অতিমাত্রায় আত্মসর্বস্ব। নগ্ন স্বার্থপরতা মানুষকে আজ কোন্ পর্যায়ে নিয়ে ফেলেছে তা মোটেই অস্পষ্ট নয়। নিজের উদর পূরণ করতে আজ মানুষ অপরকে বঞ্চিত করতে মোটেই দ্বিধা করছে না। অতৃপ্তি, অসহযোগিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদি ক্রমেই মানুষের ধর্মে পরিণত হচ্ছে। সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে এভাবে দুর্নীতি প্রবেশ করে সমাজকে ভাঙ্গনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর প্রতিকারকল্পে একদল লোক বলছেন —শিক্ষার সাহায্যে দেশের ছেলেমেয়েদের এক একটি সুষ্ঠু নাগরিক করে গড়ে না তোলা হলে সমাজের এ দুর্দশার লাঘব হবে না। কিন্তু শিশুদের নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করা, কর্তব্য পালনে তাদের বাধ্য করা এক কথা, আর কর্তব্য পালনে তাদের উপযুক্ত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে উদ্বুদ্ধ করা ভিন্ন কথা। মানুষকে কতকগুলো নিয়ম-নীতি মেনে চলতে বাধ্য করা, আর স্বেচ্ছায় নিয়মাধীন হয়ে চলার মত করে তাদের গড়ে তোলা—এক কথা নয়। শিশুকে দেহ-মনে সুগঠিত না করে তার ঘাড়ে কতকগুলো কর্তব্যের বোঝা চাপিয়ে দিলে কোন ফল হবে কি? শিশু দেহ-মনে সুগঠিত হলে স্বেচ্ছায় সে বরণ করে নেবে নিয়মের বশ্যতা। এটা করা দরকার, ওটার দরকার নেই; এটা ভাল, ওটা মন্দ; এ কাজ করলে জাতি ক্রমশঃ উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করবে, ওভাবে চললে সমাজের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে···ইত্যাদি ইত্যাদি ভাল কাজ ও

মন্দ কাজের দুটি তালিকা প্রস্তুত করে শিশুদের সামনে ধরা হল এবং সেগুলো কণ্ঠস্থ করিয়ে পরীক্ষার সময় তাদের কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া হল। তারপর তাদের কর্মক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়ে দেখা গেল সুষ্ঠু নাগরিকের গুণাবলী তাদের জানা থাকলেও তারা নিজেরা অনেকেই সুষ্ঠু নাগরিক হতে পারছে না। স্বাস্থ্যরক্ষার পরীক্ষায় যে ছেলে সব-চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে তার স্বাস্থ্যই হয়ত দেখা যায় ততোধিক খারাপ। উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করতে হলে শিশুর চরিত্র গঠনের প্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। চরিত্র বলতে কেবল মানুষের নৈতিক চরিত্রই বুঝায় না। মানুষের সম্যক ব্যবহারই রূপায়িত হয় তার চরিত্রে। কাজেই, উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করতে হলে শিক্ষার মারফত শিশুদের সম্যক ব্যবহারটিকেই মার্জিত ও নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। শিশুর ভিতর তার আত্মসম্মানবোধ সবার আগে জাগ্রত করতে হবে। কয়েক ঘণ্টা বিদ্যালয়ে কয়েদ রেখে পুস্তকে লিখিত ন্যায়-নীতির তালিকা মুখস্থ করিয়ে ছেড়ে দিলেই রাতারাতি শিশুর সমস্ত ব্যবহার মার্জিত হয়ে যাবে এ আশা আমরা করতে পারি না। তাদের করণীয় যাবতীয় কার্যকে ঢেলে দিতে হবে তাদের জীবনপ্রবাহে। অবান্তর হলেও বলা বোধ হয় খুব অসমীচান হবে না যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তোলা অথচ বৎসরান্তে কয়টি ছেলে উপযুক্ত নাগরিক হয়ে বের হল, কয়টি ছেলের চরিত্র সুগঠিত হল, এসব খবর নিতে বিশেষ কেউ আগ্রহ প্রকাশ করেন না। শুধু কয়টি ছেলে পরীক্ষার গণ্ডি উত্তীর্ণ হল সে সংখ্যা দ্বারাই নির্ণীত হয় শিক্ষা-পদ্ধতির গুণাগুণ এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের জাত বিচারও করে ফেলা হয় ঐ অঙ্কের উপর ভিত্তি করেই।

আমার ছেলেকে আমি কিভাবে গড়ে তুলতে চাই সে সম্বন্ধে যে আজও আমার কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই! আমার ছেলে দু-একটা পাস-টাস দিয়ে চাকরিতে ঢুকে আমায় আর্থিক সাহায্য করবে, না, একটি খাঁটি মানুষ হয়ে দেশের, দশের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ যত্ন করবে? ছেলে স্বাস্থ্যবান হচ্ছে, আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হচ্ছে; কিন্তু পরীক্ষায় যে কিছুতেই কৃতকার্য হতে পারছে না! এতে ত আমি নিজেও সন্তুষ্ট হতে পারছি না, কিংবা সমাজও খুশী হতে পারছে না। ছেলে না হয় মানুষ হল, কিন্তু মার্কাধারী না হলে যে আজকের সমাজে সে সম্পূর্ণ অচল। অতএব আগে তাকে মার্কাধারী

হতে হবে। নচেৎ চিরকাল যে সে সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে থাকবে। তা'হলে স্পষ্ট করে বলতে আপত্তি কি—ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছি তারা একের পর এক শ্রেণী ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যাক্, শুধু এই আশায়। ছেলের চরিত্র গঠিত হচ্ছে কিনা, সে খবর জানতে আমি যতটা না উদ্‌গ্রীব তার চেয়ে বেশী ব্যগ্র ছেলে কৃতিত্বের সাথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল কিনা সে সংবাদ জানতে। আদর্শ চরিত্র গঠনই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তা'হলে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই শিক্ষার সমস্ত পরিকল্পনা রচিত হওয়া সঙ্গত নয় কি? যে ছেলে দিনরাত শুধু পুঁথিগত সংবাদ সংগ্রহ করতেই ব্যস্ত, সমাজে চলার মত করে সর্বপ্রকার ব্যবহার মার্জিত করার তার সময় কোথায়? সমাজে চলার মত করে তার ব্যবহার মার্জিত করে নেবার কোন প্রয়োজনই যে সে জীবনে অনুভব করে না। আদর্শ মানুষ তৈরি করাই যদি শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা'হলে শুধু পরীক্ষা-পাসের উপরই আমরা এত গুরুত্ব আরোপ করতে যাই কেন? শিশু দেহ ও মনে সুস্থ ও সবল হবে, হৃদয় তার দিন দিন প্রসারিত হবে, তার নীচ প্রবৃত্তিসমূহ সংযত হয়ে সে হবে দেব-প্রবৃত্তির অধিকারী, বিপদে ধৈর্য না হারিয়ে সর্বদা সে প্রস্তুত থাকবে সমস্ত রকম প্রতিকূল অবস্থার সাথে সংগ্রাম করতে, দেশের, দশের কল্যাণার্থে নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মনিয়োগ করার প্রবৃত্তি তার জেগে উঠবে, এবং সর্বোপরি নিজেকে সে অমিতশক্তির অধিকারী বলে উপলব্ধি করবে…এই সব গুণাবলী একমাত্র আদর্শ মানবের কাছ থেকেই আমরা আশা করতে পারি। তা'হলে স্পষ্টই বোঝা গেল—আদর্শ মানুষ তৈরী হলেই তাদের দ্বারা গঠিত সমাজও আদর্শ সমাজে রূপান্তরিত হবে। অতএব শিক্ষার সাহায্যে আদর্শ মানুষ তৈরি করা সম্ভব হলেই—অপরাপর যে-সব গৌণ লক্ষ্য নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি তা আপনা হতেই সিদ্ধ হবে। ব্যক্তির সমষ্টিই জাতি। অতএব ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হলেই জাতিও ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হবে।

শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য যদিও আদর্শ মানব সৃষ্টি করা, মানবশিশুকে তার সত্যিকারের পরিচয় জানতে সাহায্য করা, তথাপি কতকগুলো আপাত উদ্দেশ্যকেও একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। মোটামুটি তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আসল লক্ষ্যটিকে সম্মুখে রেখে শিক্ষার পরিকল্পনা রচিত হওয়া সঙ্গত। শিশু নিজে, তার সমাজ, আর তার রাষ্ট্র—এই তিনের

চাহিদার ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থা। শিশু চাচ্ছে তার আত্ম-বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে, সমাজ চাচ্ছে তার মূলধন-সমূহকে সম্যগ্‌রূপে কারবারে খাটাতে, আর রাষ্ট্র চাচ্ছে অচিরে একটি শক্তিশালী ও সম্পৎশালী জাতি গড়ে তুলতে। এই তিনটি চাহিদার সমন্বয় সাধন করেই শিক্ষা-ব্যবস্থা রচিত হওয়া সঙ্গত।

শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য—যতশীঘ্র সম্ভব দেশের আপামর জনসাধারণকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা। কিন্তু দেশের জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করা—এই একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাথমিক স্তরের (Elementary stage) শিক্ষার পরিকল্পনা রচিত হলে বিপর্যয় অনিবার্য। দেশের জনসাধারণকে কেবল কিছু কিছু লিখতে পড়তে শেখান হলেই এ-স্তরের শিক্ষার কাজ শেষ হয়ে গেল একথা মনে করা ভুল। এ শিক্ষা সমাপ্ত করে তারা ঘরে ফিরে গিয়ে কি করবে? কোন প্রকার চাকরি লাভের যোগ্যতাও এদের হল না। এর পর মাঠে গিয়ে পিতার সাথে লাঙ্গল ধরতেও এদের মন সরবে না। পুঁথিপত্র নিয়ে ক'বছর পাঠশালায় যাতায়াত করেছে। ফলে, এদের বিদ্যানুরাগ না জন্মালেও অনেকের ভিতরেই একটা মিথ্যা আভিজাত্য-বোধ সঙ্গোপনে গড়ে উঠেছে। শুধু অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করানই যদি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার আশু লক্ষ্য হয় তা'হলে রাষ্ট্রের চাহিদা মেটাতে গিয়ে সমাজের ঘাড়ে অতিরিক্ত দায় চাপান হবে না কি? আবার এ স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করে সবাই মিলে যদি পরের স্তরের শিক্ষালাভের জন্য লালায়িত হয় তা'হলেও জাতির অপচয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাটি যদি মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তা'হলে সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়েই লাভবান হবে। শ্রমেরও যে একটা মর্যাদা আছে একথা জনসাধারণকে অবহিত করা, সমাজে চলার মত করে বিভিন্ন আচরণে তাদের অভ্যস্ত করা, ঘরে বসে অপরাপর কাজের ফাঁকে অল্প-বিস্তর পড়াশুনার একটা অভ্যাস গঠিত করা, দেশ-বিদেশের খবর জানবার একটা আগ্রহ তাদের মধ্যে জাগ্রত করা, নানা বিষয় ভাববার এবং জীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করার মত তাদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত করে দেওয়া, নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হয়ে ব্যক্তিগত ও সমাজগত স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মের সাথে পরিচিত হয়ে যাতে তারা সেভাবে জীবনযাপনের প্রেরণা লাভ করে সেভাবে

তাদের গঠিত করা…ইত্যাদি উদ্দেশ্যসাধন মানসে এ স্তরের শিক্ষার ধারা রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিরক্ষরতা দূর করতে হবে এই একটি মাত্র উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে প্রাথমিক শিক্ষার ধারা রচিত হলে ব্যর্থতার গ্লানি হতে আমাদের রেহাই নেই।

এর পরের স্তরের অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষার (Secondary Education) স্তরের সমস্যাই বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে বেশী ভাবিয়ে তুলেছে। প্রাথমিক স্তরের পাঠ সমাপ্ত করে সবাই ছুটল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে। বিদ্যার্জনের আগ্রহই এর মূলে রয়েছে একথা ভাবা ঠিক নয়। অনেকেই ভাবছে অন্ততঃ একটা মার্কা ছাড়া ত চাকরি জুটবে না। তা'হলে বাবু আখ্যা লাভ করব কেমন করে? কিন্তু একবারও ভেবে দেখার অবকাশ নেই, সকলেরই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়া চালিয়ে যাবার মত যোগ্যতা আছে কিনা। এমনি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সবাই মিলে ভিড় করার দরুন স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা ছাড়াও দুটি অতিরিক্ত দায়িত্ব জাতির স্কন্ধে এসে চাপল। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করে যারা বের হল তারা কেউ গ্রামে ফিরে গিয়ে পৈতৃক পেশা গ্রহণ করতে রাজী নয়। হয় তারা কোন প্রকারে কলেজে স্থান করে নেবে, নতুবা যাহোক একটা চাকরি নিয়ে শহরে বাবুর মত বসবাস করবে। চাকরি যাদের মিলবে না বেকারের সংখ্যাকে স্ফীত করাই হবে তাদের কাজ। প্রতি বছর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করে যত ছেলেমেয়ে চাকরির উমেদারি করতে শুরু করে তাদের সকলের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব কোন সরকার গ্রহণ করতে পারে কিনা সে প্রশ্নটিও উপেক্ষা করা যায় না। তারপর যে বিরাট একটি অঙ্কের ছেলেমেয়ে প্রতি বছর অকৃতকার্যতার গ্লানি বহন করে ফিরে এল তাদের নিয়েও আমাদের সমস্যার অন্ত নেই। জাতির এ অপচয় জাতিকে কোন্ স্তরে নিয়ে ফেলছে তা সহজেই অনুমেয়। অতএব মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকরিলাভের যোগ্যতা অর্জন—একথা আমাদের ভুলে যেতে হবে। এ বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ রুচির আভাস পাওয়া যায়। যার যার পছন্দ মত কাজ তাকে করতে দিলে কর্মক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে সন্দেহ নেই। প্রবৃত্তি, ঝোঁক এবং মানসিক প্রস্তুতি বিচার করে ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত পথে পরিচালিত করা সম্ভবপর হলে, এ স্তরের অপচয় অধিক পরিমাণে

নিবারিত হবে। এজন্যই মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে এমন ব্যবস্থা রাখা দরকার যাতে ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তির ধারায় সবাইকে পরিচালিত হবার সুযোগ দেওয়া যায়। একই পাঠক্রম অবলম্বন করে সব ছেলেমেয়েকে একই ধরনের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে গেলে অপচয় অনিবার্য। যারা শিল্পী বা কারিগরের বৃত্তি অবলম্বন করবে, আর যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করে গবেষণা কার্যে নিযুক্ত হবে তাদের সবাইকে একই ছাঁচে ঢেলে তৈরি করার চেষ্টা বিপজ্জনক সন্দেহ নেই। এক একটি ছেলে হয়ত এক এক বিষয়ে দক্ষ। দক্ষতা অনুযায়ী সবাইকে পরিচালিত করা সম্ভব হলে, তবে ত বাড়বে জাতির সম্পদ। অন্তরের ভাবসমূহ চরিতার্থ হবার সুযোগ পেলে আনন্দের সঙ্গেই তারা স্বেচ্ছায় মেনে নেবে সমাজের আইন-কানুনের বশ্যতা। এবং নিজেদের গরজেই তারা গড়ে উঠবে এক একটি সুষ্ঠু নাগরিক হয়ে। ইংরেজী আমার ভাল লাগে না, অথচ জোর করে আমাকে ইংরেজী পড়তে বাধ্য করা হলে, আমার মন বিষিয়ে উঠবে না কি? ইংরেজীতে পাসের নম্বর আদায় করতে গিয়ে আমার অধিকাংশ শক্তিই যে ব্যয়িত হয়ে যাচ্ছে! অপরাপর দরকারী বিষয়সমূহ জানবার আমার অবকাশ কই? সমাজে চলার মত আচরণে অভ্যস্ত হবার মত আমার সময় কোথায়? সংসারে প্রায় সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ; অভিজ্ঞতা শুধু কতকগুলো পুঁথিগত সংবাদ সংগ্রহের। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে মোটামুটি দুটি ভাগ থাকা খুবই সঙ্গত। একদলে থাকবে তরা, যারা পরিণামে এক একজন নিপুণ শিল্পী হয়ে উঠবে এবং যাদের সাহায্যে বেড়ে উঠবে দেশের শিল্পের ভাণ্ডার। আর একদলে থাকবে শুধু তারা, যারা বৃদ্ধি করবে দেশের জ্ঞানভাণ্ডার। এ দুটি দলকে ভিন্ন ভাবে প্রস্তুত করাই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন দেশে কারিগরী ও বৃত্তিকরী শিক্ষায়তনের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা যাতে প্রথমোক্ত দলের স্থান সঙ্কুলানে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্য দেশের। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্যই যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে—যেভাবে হউক স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করান। ছেলেমেয়েরাও পরীক্ষায় পাস করাকেই জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলে যেন মেনে নিয়েছে। এজন্য দায়ী করব কাকে? এদেশে যে-কোন চাকরি

পেতে হলে, এমনকি কারিগরী কারখানায় প্রবেশ করতে হলেও একটা মার্কা না থাকলে চলে না। কাজেই, 'যেন তেন প্রকারেণ' মার্কা আদায়ের উদ্দেশ্য নিয়েই যেন অধিকাংশ ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। ন্যায়নীতির কোন বালাই নেই, শৃঙ্খলা মেনে চলার কোন দায়িত্ব নেই, উদ্দেশ্য শুধু মার্কা আদায় করা। পরীক্ষায় প্রমোশন পেলাম না, অতএব স্কুলঘর জ্বালিয়ে দাও। মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার সাজ-সরঞ্জাম, বহু লোকের সঞ্চিত কঠোর শ্রম ধ্বংস হয়ে গেল—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। শিক্ষকদের ত উচিত শিক্ষা দেওয়া হল—এই আত্মপ্রসাদ। শ্রেণী প্রমোশনের সময় কিংবা এলাউ পরীক্ষার সময় বেচারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কত না আতঙ্কে দিন কাটাতে হয়! প্রমোশন দিতে না পেরে কত শিক্ষককে যে ছেলেদের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নয়। পরীক্ষার হলে অসাধুতাকে বাধা দিতে গিয়ে অনেককে যে অকালে প্রাণ পর্যন্ত বলি দিতে হয়েছে তার দৃষ্টান্তও আমাদের দেশে ভূরি ভূরি মিলবে। প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে—ব্যস্, পরীক্ষাথারা দলে দলে স্লোগান দিতে দিতে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে এল। কতক পরীক্ষা-কেন্দ্রের সাজ-সরঞ্জামের উপর তাদের আক্রোশ মেটাল, কেউ বা পরিচালকদের অপমান করতে এগিয়ে গেল। কেউ খতিয়ে দেখল না, অপরাধ কার? প্রশ্ন কঠিন হয়েছে, এ প্রশ্নে পাস করতে পারব না, কাজেই সমস্ত আক্রোশ যেন গিয়ে পড়ল পরীক্ষা যাঁরা পরিচালনা করছেন তাঁদের উপর। ক্রমে ক্রমে এই সব ছেলের দল সমাজবিরোধী কার্যকলাপে মেতে উঠল। দুর্ভাগ্য দেশের, এদের সুপথে চালিত করবার জন্য কেউ এগিয়ে এল না। এই যে অবাঞ্ছিত ছেলেমেয়ের দল, এরাই হয়ত সংখ্যায় বেশী। বছর কয়েক পরে সংখ্যাধিক্যের জোরে এরাই হয়ত একদিন দেশের উপর কর্তৃত্ব করার ভার কেড়ে নেবে। এসব সমস্যাকে আর বেশীদিন উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। শিক্ষা-ব্যবস্থাটি এমন হওয়া দরকার যাতে পরীক্ষা-পাসের চেয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরীক্ষা-পাসের মার্কাকেই যতদিন চাকরিলাভের একমাত্র যোগ্যতা বলে আঁকড়ে থাকবো, ততদিন দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে এ প্রহসন চলতেই থাকবে। লেখাপড়ায় মন নেই, ন্যায়নীতির বালাই নেই—একমাত্র লক্ষ্য

শুধু পাসের মার্কা আদায় করা। এ ভ্রান্ত ধারণা হতে জাতিকে অগৌণে মুক্ত করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে যারা উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পেল না তারা যেন সবাই বেকারের দলে ভিড় না জমায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি না রাখা হলেও আমাদের সমস্ত শ্রমই পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবে। আর, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যারা প্রবেশ করল তারা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে—এ ধারণা আমাদের পাল্‌টাতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে সর্বদা লক্ষ্য রাখা দরকার—ছেলেটির ঝোঁক কোন্‌ দিকে। ছেলের সহজাত শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী তাকে চালিত করা হচ্ছে কিনা, না তার ইচ্ছা এবং রুচির বিরুদ্ধে জোর করে তার স্কন্ধে কতকগুলো পুস্তকের বোঝা চাপিয়ে তার দেহ-মনে তাকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে? শুধু পাস করার উদ্দেশ্য নিয়েই যে-সব ছেলেমেয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এ কয়বছর পুঁথির রাজ্যে বিচরণ করেছে, সমাজে চলার মত কোন যোগ্যতা অর্জন করারও অবকাশ তারা পায় নি। কাজেই কোন প্রকারে ছাড়া পেয়ে এইসব ছেলেমেয়েরা বাইরে এসে দেখে যে, সেখানে চলার মত কোন সম্বলই তাদের যোগাড় হয় নি। তখন কিছুকাল অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। তারপর ভুল ভেঙ্গে গেলে ভাবতে থাকে, দোষ কার? অভিযোগ তাদের সকলের বিরুদ্ধেই। পুঞ্জীভূত আক্রোশ তখন দানা বাঁধতে শুরু করে এবং অবশেষে রূপায়িত হয় তাদের সম্যক আচরণে। কিন্তু গোড়া থেকেই যদি এ স্তরের শিক্ষার আশু লক্ষ্য হয় ছেলেদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের চালিত করা, ন্যায়-নীতিতে শ্রদ্ধা জাগান, বিনয়, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্ট আচরণ ইত্যাদি মানবীয় গুণ-সমূহ অনুশীলনের সুযোগ দান, শুধু তা'হলেই এ শিশু-মেধ যজ্ঞের হাত হতে আমাদের নিষ্কৃতি।

শুধু সমাজ-বিজ্ঞানের ক'খানা বই পড়িয়ে ছেলেদের সামাজিক জীব করে গড়ে তোলার চেষ্টা অপচেষ্টারই সামিল। সমাজ-বিজ্ঞানে যে ছেলেটি অধিক নম্বর পেয়েছে তার সামাজিক আচরণ হয়ত দেখা যাবে সম্পূর্ণ অসামাজিক। তাই লক্ষ্যের সাথে সাথে পদ্ধতির পরিবর্তনও অত্যা-বশ্যক। বর্তমান অবস্থায় শিক্ষার আশু উদ্দেশ্যসমূহের প্রতিও আমরা সমান সুবিচার করতে পারছি না। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটির পরিপ্রেক্ষিতে

যদিও শিক্ষার পরিকল্পনা রচিত হওয়াই সঙ্গত, তথাপি লক্ষ্য রাখা দরকার আপাত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের পথে যেন কোন অন্তরায় উপস্থিত না হয়। আবার আশু উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে মূল লক্ষ্য হতে যেন আমরা বিচ্যুত না হই সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি যে আজ সমস্ত স্তরের লোকের নিকটই সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে তার একমাত্র কারণ শিক্ষার আসল লক্ষ্য হতে আজ আমরা সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। জানিনা সে লক্ষ্যে আবার ফিরে যাওয়া সম্ভব কি না। তথাপি লক্ষ্য একটা স্থির করে নিতেই হবে। পরীক্ষায় পাস করাকেই যতদিন আমরা শিক্ষার লক্ষ্য বলে আঁকড়ে থাকব ততদিন সুদিনের আশা বৃথা।

॥ বাইশ ॥

বিদ্যালয়ের রূপ

যত রকমের হাতিয়ার সঙ্গে দিয়ে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্ট জীবকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী হাতিয়ার হল জীবের অভিযোজন যন্ত্র (Adaptable Instrument)। বেঁচে থাকার তাগিদেই জীব এ যন্ত্রের সাহায্যে তার পরিবেশের সাথে একটা রফা করে নেয়। যে অক্ষম, অচিরেই তার চিহ্ন মুছে যায় ধরাপৃষ্ঠ হতে। একটি মানবশিশুর সত্যিকারের পরিবেশ শুধু সেইটুকু, যতটুকু পেরেছে সে আপন করে নিতে। তার কাছে অজানা পরিবেশের কোন মূল্যই নেই। এক কথায়, শিশু যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাসমূহকে (Impersonal experiences) ব্যক্তিগত (Personal) করে নিতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোর কোন মূল্যই নেই তার কাছে। এ কার্যটি দ্বিমুখী অভিযানের সাহায্যেই সহজে সম্পন্ন করা যায়। অর্থাৎ শিশুর প্রবৃত্তিসমূহের উদ্‌গতি সাধন (Sublimation) এবং সাথে সাথে পরিবেশ পরিমার্জন। এভাবে উভয়দিক থেকে অগ্রসর হলেই সামঞ্জস্যবিধান প্রক্রিয়াটি দ্রুততর হবে তাতে সন্দেহ নেই।

একটু ব্যাপকভাবে বলা যেতে পারে, ব্যক্তি এবং সমাজ—এ দুইয়ের মধ্যে একটা আপস করে তবে কাজে লাগতে হবে। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় জীবনধারণের উপযোগী সবকিছুই মিলত অকৃত্রিম পরিবেশের কাছ থেকে, তাইত শিক্ষা বলতে তখনকার দিনে শুধু বিদ্যাদান করাই বোঝাত। **বিদ্যার্থী গুরুগৃহে বসবাসের ভিতর দিয়েই বাইরের সমাজে চলা-ফেরার সমস্ত যোগ্যতা অর্জন করে নিত।** কিন্তু আধুনিক কালে বিদ্যালয় বলতে এমন একটি স্থান বুঝায়, যার সাথে বাইরের সমাজের বড় বেশী মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে, বিদ্যালয় ছেড়ে বাইরে এলেই শিশুর দল স্রোতের টানে কে কোন্ দিকে ভেসে চলে যাবে তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

তাইত আজকাল সবাই বলতে শুরু করেছেন—বিদ্যালয়ে শিশুকে শুধু

বিদ্যা পরিবেশন করলেই চলবে না, সাথে সাথে তাকে উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তোলার দায়িত্বও নিতে হবে। প্রচলিত জটিল সমাজ-ব্যবস্থায় শুধু বেঁচে থাকার তাগিদেই সবাইকে পরিচিত হতে হবে মানব-সৃষ্ট নানা প্রকার কৃত্রিম পরিবেশের সাথে। বিদ্যালয়ের বাইরে এনে আবার তাদের সে-শিক্ষা দিতে হলে সময়ে যে আর কুলাবে না! **অতএব, শিক্ষা-সংস্কারের সর্বপ্রথম ধাপই হলো প্রচলিত বিদ্যালয়সমূহের রূপ পরিবর্তন।** বিদ্যালয়ের রূপ-পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাও নবকলেবর ধারণ করবে। বিদ্যালয়কে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন না করে তাকে রূপান্তরিত করতে হবে সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণে।

শিক্ষার কথা আলোচনাকালে আমরা দেখেছি, শিক্ষার ক্ষেত্রে কখনো বা ব্যক্তি কখনো বা সমাজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ ব্যক্তি এবং সমাজ অভিন্ন। যেমন ব্যক্তি নিয়েই সমাজ, তেমনি সমাজও সেই ব্যক্তির জন্যই। ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ এই সংজ্ঞাসমূহ সমাজরক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই নির্ধারিত হয়েছে। "Robinson Crusoe in his solitary exile cannot be said to be immoral as he had none to cheat nor anything to lie." এভাবে সমাজের বাইরে সামাজিক গুণসমূহ পুষ্টিলাভ করার অবকাশ কোথায়? আবার, ব্যক্তির উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। অতএব ব্যক্তির কল্যাণের নিমিত্তই শিক্ষা, কিংবা সমাজের উন্নতিবিধানই শিক্ষার উদ্দেশ্য—এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর নয় কি?

"Education is a progressive growth of the individual, directed by his social living"—John Dewey এ কথা বলে ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে একটা আপস করলেন। তিনি বললেন, সমাজে বসবাসের ভিতর দিয়েই ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করবে, এ-ই শিক্ষার মূলনীতি। প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র সামাজিক আবেষ্টনীর ভিতর দিয়ে সর্বজনের সম্মিলিত আদর্শ, উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই পুষ্টি লাভ করে। সমাজের ভাবী উত্তরাধিকারিগণ যে-সব সম্ভাবনা নিয়ে ধরায় এসেছে তার সম্যক বিকাশসাধন দ্বারাই সমাজ হয়ে উঠবে সমৃদ্ধিশালী। কারণ, মূলধন যত বেশী কারবারে খাটান যায় লাভের পরিমাণও ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক টমাস কারলাইল (Thomas

Carlyle) তাইত বলেছিলেন—"Every child born in this society has something special to give to this world and the business of education is to render the gift possible." সবাইকে একই ছাঁচে গড়তে গেলে লাভের ঘরে শূন্যই শুধু জমতে থাকবে। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হবে, যে সম্ভাবনা নিয়ে শিশুরা ধরায় এসেছে তার খোঁজ নিয়ে তাকে সম্যক বিকাশের সুযোগ দান। অথচ সামাজিক পরিবেশ ভিন্ন শিশুর মানসিক বৃত্তিসমূহ কখনো পুষ্টিলাভ করতে পারে না। কেবলমাত্র সামাজিক পরিবেশই শিশুর ভাবাবেগ বর্ধিত করে এবং পরিশেষে তার চরিত্রগঠনে সহায়তা করে।

তা'হলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে কি ধরনের সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, পূর্বাহ্ণে সে সমস্যারই সমাধান প্রয়োজন। জন ডিউইর (John Dewey) মতে সে পরিবেশটি হবে "Simplified, purified, graded, better-balanced, real, living and democratized." অর্থাৎ পরিবেশটি হবে সরল, পবিত্র, ক্রমানুসারে সজ্জিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ, সত্যিকারের সজীব গণতান্ত্রিক সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ তাকেই বলা যেতে পারে, যে সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব স্বভাবের অবাধ পরিণতির প্রয়োজনে যা-কিছু দরকার সবই সেখান থেকে পেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এমনি একটি আদর্শ বিদ্যালয়-সমাজে শিশুদের দিবসের কয়েকটি ঘণ্টা কাটাবার সুযোগ দিলেই কি সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, কেবলমাত্র আবাসিক বিদ্যালয়ের (Residential institutions) সাহায্যেই এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব।

দেশে সব কয়টি না হোক, অন্ততঃ কিছুসংখ্যক আবাসিক বিদ্যালয় সৃষ্টি করে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যেতে হবে। বিদ্যালয়-সমাজের সভ্যগণ যেন মনে ভাবতে পার যে, এ সমাজটি তাদের নিজেদের এবং এর উন্নতি-অবনতি সবকিছুই তাদের কার্যের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অবশ্য, আবাসিক বিদ্যালয়কে প্রাচীন কালের গুরুগৃহেরই বিকল্প ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ছোট ছোট শিশুদের বোর্ডিং স্কুল বা নার্সারী স্কুলে পাঠাবার যে ব্যবস্থা দেশে ক্রমে চালু হচ্ছে, মনোবিজ্ঞানীরা কিন্তু সে ব্যবস্থা এখন আর সমর্থন করেন না। তাঁদের গবেষণার ফল অন্যরূপ। তাঁরা বলছেন, **মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য**

নাকি কখনো উন্নতিলাভ করে না। শিশুর স্থান মায়ের কোলে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আবাসিক বিদ্যালয়ে রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা না করাই ভাল। শিশুদের এ স্তরটি পার করে তবে আবাসিক বিদ্যালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থাই সমীচীন।

শিক্ষার ক্ষেত্র গুরু ও শিষ্যের মিলিত সাধনার ক্ষেত্র। পরস্পর পরস্পরকে আপন করে পাওয়ার উপরই নির্ভর করে এর কার্যকারিতা। প্রচলিত বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র আর শিক্ষকের সম্বন্ধ নিতান্ত কলুষিত। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব। আদান-প্রদানের যে সম্বন্ধ বর্তমানে প্রচলিত, তা দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গল-কারক। দাতা দান করে যাচ্ছেন যন্ত্রচালিতের মত, নেই তার সাথে প্রাণের যোগ, আছে শুধু প্রাণের দায়। আর গ্রহীতা অশ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে বলে সবই হয়ে যাচ্ছে বদহজম। বর্তমানে বিদ্যালয় এবং গৃহ এই দুটি সমাজের মধ্যে বিশেষ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বিদ্যালয় এবং গৃহ এই দুটি সমাজ দুদিক থেকে যেন শিশুদের আকর্ষণ করছে। দোটানায় পড়ে দেশের বালকবালিকাদের কত যে শক্তির অপচয় হচ্ছে তার হিসাব নেবার ফুরসত এখনো আমাদের হয় নি কি?

প্রাচীনকালে শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে থাকতে হতো শিক্ষার সম্পূর্ণ কালটি। গুরুগৃহই সে সময় তাদের আপন গৃহে পরিণত হতো, এবং সেখানে থেকেই তারা আয়ত্ত করে নিত উপযুক্ত নাগরিকের সমস্ত গুণাবলী। আর আজ বিদ্যালয়ের নিরানন্দ পরিবেশে শিক্ষার্থীকে থাকতে হচ্ছে বেলা ১১টা থেকে বৈকাল ৫টা পর্যন্ত, এবং সেখান থেকে যা-কিছু শিখে আসছে তা সবই প্রায় পুঁথিগত। তাই ঘরে চলবার মত কোন সরঞ্জামই পাচ্ছে না সে সেখানে থেকে। কারণ বাড়ীতে চলতে হয় এক আদর্শ অনুসরণ করে, বিদ্যালয়ে এসে সেখানকার কৃত্রিম পরিবেশে হয়ত তাকে চলতে হচ্ছে অন্য এক আদর্শ অনুসরণ করে। গৃহ এবং বিদ্যালয়ের এ ব্যবধান ঘুচাতে হবে। বিদ্যালয়ে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে বাইরের জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা শিশু সেখানে থেকেই কিছু কিছু লাভ করতে পারে। আবাসিক বিদ্যালয়ে থেকে ছেলেমেয়েরা একত্রে বসবাসের ভিতর দিয়ে বাইরের সমাজে খাপ খাইয়ে চলবার মত সমস্ত গুণাবলী অতি সহজে আয়ত্ত করে নিতে পারে। কিভাবে দশজনের সাথে মিলে মিশে

চলতে হয়, নিজেকে তার জন্য কতটুকু মার্জিত করার প্রয়োজন, সে সমস্ত জ্ঞানই তারা প্রত্যক্ষ ভাবে লাভ করবে আবাসিক বিদ্যালয় থেকে।

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির সবচেয়ে বড় ত্রুটিই হলো—এ শিক্ষার সাথে জীবনের কোন যোগাযোগ নেই। জীবনের প্রথম ১০।১৫ বছর, বিদ্যালয় হতে যে-সব অভিজ্ঞতা ছেলেমেয়েরা সঞ্চয় করে নিল, সংসারে প্রবেশ করে জীবনযাত্রা নির্বাহের ঝঞ্ঝাটে সে বিদ্যা পড়ে রইল বস্তাবন্দী হয়ে। দায়িত্ব কাকে বলে, এতকাল তাকে তা বুঝবার কোন সুযোগ দেওয়া হলো না। তাই হঠাৎ একদিন সমগ্র দায়িত্ব তার ঘাড়ে চেপে তাকে দিল পঙ্গু করে। অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে জীবনযুদ্ধে তাকে সহজেই পরাজয় বরণ করতে হলো। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও শিক্ষার মধ্যে এ সম্পর্কহীনতা ঘুচাতে না পারলে, জাতির অপমৃত্যু রোধ করা সম্ভবপর হবে না। বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ে নাম লেখালেও, সে যে বৃহৎ সমাজের অন্তর্গতই একটি জীব এ কথা তাকে ভাববার এবং বুঝবার অবকাশ দিতে হবে।

আমাদের দেশে বিদ্যার্থীরা তো একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর জীব বটেই, তাদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। যেমন, গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্র, প্রাইভেট স্কুলের ছাত্র, শহরের ছাত্র, পাড়াগাঁয়ের ছাত্র, কনভেণ্টের ছাত্র, পাব্লিক স্কুলের ছাত্র, কলেজের বাবু ইত্যাদি। শিক্ষার সাহায্যে সমাজের উন্নতি করতে যেয়ে আমরা সমাজকে এভাবে ব্যবচ্ছেদ করে তার পরমায়ু নষ্ট করে ফেলছি না কি? শিক্ষার নামে আমরা তৈরি করছি সমাজ-বহির্ভূত কতকগুলি জীব। শিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেই এ বিপদ আমরা ডেকে এনেছি। বিদ্যালয়সমূহের পরিবেশ এমন ভাবে সাজাতে হবে, যাতে ছেলেমেয়েরা দৈনন্দিন চলার পথে নিজে নিজেই জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আহরণ করে নিতে পারে ভবিষ্যৎ জীবনের সমুদয় পাথেয়। পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতে শিক্ষার্থীরা লাভ করতে পারে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নিয়ন্ত্রিত করে নিতে পারে আপন আপন আচরণ—সমাজের দশজনের সাথে চলার যোগ্য করে। লর্ড কার্জন একস্থলে বলেছিলেন,—"Education means the transmission of life from the living through the living and to the living."

শিশুকে নিষ্ক্রিয় জড় পদার্থ মনে করে তাকে পিটিয়ে মনোমত করে গড়ে তোলার চেষ্টা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। তার সর্বপ্রকার বৃদ্ধি চলে

আপন গতিতে। গতিটি রুদ্ধ হয়ে জীবন-প্রবাহে প্লাবন না ঘটায় সে দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কিসে ভাল আর কিসে মন্দ হয় সে কথা তাকে বলে দেবার দরকার কি? "সত্য কথা বলা উচিত" এ নীতি-বাক্য বার বার পাঠ করে কণ্ঠস্থ করলেই কি সে সত্যবাদী হয়ে পড়বে? তার চেয়ে তাকে যদি বুঝবার সুযোগ দেওয়া হয় যে, সত্য কথা বললেই তার নিজের লাভ হয় বেশী এবং মিথ্যা আচরণে তার লোকসান সমধিক, তা'হলে আপন স্বার্থের খাতিরেই সে সত্য পথ ধরে চলবে। এমনি ভাবে নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যে শিক্ষা সে শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বই মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখে ভাল নম্বর পেলেই কি ছেলের স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যাবে? তার চেয়ে স্বাস্থ্যনীতির একটি নিয়মও যদি সে নিজের জীবনে মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়, তা'হলে নিজের স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষ্য করেই স্বাস্থ্যরক্ষার অপরাপর নিয়মের প্রতি ক্রমে তার শ্রদ্ধা জাগবে। শাস্তির ভয় বা পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে জীবনে কোন স্থায়ী পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব নয়। যখন শিশু নিজে থেকে বুঝবে যে, এ-কাজে তার লাভ, তখন তাকে বলে কয়ে আর সে কাজ করাতে হবে না। সে আপন ইচ্ছায়ই নিয়মনীতিতে শ্রদ্ধাবান্ হবে। এমনি ভাবে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিজের জীবনযাত্রার মধ্য দিয়েই যাতে বিদ্যার্থীরা উপলব্ধি করার সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা বিদ্যালয়েই রাখতে হবে। এক কথায়, শিক্ষাকে ঢেলে দিতে হবে শিশুদের জীবন-প্রবাহে। **প্রতিটি বিদ্যালয়কে রূপান্তরিত করতে হবে বৃহত্তর সমাজের এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণে।** তবে, এতে খানিকটা কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হবে। অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র সমাজে বৃহত্তর সমাজের সবকিছুই প্রতিফলিত না হয়ে **যা-কিছু ভাল এবং যা-কিছু সার বস্তু শুধু তাই স্থান পাবে।** সমাজের জীবন্ত রূপ শিশুর পরিবেশের মধ্যে সাজিয়ে রাখতে হবে। তা'হলেই ক্ষুদ্র সমাজ ছেড়ে বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করেও শিশুকে আর অসহায়ের মত ভেসে বেড়াতে হবে না।

তারপর, বিজ্ঞানের দৌলতে আজকাল স্থানের দূরত্ব ক্রমে কমে আসছে, ফলে বেড়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজের পরিধি। আমরা এখন বিশ্ব-সমাজে বাস করছি বললেও অত্যুক্তি হবে না। আপন আপন সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে শিশু বয়স থেকেই যাতে ছেলেমেয়েরা বাইরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে সে সুযোগও তাদের দিতে হবে। বিদ্যালয়-সমাজটি

হবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ, যে সমাজে প্রতিটি শিশু তার নিজস্ব ধারায় বর্ধিত হবার সুযোগ পায়। সমাজে বসবাস করেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তা'হলেই হবে ব্যক্তি ও সমাজের চিরকালের দ্বন্দ্বের অবসান। ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ মর্যাদা পেলে, সেও সমাজের কল্যাণে তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে কখনো কুণ্ঠিত হবে না।

সৌন্দর্যের খাতিরেই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। সবাইকে একই ছাঁচে ঢেলে তৈরি করে নিলে ধরিত্রীর সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হবে। আঁধার আছে বলেই না আলোর এত কদর। দুঃখ আছে বলেই না মানুষ সুখের জন্য এত আকাঙ্ক্ষা করে। অতএব, সবাইকে আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ধিত হবার সুযোগ দিলেই সৃষ্টির সৌন্দর্যও অক্ষুণ্ণ থাকবে। বিদ্যালয়ে এরূপ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে প্রত্যেকটি শিশু তার শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী আপন চাহিদা মত পথ বেছে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

বড় হয়ে কি করব? এ প্রশ্ন সব শিশুর মনেই উঁকি মারে। কিন্তু তার পছন্দমত পথে চলবার শক্তি তার আছে কিনা তা কি সে জানে? অতএব, বৃত্তি নির্বাচন বিষয়ে শিশু বয়স থেকেই তাকে সাহায্য করতে হবে। মানসিক যোগ্যতা ও মনের গতি বিবেচনা করে যাতে বিদ্যালয় থেকেই শিশুকে তার ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচন বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া যায়, সে ব্যবস্থা বিদ্যালয়েই রাখতে হবে। তাইত দেখতে পাওয়া যায় Multipurpose School, Educational and Vocational Guidance ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দেশে বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্য ইদানীং দুটি একটি করে বেশ কিছু Multipurpose School ও Guidance Bureau-র পত্তনও হচ্ছে।

এই বহুমুখী বা সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের কল্পনা মূলতঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। রূপে-গুণে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে কোন দুটি মানব-শিশুই সম্পূর্ণ এক নয়। প্রতিভা এবং সঙ্গতি, তাও সবার এক নয়। তারপর এক এক জনার ঝোঁকও থাকে আবার এক এক দিকে। এসব তথ্য উপেক্ষা করে সবাইকে একই বাঁধাধরা পথে চলাতে গেলে শক্তির অপব্যয় রোধ করা যায় না। তাই সৃষ্টি করতে হবে বহুমুখী বিদ্যালয়, যেখানে যার যার প্রতিভা ও ঝোঁক অনুযায়ী প্রত্যেককে চালনা করা যায়। এতে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। ভাল লাগে না

অথচ তাকে জোর করে একটা জিনিস শেখাতে যাওয়া বিড়ম্বনা বৈ কি! যার যার সম্বল অনুযায়ী কারবারের পরিধি নির্ণয় করতে হবে। অল্প পুঁজি নিয়ে বড় কারবার ফাঁদতে গেলে ভরাডুবি হবার সম্ভাবনাই অধিক। এমনি ভাবে বিদ্যালয়সমূহের রূপ পরিবর্তন না করে শিক্ষার রূপ পরিবর্তনের আশা দুরাশা। তাইত বলতে ইচ্ছে করছে, আবার ঢেলে সাজা দরকার। পুরান কাঠামো জোড়াতালি দিয়ে শিক্ষার সংস্কার-সাধনের আশা দুরাশারই নামান্তর।

বক্তব্য

'বাইবেল'-এ সিম্‌সনের গল্পে দেখতে পাই—'নোয়া' পরমপিতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে—'Teach us what we are to do with the child.' "ওগো! আমাদের শিখিয়ে দাও, শিশুটিকে নিয়ে আমরা কি করব?" এ প্রার্থনা শুধু 'নোয়া'র প্রার্থনা নয়। এ প্রার্থনা যে সর্বকালের সর্বমানবের। নবজাত শিশুকে নিয়ে আমরা কি করব? শিশু আমাদের কাছে কি দাবি জানাচ্ছে, এবং আমরাই বা শিশুর কাছে কি চাই?

সমস্ত মানবহৃদয়ের একান্ত প্রার্থনাটি একদিন যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ীর কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। "আমাকে প্রকাশ কর", "আমায় আলোতে নিয়ে যাও"। জীবনের স্বাভাবিক ধর্মই—বৃদ্ধি এবং বিকাশ। আমাদের তরফ থেকে যদি আমরা কোন আয়োজন নাও করি, তা'হলেও শিশু নিজে নিজেই তার বৃদ্ধি এবং বিকাশের একটা ব্যবস্থা করে নেবেই। প্রশ্ন হচ্ছে, তা'হলে আমাদের করণীয় কি কিছুই নেই? উত্তরে বলা যেতে পারে—এ বৃদ্ধি এবং বিকাশের সহায়তা করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

উইলিয়ম জেম্‌স (Willium James)-এর মতে—"The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated." অর্থাৎ, মানুষের অন্তরের অন্তরতম কামনাই হল—মানুষ মাত্রই আমাকে

যথার্থভাবে উপলব্ধি করুক, সবাই মিলে আমার গুণের সমাদর করুক। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ জন ডিউই (John Dewey)-ও প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে—"The deepest urge in human nature is the desire to be important." অর্থাৎ, মানুষের অন্তরের গভীরতম দাবিই হল,—সবাই আমার গুরুত্ব উপলব্ধি করুক।

সহজভাবে বলা যেতে পারে—আত্মপ্রতিষ্ঠাই মানুষের স্বভাবধর্ম। মানুষ মোটামুটি দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অপর সবাইকে দাবিয়ে বা খাটো করে নিজেকে বড় করা বা নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা ; কিংবা নিজেকে জেনে, নিজের মহত্ত্ব আবিষ্কার করে তাকে রূপায়িত করা—এ-দুটি পথই খোলা রয়েছে। প্রথম পথটি যাঁরা বেছে নেন, তাঁরাই শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়েন অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক, আর দ্বিতীয় পথেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বমৈত্রী।

ভারত-ঋষি বহু যুগ আগেই উপলব্ধি করে আমাদের শুনিয়ে গেছেন—"প্রতি জীবেই 'ব্রহ্মে'র অনন্তশক্তি আবৃত অবস্থায় রয়েছে"। এ শক্তির বিকাশ বা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কর্ম করাই মানবের ধর্ম। তাইত স্বামী বিবেকানন্দ অতি স্পষ্ট করে বললেন—"Education is the bringing out of the Divinity that is *already in man.*" অর্থাৎ মানুষের ভিতর যে অমৃত রয়েছে তাকে অনাবৃত করা বা বাইরে প্রকাশ করাই শিক্ষার কাজ। শিক্ষার সাহায্যে নতুন কিছু তৈরি করা যায় না, যা আছে তাকেই রূপদান করা যায়। শিক্ষা শুধু মানবসত্তার বৈশিষ্ট্যটুকুকে সার্থক রূপায়ণে সাহায্য করতে পারে, তার অভিব্যক্তির সম্যক বিকাশে সাহায্য করতে পারে মাত্র।

তাইত, শিশুকে নিয়ে আমাদের অত বেশী দুর্ভাবনার কি কারণ থাকতে পারে? আমাদের দায়িত্ব শুধু অবস্থার সৃষ্টি করা, যে অবস্থার চাপে পড়ে শিশুর বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। প্রতিটি শিশুই অমৃতের সন্তান। আপাতদৃষ্টিতে হয়ত কোন কোন শিশুর দানবীয় বৃত্তিসমূহই বিশেষ ভাবে ক্রিয়ারত মনে হয়। তা'হলেও, একথা ভুললে চলবে না যে, প্রতিটি শিশুর ভিতরই মহত্ত্ব বা দেবত্ব ঘুমিয়ে আছে। আমাদের কাজ শুধু শিশুর সেই দেবত্বকে সজাগ করে দেওয়া। দার্শনিক উইলিয়ম জেম্‌সও বলেছেন,—মানুষের মধ্যে বিপুল শক্তি লুকায়িত আছে, যার সম্পর্কে

সে নিজে বিশেষ সচেতন নয়। সমস্ত শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হল সে শক্তিকে খুঁজে তাকে সক্রিয় করে তুলতে হবে।

বহুকাল পরাধীনতার নিষ্পেষণে আমাদের জাতীয় ভাবধারাটি শুকিয়ে প্রায় অচল হয়ে গিয়েছে। যে অতি ক্ষীণ স্রোতটুকু ধীরে ধীরে এখনো চল্‌ছে, নিছক যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে তাও সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। জীবনের গতিবেগ বাড়িয়ে দেওয়াকেই প্রগতি বলা খুব অন্যায় হবে না বোধ হয়। কিন্তু এই গতিবেগের সাথে সাথে যদি শিষ্টাচার, শালীনতা প্রভৃতি যে-সব গুণ সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থায় অপরিহার্য সে-গুলোও ক্রমে ভেসে চলে যেতে থাকে, তা'হলে সেটা কি খুব শুভ লক্ষণ? এ যুগের মানুষের কর্মের ধারা লক্ষ্য করলে, একথাই মনে হয় —সবাই যেন অতিমাত্রায় চঞ্চল, অশান্ত। অভাবকে শত চেষ্টায় মোচন করতে যেয়ে মানুষ যেন দিন দিন অভাবের মাত্রা বাড়িয়েই চলেছে। ত্যাগের পথ ছেড়ে আজ যেন একমাত্র ভোগের পথেই মানুষের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যখন একটা বিরাট প্লাবন শুরু হয়ে যায়, তখন শুধু একমুষ্টি ধূলির সাহায্যে সে প্লাবনকে ঠেকাবার চেষ্টা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। কিন্তু, তবু কি মানুষের চেষ্টার বিরাম আছে?

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমরা সর্ববিষয়েই যেন অতিমাত্রায় পরাধীন হয়ে পড়েছি। যে, যেটুকু চিন্তা করতে যাই সবটুকুই যেন শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়ে—হয় পুঁথিগত, নয়ত ধার করা। নতুন কিছু করছি বলে আজ যাকে আমরা সাড়ম্বরে প্রচার করছি, একটু খোঁজ নিলেই হয়ত দেখব তাও যেন সবটাই নিছক পরানুকরণ। তবে প্রকাশভঙ্গিমার মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব আছে বৈকি! দেশী রং মাখিয়ে নেবার একটা অপচেষ্টা তাতে রয়েছে ঠিকই। এতকাল পর বিদেশী শাসকগোষ্ঠী এদেশ থেকে পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে চলে গেছে বটে, কিন্তু তাদের আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যিক আচরণসমূহ যেন আমাদের জীবনে প্রায় কায়েম হয়ে বসেছে। তাই ভয় হয়, এমনি করে আর কিছুকাল চলতে দিলে ভারতবাসী অচিরেই একটি সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত হওয়া খুব আশ্চর্য নয়। আজ সর্বশক্তি দিয়ে ভারতবাসীকে এ অন্ধ অনুকরণের উগ্র স্পৃহা হতে বাঁচাতে হবে। নির্জীব একটা দেহে সম্পূর্ণ বিদেশী সাজসজ্জা না পরিয়ে তার

প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টাই সবার আগে দরকার। এতকাল মৃতবৎ পড়ে থেকেও এ জাতির প্রাণশক্তি যে আজও সম্পূর্ণ স্পন্দনরহিত হয়ে যায় নি, ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও সে যে তার প্রাণ-প্রদীপটিকে অতি সঙ্গোপনে জ্বালিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে—বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রভৃতি মনীষিবৃন্দই তার সাক্ষ্য বহন করছেন না কি? কাজেই, নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। আমরা কত বড় হতে পারি, কতকিছু অসাধ্য সাধন করতে পারি—সে সম্বন্ধে হতাশার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না।

অতএব, জাতীয় ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার মূল লক্ষ্যটিকে সম্মুখে রেখে শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্ববিধ সংস্কারসাধনে উদ্যোগী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি মানবশিশুর ভিতর যে দেবত্ব বা মহত্ত্ব ঘুমিয়ে রয়েছে, তাকে সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়ে তোলাই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। একমাত্র আত্মোপলব্ধিই বলে দিতে পারে জীবনে চরম সার্থকতা—এ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থা রচিত হলেই শিক্ষা সংজ্ঞাটিকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে, সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের সাথে সুর মিলিয়ে তাইত গান্ধীজী একদা উক্তি করেছিলেন—শিক্ষার সাহায্যে যদি নতুন যুগের নতুন মানুষ তৈরি করা যায়, তবেই অশান্তিবিক্ষুব্ধ পৃথিবী আর একবার অমৃতের সন্ধান পেয়ে ধন্য হবে। শিক্ষার সাহায্যে যদি শিশুর নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিটিকেই সুগঠিত করে তোলা না যায়, তা'হলে এ পণ্ডশ্রম করে লাভ কি?

শিশুকে নিয়ে আমাদের এত দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশের কাজটিকে ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। শিশু নিজেই তার আত্মবিকাশের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। শিক্ষার সাহায্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা দরকার যাতে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের পথে কোন বাধা না এসে উপস্থিত হয়। শিশু এগিয়ে যেতেই চায়। পথে যাত্রা করার পূর্বে তাকে তার ট্যাঁকের কড়ির সংবাদটি দিয়ে দিলেই ভাল হয়। আমি কত বড়? আমার দৌড় কতটুকু? এসব সংবাদ পূর্বাহ্নে জেনে নিতে পারলে তবে ত সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। আত্মোপলব্ধি ব্যতীত আত্মবিকাশ কি করে সম্ভবপর হবে? অতএব শিশুকে তার আত্মপরিচয় জানিয়ে কৃতার্থ করাই আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। আমরা সবাই সেই বিশ্বপিতার সন্তান। এ বিশ্বের আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মার

সাথে জীবাত্মার যোগসূত্র চিরন্তন। এ যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়েই আজ মানবকুল শতধা বিভক্ত। এ যোগসূত্রটি পুনঃস্থাপন করার চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করাই মানবকল্যাণের প্রশস্ত পথ।

বুদ্ধির অতিরিক্ত দৌরাত্ম্যে আজ দুনিয়ার মানুষ যেন হৃদয়ের প্রতি ক্রমশঃ উদাসীন হয়ে পড়ছে। আত্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভ ব্যতীত মানুষের হৃদয়ের প্রসার আশা করা যায় না। নিছক আত্মস্বার্থের কল্যাণে আজ মানুষে মানুষে যে কৃত্রিম বৈষম্য সৃষ্ট হয়েছে, সে বৈষম্য দূর করা একমাত্র শিক্ষার সাহায্যেই সম্ভবপর। একমাত্র আত্মতত্ত্বের জ্ঞানের সহায়তায়ই রচিত হতে পারে মানুষে মানুষে সত্যিকারের বন্ধন। অতএব, শিক্ষার মূল্য উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে সমস্ত আয়োজন অনুষ্ঠানে যত্নবান হলেই আমাদের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হবে। যে অমৃতের সন্ধানে একদা আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল সে অমৃত লাভ করে আমরা হব পরম তৃপ্ত। রচিত হবে মানুষে মানুষে সত্যিকারের প্রেমের বন্ধন। আপন আপন মুক্তির গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র মানব-শক্তির মুক্তির কথা ভাববার আমাদের অধিকার জন্মাবে। বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তখন আর দেশে দেশে নানা সমিতি সংগঠনের কোন প্রয়োজন থাকবে না। ঘুচে যাবে ভেদ-বিভেদ আর ক্ষমতার কাড়াকাড়ি। অশান্তিবিক্ষুব্ধ পৃথিবী আবার পরিণত হবে শান্তির অমরাবতীতে।

সমাপ্ত